চার্লস ডারউইন

ডিসেন্ট অফ ম্যান

ডিসেন্ট অফ ম্যান

চার্লস ডারউইন

প্রথম খণ্ড

ডিসেন্ট অফ ম্যান

চার্লস ডারউইন

প্রথম খণ্ড

ভাষান্তর

অসীম চট্টোপাধ্যায়
সঞ্জীব মণ্ডল/অসিত চৌধুরি

দীপায়ন ❑ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ❑ কলকাতা-৭০০০০৯

THE DESCENT OF MAN
AND
SELECTION IN RELATION TO SEX

by

CHARLES R. DARWIN

Volume I.

First Published : 1871

প্রথম প্রকাশ ❑ শ্রাবণ ১৩৯৬

চতুর্থ সংস্করণ ❑ চৈত্র ১৪১৫, মার্চ, ২০০৯

এই সংস্করণের গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বঙ্গানূদিত সংস্করণের কোনও অংশ কোনও প্রকার মুদ্রণপদ্ধতির সাহায্যে পুনর্মুদ্রণ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য কোথাও উল্লেখ করা নিষিদ্ধ।

প্রকাশক ❑ দীপায়ন ❑ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ❑ কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর ❑ তনুশ্রী প্রিন্টার্স ❑ ২১বি, রাধানাথ বোস লেন ❑ কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট ❑ সন্দীপন ভট্টাচার্য

একশত পঁচিশ টাকা

পিতামহ
ইরাসমাস ডারউইন

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

বাংলায় ডারউইন-চর্চা শুরু হয়েছে বহু দিন আগেই, প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে। কিন্তু ডারউইনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থাবলি যা মানুষের চিন্তাভাবনার প্রচলিত ধ্যানধারণাকে আমূল পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করেছিল, জাগতিক সমস্ত বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনার যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের দিকদর্শন ঘটিয়েছিল, তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। এই ঘাটতি পূরণের কথা মনে রেখেই ডারউইনের রচনাবলি বাংলা অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করি আমরা। সেই পরিকল্পনার প্রথম ফসল এই 'ডিসেন্ট অফ ম্যান'-এর বাংলা ভাষান্তর।

'ডিসেন্ট অফ ম্যান'-এর এই খণ্ডটি আলোচনার দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরবর্তী খণ্ডগুলিতে ডারউইন আলোচনা করেছেন কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু এবং মানুষের জীবনে যৌন নির্বাচনের ভূমিকা প্রসঙ্গে।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও সহমর্মী সাথীরা নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে ও উৎসাহ জুগিয়ে আমাদের চিরন্তন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে সন্দীপন ভট্টাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক প্রয়াত সন্তোষকুমার বসুর নাম উল্লেখ না করলে মানসিক পীড়া অনুভব করব।

চার্লস ডারউইন : জীবন ও কাজ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে ডাক্তার ইরাসমাস ডারউইন একটি পরিচিত নাম। চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, লেখক, অনুবাদক—সবের সমন্বয়ে ইরাসমাস এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। 'জুনোমিয়া' নামে একটি বই লিখেছিলেন তিনি। বইটির এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, 'যে-সব প্রাণীর রক্ত গরম, তারা সবাই একই সূত্র থেকে এসেছে—এ কথা ভাবলে কি খুব সাহসের পরিচয় দেওয়া হবে!'

ইরাসমাসের পুত্র রবার্ট ডারউইনও নিয়েছিলেন চিকিৎসকের জীবিকা। শ্রপ্‌শায়ারের শ্রিউস্‌বেরি অঞ্চলের বাসিন্দা রবার্ট জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেন সুসানা ওয়েজ্‌উডকে। রবার্ট-সুসানার ছয় সন্তানের মধ্যে পঞ্চম সন্তানটি পৃথিবীর আলো দেখে ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, আমরা যাঁকে চিনি চার্লস ডারউইন নামে।

শিশু চার্লস সম্বন্ধে মোটেই আশাবাদী ছিলেন না রবার্ট, কেননা পড়াশোনায় তার মন ছিল না তেমন। ন'বছর বয়সে তাকে ভর্তি করা হয় শ্রিউস্‌বেরি স্কুলে। না, সেখানেও মন বসাতে পারেনি চার্লস। বাঁধাধরা গতের পড়াশোনা কিছুতেই ভাল লাগত না তার। সাবেককালের কিছু ভূগোল আর ইতিহাস ছাড়া অন্য কিছু পড়ানোর পাট ছিল না ওই স্কুলে। তার ভাল লাগত খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে। পড়াশোনা করার চেয়ে তার বেশি ঝোঁক ছিল মুদ্রা, নামাঙ্কিত মোহর, নানা ধরনের নুড়ি-পাথর সংগ্রহ করার দিকে। এছাড়াও সে ভালবাসত রসায়নশাস্ত্র পড়তে এবং গাছপালা, লতাপাতা, পোকামাকড় আর পাখির ডিম সংগ্রহ ও চিহ্নিত করতে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে এই ঝোঁকটা সে পেয়েছিল তার বাবার বংশ থেকে আর হাতে-কলমে কাজ করার প্রেরণাটা পেয়েছিল মামার বাড়ি থেকে। এইসব কাজকর্ম তার বাবা খুব অপছন্দ না করলেও, অপছন্দ করতেন স্কুলের পরীক্ষায় পাওয়া খারাপ নম্বরগুলোকে। বাবা ডাক্তার রবার্ট ওয়ারিং ডারউইন চাইতেন না মাতৃহারা ছেলেটি পড়াশোনা ফেলে সারাদিন খেলা, মাঠ, পাহাড়, বনজঙ্গল আর শিকার নিয়ে মেতে থাকুক। রেগে গিয়ে একদিন তিনি বলেই ফেললেন, 'তুমি দেখছি শিকার, কুকুরের পাল আর ইঁদুর ধরা নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাকো, পড়াশোনার দিকে ফিরেও তাকাও না। তুমি দেখছি নিজের আর বংশের নাম ডোবাবে।' ভবিষ্যতের মহান প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছেলেবেলায় যে বেশ কিছুটা আলাদাই ছিলেন, সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

১৮২৫ সালে, ষোলো বছর বয়সে, কিছুটা বাবাকে সন্তুষ্ট করার তাগিদেই, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়তে যান তিনি। দাদা ইরাসমাস আগেই পড়তেন সেখানে। কিন্তু ডাক্তারি পাঠ্যক্রম শেষ করার উৎসাহ ধরে রাখতে পারেননি চার্লস। পরবর্তীকালের চার্লস ডারউইনের লেখায় দেখছি : 'শীতকালের সকাল আটটার সময় মেটিরিয়া মেডিকা সম্বন্ধে ডাঃ ডানকানের ভাষণ—ওহ্, সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।' এ সময়ে প্লিনিয়ান সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর, প্রাণীতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন চার্লস। পোকামাকড় সংগ্রহ ও চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেন। এই সময় তিনি সামুদ্রিক জীবদের ভ্রূণ সম্বন্ধে দু'টি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আবিষ্কার করেন। এরপর ডাক্তারি পড়ায় ইতি ঘটে তাঁর। বাবা তাঁকে যাজক হতে বলেন। প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে রাজি হন চার্লস। ১৮২৮ সালের জানুয়ারিতে ভর্তি হন কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির ক্রাইস্ট কলেজে, কিছুদিন তাঁকে বসতে হয় যাজক হওয়ার ক্লাসেও।

অন্যান্য বইপত্র পড়ার অবসরে চার্লস ততদিনে পড়ে ফেলেছেন শেকসপিয়ার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোল্‌রিজ, বায়রন, স্কট ও মিল্টনের লেখা। কবিতা টানে তাঁকে, পরবর্তীকালে জাহাজে দীর্ঘভ্রমণের সঙ্গী হয় মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'। কিন্তু এ-পড়াশোনাও ভাল লাগে না তাঁর। এখানেও বেরোতেন দল বেঁধে অজানা বনে-জঙ্গলে, সঙ্গে পোকামাকড় সংগ্রহ ও চিহ্নিত করার কাজও চলত।

এখানেই পরিচয় হয় উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক জন সিভেন্স হেন্‌স্লো-র সঙ্গে। হেন্‌স্লো হয়ে ওঠেন তাঁর প্রেরণাদাতা। তাঁর প্রভাবে ভূতত্ত্বের ওপর পড়াশোনা শুরু করেন চার্লস। দাদুর লেখা 'জুনোমিয়া' বইটি আবার ভাল করে পড়ে ফেলেন। পড়লেন লামার্কের লেখা। এই সময়েই হাতে আসে হাম্‌বোল্ড-এর 'পার্সোনাল ন্যারেটিভ'। অনুপ্রাণিত হন চার্লস। তারপর পড়েন হারসেল-এর লেখা 'ইনট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অফ ন্যাচারাল ফিলজফি'। পরে তিনি লিখেছেন, 'প্রকৃতিবিজ্ঞান পঠনে এই দু'টি লেখার অবদান আমাকে তখন উৎসাহ-উদ্দীপনার তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল।'

জানুয়ারি মাসে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন চার্লস। অধ্যাপক হেন্‌স্লো তাঁকে ভূতত্ত্ববিদ্যা পড়তে উৎসাহ জোগান। গরমের ছুটিতে অধ্যাপক সেজ্‌উইকের সঙ্গে ভূতত্ত্ববিদ্যার উপর শিক্ষামূলক ভ্রমণে ওয়েলস-এ যান ডারউইন।

১৮৩১ সাল। বাইশ বছরের সদ্য-যুবক চার্লসের জীবন মোড় নিতে শুরু করল ভবিষ্যতের ডারউইন হওয়ার দিকে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ সেরে ফিরে আসার পর হেন্‌স্লোর সুপারিশে 'এইচ. এম. এস. বিগ্‌ল্' জাহাজের দীর্ঘ সমুদ্র অভিযানের শরিক হন চার্লস—প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে। 'এইচ. এম. এস. বিগ্‌ল্' জাহাজের ক্যাপ্টন ফিজ্‌রয়ের সঙ্গে পরিচয়ের পর ঠিক হয়—প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি এই ভ্রমণে যাবেন, কিন্তু কোনও মাসোহারা পাবেন না। সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগ গ্রহণ করেন তিনি। বিগ্‌ল্ জাহাজের এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটো। এক, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলভাগের একটি

সঠিক মানচিত্র তৈরির কাজে সাহায্য করা; দুই, যথাযথভাবে দ্রাঘিমারেখা নির্ধারণ করা। ছেলেকে ওই দীর্ঘ যাত্রায় ছেড়ে দিতে প্রথমে রাজি হতে পারেননি রবার্ট ডারউইন। অনেক টালবাহানার পর, অবশেষে রাজি হন তিনি। প্লিমাউথ বন্দর থেকে ১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে যাত্রা শুরু করে বিগ্‌ল্‌। ভবিষ্যতের পথে যাত্রা শুরু হয় চার্লস ডারউইনের।

ডারউইনের নিজের কথায়, 'বিগল্‌ জাহাজে সমুদ্রযাত্রা আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা আমার জীবনদর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।'

এম. এস. বিগ্‌ল্‌-এর যাত্রা—১৮৩১-এর ২৭ ডিসেম্বর থেকে ১৮৩৬-এর ২ অক্টোবর। ঠিক পাঁচ বছর পরে ফল্‌মাউথ বন্দরে নোঙর করেছিল বিগ্‌ল্‌। এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে সে ছুঁয়ে এসেছে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, আর্জেন্তিনা, টিয়েরা দেল ফুয়েগো, উরুগুয়ে, পাটাগোনিয়া, চিলি, আন্দিজ পর্বতাঞ্চল, গ্যালাপাগোস ও তাহিতি দ্বীপপুঞ্জ, অতিক্রম করেছে প্রশান্ত মহাসাগর, স্পর্শ করেছে নিউজিল্যান্ডকে, অস্ট্রেলিয়াকে, তারপর ভারত মহাসাগরের বুক চিরে মুখ ফিরিয়েছে দেশের দিকে, আফ্রিকা মহাদেশের শেষ প্রান্ত কেপটাউনকে ছুঁয়ে, সেন্ট হেলেনা দ্বীপ হয়ে ফল্‌মাউথের ঠিকানায়।

এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ডারউইন দেখে এসেছেন পৃথিবীর কিছু গহনতম বনাঞ্চল, সংগ্রহ করেছেন প্রচুর অদেখা-অজানা উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, মথ, প্রজাপতি, শামুক, পাথর, জীবাশ্ম, এবং সঞ্চয় করেছেন বিপুল অভিজ্ঞতা। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের চতুষ্পদ প্রাণীদের প্রচুর জীবাশ্ম আর গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের বহুবিচিত্র প্রজাতিগুলো গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁকে। বলা যায়, গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের এই প্রজাতিগুলোই ছিল ডারউইনের যাবতীয় চিন্তাভাবনার মূল উৎস।

শুরু হয় ডারউইনের লেখালেখি। প্রকাশিত হল জার্নাল অফ রিসার্চেস, জুলজি অফ দ্য ভয়েজ অফ দ্য বিগ্‌ল্‌, দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিসট্রিবিউশন অফ কোরাল রিফ্‌স এবং জিওলজিক্যাল অবজারভেশন অন ভল্‌ক্যানিক আইল্যান্ড অ্যান্ড অন সাউথ আমেরিকা। ফিরে আসার কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল এগুলো। সমুদ্রযাত্রার শুরুতেই, কেপ ডি ভারডে আর্কিপেলাগোতে অবস্থিত সেন্ট জ্যাগো দ্বীপে ভ্রমণের সময় তিনি দক্ষিণ আমেরিকা সহ যে-সব দেশ ভ্রমণ করেছেন তাদের ভূতাত্ত্বিক গঠনপ্রণালী, বিস্তর পরিমাণে সংগৃহীত চতুষ্পদ প্রাণীদের হাড়গোড় এবং ফসিলের ওপর একটি বই লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভ্রমণের আগে তিনি লাইয়েল-এর 'প্রিন্সিপল্‌স্‌ অফ জিওলজি' বইটির প্রথম খণ্ডটি পড়েন এবং ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের মূলসূত্র ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করেন। ভ্রমণ শেষে ফিরে আসার পর তিনি ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের একজন হাতে-কলমে-শিক্ষা-পাওয়া তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। অচিরেই এ-সব বিষয়ের অগ্রণী বিজ্ঞানীদের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হন তিনি এবং জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদকের পদে মনোনীত করা হয় তাঁকে। তিন বছর এই পদে ছিলেন

তিনি। এই সময়ে তিনি কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন চিলির সমুদ্রতট পরিভ্রমণের সময় সংগৃহীত তথ্যাবলির সাহায্যে। তাছাড়াও প্রবালদ্বীপ গঠনের কার্যকারণ ও নিয়মনীতি সংক্রান্ত প্রথম বিজ্ঞানসম্মত কাজটিও লিপিবদ্ধ করেন এই সময়েই। ১৮৩৯ সালে তাঁর জার্নাল প্রকাশিত হয় ফিজ্‌রয়ের 'ভয়েজেস অফ অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড বিগ্‌ল্'-এর সঙ্গে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সব জায়গা থেকে আসতে থাকে প্রশংসাবাণী। এরপর পৃথিবীতে প্রজাতিগুলো যে সৃষ্টির সময় থেকে অনড়, অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকেনি, নানান রূপান্তরের পথ বেয়ে এগিয়েছে তারা—এ-বিশ্বাস দানা বাঁধে তাঁর চিন্তায়। প্রথমদিকে এ-চিন্তার কথা শুধু নিজের নোটবুকেই লিখেছিলেন তিনি। তখনই হাতে আসে ম্যাল্‌থাসের 'এসে অন দ্য প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অফ পপুলেশন'। অবিন্যস্ত চিন্তাভাবনাকে সাজিয়ে ফেলার সূত্র হাতে পান ডারউইন। জন্ম নেয় সেই সুবিখ্যাত তত্ত্ব—প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত বিবর্তনের তত্ত্ব। সময়টা ১৮৩৬ সালের অক্টোবর মাস। একদা বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে গভীর-বিশ্বাসী ডারউইন পৌঁছে যান এক নতুন বিশ্বাসে। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, ম্যালথাসের রচনা পড়ার পরই তাঁর মনে হয়েছিল অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে 'সুবিধাজনক জৈবিক রূপগুলো টিকে থাকবে আর অসুবিধাজনক রূপগুলো ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে। আর এ-ঘটনার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হবে নতুন নতুন প্রজাতি।'

১৮৩৯ সালে তিরিশ বছরের যুবক ডারউইন বিয়ে করলেন তাঁর মামাতো বোন এমা ওয়েজ্‌উডকে। ওই বছরই প্রথম সন্তানের জন্ম দেন এমা, নাম যার উইলিয়াম ইরাসমাস ডারউইন। পরবর্তী জীবনে আরও নয়টি সন্তানের পিতা হয়েছিলেন চার্লস ডারউইন। লন্ডন শহরের ১২ নং আপার গাওয়ার স্ট্রিটের যে বাড়িতে প্রথম সংসার পেতেছিলেন চার্লস আর এমা, সেই বাড়ি, আমাদের দুর্ভাগ্য, ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝোড়ো প্রহরে।

সেই লাইয়েল-এর ভূতত্ত্ববিজ্ঞান পড়বার সময় থেকেই গাছপালা, লতা, শাক-সবজি এবং জীবজন্তুদের পরিবর্তন নিয়ে তথ্য জোগাড় করতে শুরু করেছিলেন ডারউইন—মানুষের হাতে সৃষ্ট পরিবর্তন অথবা প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্ট পরিবর্তন, দু'টি বিষয়েই। তিনি লক্ষ করেন মানুষ কৃতিত্বের সঙ্গে পশু-পাখি এবং গাছপালার সবচেয়ে উন্নত প্রজাতিগুলোকে সৃষ্টি করেছে। সবচেয়ে কার্যকরী গো ও মেষজাতীয় পশুগুলোর প্রজাতিকে সৃষ্টি করেছে মানুষ বিভিন্ন গুণসম্পন্ন ওইসব পশুদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে এবং একই ঘটনা ঘটেছে ফল, শস্য ও অন্যান্য মানবোপযোগী গাছপালাগুলোর ক্ষেত্রেও। এর জন্য বিভিন্ন গুণসম্পন্ন জীবদের পিতামাতাকে আলাদাভাবে পুষ্টিপ্রধান খাদ্যের সাহায্যে শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও উন্নত করে তুলতে হয়েছিল তাদের। প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট প্রজাতিগুলোর থেকে চেহারায়, রঙে এবং উপযোগিতায় এরা একেবারেই অন্যরকম।

নতুন তত্ত্ব ডারউইনের সামনে, কিন্তু তা প্রকাশ করতে তখনও দ্বিধান্বিত তিনি। আরও ভাবছেন, যাচাই করছেন, হিসেব মেলাচ্ছেন। প্রায় বিশটা বছর দ্বিধার দরিয়ায়

ভেসেছেন ডারউইন। অবশেষে, ১৮৫৮ সালের এক বিশেষ ঘটনায়, দ্বিধা কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে হল তাঁকে। সে-ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু এক প্রকৃতিবিজ্ঞানী—আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস।

হাম্‌বোল্ডের 'পার্সোনাল ন্যারেটিভ' আর ডারউইনের 'জার্নাল অফ রিসার্চেস' পড়ে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন তরুণ ওয়ালেস। অজানা প্রকৃতির খোঁজ নিতে পাড়ি দিয়েছিলেন ব্রাজিলে, তারপর একে একে আরও অনেক জায়গায়। সঙ্গী ছিলেন তাঁর বন্ধু প্রকৃতিবিজ্ঞানী এইচ. ডব্লিউ. বেট্‌স্। ডারউইনের প্রজাতি বিষয়ক চিন্তার কথা জানা ছিল না ওয়ালেসের। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ আর গভীর চিন্তাভাবনার পথ বেয়ে তিনি স্বাধীনভাবেই পৌঁছতে পেরেছিলেন প্রায় একই তত্ত্বের দুয়ারে—প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত বিবর্তনের তত্ত্বে। মনে রাখা দরকার, ডারউইন আর ওয়ালেসের তত্ত্বের মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও ফারাকও কম ছিল না। ম্যালথাসের তত্ত্ব নতুন চিন্তার সূত্র জুগিয়েছিল ওয়ালেসকেও।

সালটা ১৮৫৮, ডারউইন তখন প্রকৃতিবিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে ডারউইনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন ওয়ালেস (On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type)।

নাড়া খেলেন ডারউইন। তাঁর বহু শ্রমার্জিত তত্ত্বের জগতে আর-একজন পৌঁছে গেছে স্বাধীনভাবেই। নিজের তত্ত্ব প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তিনি। লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির সামনে পড়া হল ওয়ালেসের প্রবন্ধ আর ডারউইনের রচনার কিছু বাছাই-করা অংশ, যা পরে 'অরিজিন অফ স্পিসিস' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সোসাইটির মুখপত্রে ছাপা হল তাঁদের দুজনের রচনা, 'অন দ্য টেনডেন্সি অফ স্পিসিস টু ফর্ম ভ্যারাইটিস' এবং 'অন সিলেকশন' নামে।

তার পরের বছর, ১৮৫৯ সালে, পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে সংযোজিত হল এক আশ্চর্য, ইতিহাস-কাঁপানো সম্পদ : অরিজিন অফ স্পিসিস! মানবজাতির ভাবনা-জগৎ ওলোট-পালোট হয়ে গেল, গিয়ে পৌঁছল এক নতুন স্তরে, নতুন মাত্রায়। প্রজাতির বিবর্তন, তার ইতিহাস, রূপান্তর—সবকিছুর প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত হল প্রাকৃতিক নির্বাচন।

সৃষ্টি হল বিপুল আলোড়ন, বিতর্ক উঠল প্রচুর। কোনও-এক আদি জীব থেকেই পরবর্তীকালের সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে কি না, প্রশ্ন উঠল তা নিয়েও (সব বিতর্কের সমাধান আজও হয়নি)। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন সারা দেশের ধর্মগুরুরা। এই তত্ত্ব খ্রিস্টধর্ম-বিরুদ্ধ, সৃষ্টিতত্ত্বকে সে অস্বীকার করছে—এইসব বলে আক্রমণ করা হল ডারউইনের তত্ত্বকে। অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি মিউজিয়ামে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন বসল ১৮৬০ সালে। সেখানে মুখোমুখি দাঁড়াল দুই যুযুধান পক্ষ। ডারউইনের মতের পক্ষে থমাস হেনরি হাক্সলে এবং জোসেফ হুকার, বিপক্ষে অক্সফোর্ডের বিশপ ডঃ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স (যাকে পিছন থেকে মদত জুগিয়েছিলেন রিচার্ড ওয়েন)।

টানা চার ঘণ্টা বিতর্কের শেষে, মাথা নিচু করে সরে যেতে হয়েছিল উইলবারফোর্সকে।

তেরো বছরের মধ্যে ছ'টা সংস্করণ বেরোল অরিজিন অফ স্পিসিসের। এরই মধ্যে প্রকাশিত হল নৃতত্ত্ব এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের ওপর আরও অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হল 'দ্য ভ্যারিয়াস কনট্রিভ্যানসেস বাই হুইচ অর্কিড আর ফার্টিলাইজড বাই ইনসেক্টস, অ্যান্ড দ্য গুড এফেক্টস অফ ইন্টারক্রসিং', ১৮৬৮ সালে 'ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন', এবং ১৮৭১-এ এই বহুল-আলোচিত 'ডিসেন্ট অফ ম্যান'। তারপর একে একে—'দ্য এক্সপ্রেশন অফ ইমোশন ইন ম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল' (১৮৭২), 'ইনসেক্টিভোরাস প্ল্যান্টস' (১৮৭৫), 'দ্য এফেক্টস অফ ক্রস অ্যান্ড সেল্‌ফ্‌ ফার্টিলাইজেশন ইন দ্য ভেজিটেবল কিংডম' (১৮৭৬), 'দ্য ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ফ্লাওয়ারস ইন প্ল্যান্টস অফ দ্য সেম স্পিসিস' (১৮৭৭), 'দ্য পাওয়ার অফ মুভমেন্ট ইন প্ল্যান্টস', (১৮৮০), 'ফর্মেশন অফ ভেজিটেবল মোল্ড থ্রু দ্য অ্যাকশন অফ ওয়ার্মস' (১৮৮১)।

জীবনের শেষ বছরগুলিতে ডারউইন নিজেকে বেশি করে ব্যস্ত রেখেছিলেন বিভিন্ন উদ্ভিদ আর ছোটখাটো পোকামাকড় সংক্রান্ত অনুসন্ধানের কাজে। ১৮৭৬ সালে লিখেছিলেন সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী।

শরীর ভেঙেছিল অনেক আগেই। পঙ্গুত্ব তাঁর শরীরকে গ্রাস করেছিল অনেকটাই। ইনভ্যালিড্‌স্‌ চেয়ারে বসে চলাচল করতে হয়েছে বহু বছর। অবশেষে, ১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল, সব প্রচেষ্টা-সাফল্য-যন্ত্রণার অবসান। মারা গেলেন চার্লস ডারউইন। ওয়েস্টমিন্‌স্টার অ্যাবি-তে, নিউটনের সমাধির খুব কাছাকাছি, সমাহিত হলেন ডারউইন। অন্তিমযাত্রায় মাথা নিচু করে হেঁটে গেলেন প্রিয় অনুরাগীরা—হাক্সলে, হুকার এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস।

ডারউইনোত্তর শতাধিক বছরে পৃথিবী অনেক পরিবর্তন, অনেক নতুন-কিছু-জানার সাক্ষী। তাঁর সময়ের জীববিদ্যা আজ প্রায় শতশাখায় বিভক্ত হয়েছে, বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রচুর নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং নতুন নতুন তত্ত্বের আলোয় এগিয়ে চলেছে পৃথিবী। জীববিদ্যা, জীব-রসায়নবিদ্যা, কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি, সৃষ্ট জীবনকে ইচ্ছেমতো পরিবর্তনের অধিকারী আজ মানুষ। প্রকৃতির ওপরে কিছুটা আধিপত্য সে বিস্তার করতে পেরেছে ক্লোনিং, মিউটেশন তত্ত্ব এবং নিউক্লিয়ার বায়োলজি করায়ত্ত করার দৌলতে।

১৮৫৯ সালে 'অরিজিন অফ স্পিসিস' প্রকাশিত হওয়ামাত্রই তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস। পরের বছর এ-বইয়ের পাতায় মগ্ন হন কার্ল মার্কস। ১৮৬০ সালের ১৯ ডিসেম্বর এঙ্গেলসের কাছে লেখা এক চিঠিতে মার্কস লিখেছেন : 'আমাদের ধারণার প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক বনিয়াদ সৃষ্টি করে দিয়েছে এই গ্রন্থটি।' এঙ্গেলস তাঁর 'ডায়ালেকটিক্‌স্‌ অফ নেচার' লিখতে গিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের জগতে তিনটি ঘটনাকে

চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়েছেন—জীবকোষ আবিষ্কার, শক্তির সংরক্ষণ ও তার রূপান্তরের নিয়ম আবিষ্কার এবং ডারউইনের আবিষ্কার। অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলসের চোখে চার্লস ডারউইনের আবিষ্কার ছিল এক প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আবার তার পাশাপাশি 'ডায়ালেকটিক্স্ অফ নেচার'-এর পৃষ্ঠায় ডারউইনের কিছু সমালোচনাও করেছেন এঙ্গেলস। অস্তিত্বরক্ষা বা উদ্বর্তনের জন্য সংগ্রামের ওপর একপেশেভাবে অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন ডারউইন, যা এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গীতে সঠিক বলে মনে হয়নি। প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধেও কিছুটা ভিন্ন মত ছিল এঙ্গেলসের। সদস্যসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে যে-প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, তাতে সবথেকে শক্তিশালীরাই প্রধানত টিকে থাকলেও, অন্য অনেক দিকের বিচারে দুর্বলতমরাও পারে টিকে থাকতে—বলেছেন তিনি। আরও বলেছেন, অজৈব প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে শুধু সংঘাতই থাকে না, সামঞ্জস্যও থাকে; জৈব প্রকৃতির বস্তুগুলোর মধ্যে সচেতন ও অসচেতন সংগ্রামের পাশাপাশিই অবস্থান করে সচেতন ও অসচেতন সহযোগিতাও। আর তাই, এমনকী প্রকৃতির ক্ষেত্রেও, চিন্তার নিশানে শুধু 'সংগ্রাম' লিখে রাখাটা তাঁর মতে নেহাতই একপেশে ধারণা। বিভিন্ন প্রজাতির পরিবর্তনশীলতার কারণ, পরিবেশের ভূমিকা, বিপাক-ক্রিয়ার ভূমিকা—এ-সব বিষয়েও কিছু প্রশ্ন তুলেছেন এঙ্গেলস। প্রশ্ন তুলেছেন ম্যালথাসের তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও। তবু, সমালোচনার পাশাপাশিই, মানবদেহের শারীরস্থানবিদ্যা, তুলনামূলক শারীরস্থানবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, জীবাশ্মতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা—সবকিছুর ভিত্তি হিসেবে এঙ্গেলস চিহ্নিত করেছেন প্রজাতিতত্ত্বকেই, অকৃত্রিম স্বাগত জানিয়েছেন ডারউইনের আবিষ্কারকে। বলে রাখা ভাল, 'ডায়ালেকটিক্স্ অফ নেচার' লেখার সময় 'অরিজিন অফ স্পিসিস' ছাড়াও এঙ্গেলস সাহায্য নিয়েছিলেন এই 'ডিসেন্ট অফ ম্যান' গ্রন্থেরও।

ডারউইনের ভাবনাচিন্তার কিছু-কিছু অংশ আজ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় হয়তো বা পরিত্যক্ত, না হয় সংশোধিত হয়েছে, আবার কিছু কিছু প্রশ্ন নিয়ে আজও চলছে বিতর্ক, গবেষণা। ডারউইন নিজেই লিখে গেছেন, 'আমি জানি, ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হবে...মানুষের উদ্ভব আর মানবজাতির ইতিহাসের ওপর এসে পড়বে আরও উজ্জ্বল আলোকরশ্মি।' এ-কথা লিখতে পেরেছিলেন ডারউইন, কারণ সামনে এগিয়ে চলাই সমস্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিরন্তন সত্য। নতুন নতুন আবিষ্কার, নতুন নতুন চিন্তাই এগিয়ে নিয়ে যায় পৃথিবীকে, ইতিহাসকে, মানবজাতিকে।

তবু, সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও, এটা অনস্বীকার্য যে আধুনিক জীববিদ্যার বনিয়াদ যিনি গড়ে দিয়ে গেছেন, তাঁর নাম চার্লস ডারউইন। পৃথিবীর ইতিহাসে ডারউইন এবং তাঁর বিবর্তন তত্ত্বের মৃত্যু নেই।

শিবপুর
হাওড়া-২

অসীম চট্টোপাধ্যায়

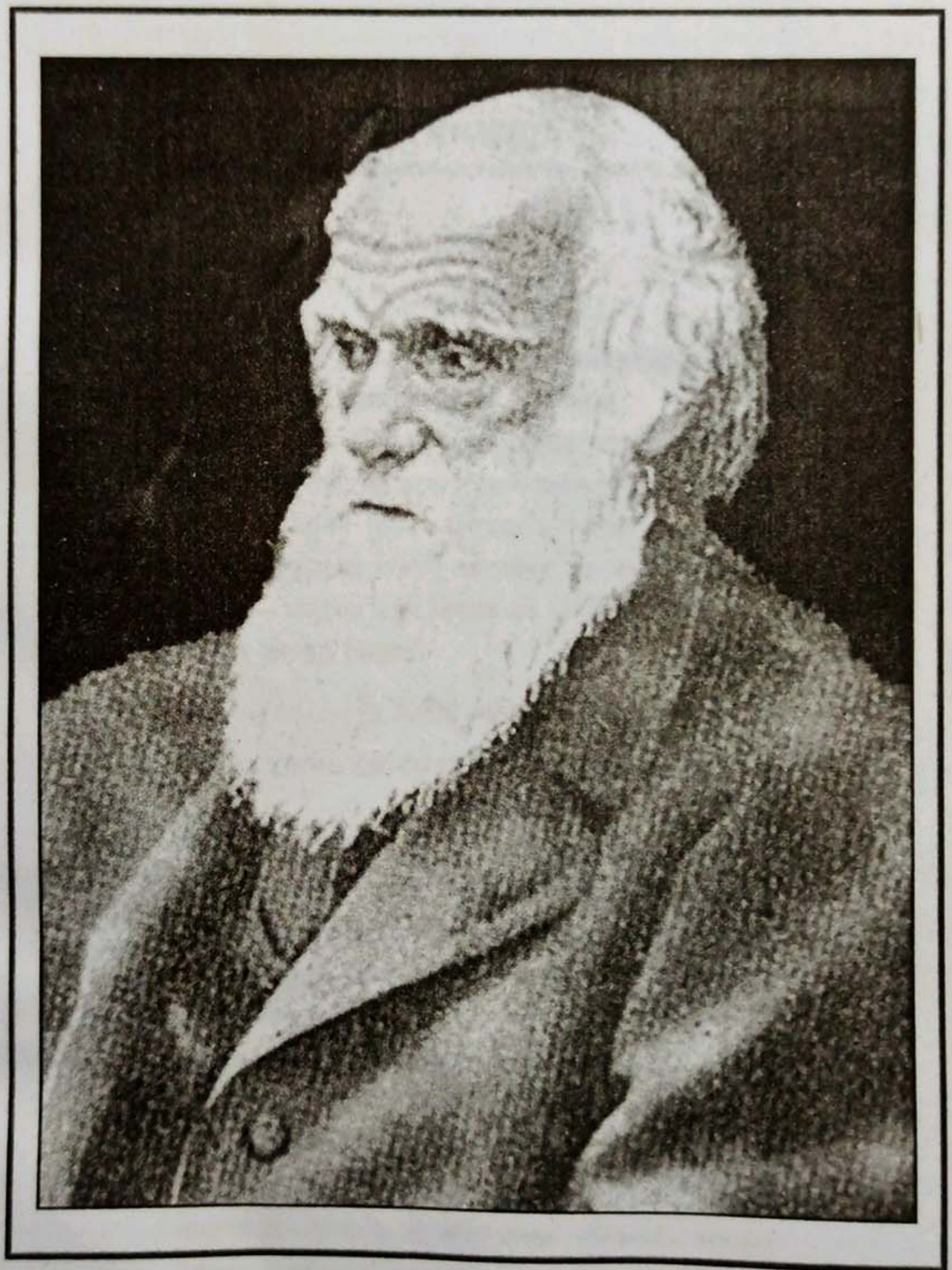

চার্লস ডারউইন

বিষয়সূচি

মুখবন্ধ

❑ প্রথম পরিচ্ছেদ ❑

নিম্নশ্রেণির কোনও জৈবিক গঠন থেকে মানুষরূপে ক্রমবিবর্তনের প্রমাণসমূহ

মানুষের উদ্ভব বিষয়ক প্রমাণসমূহের প্রকৃতি—মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে সমরূপ অঙ্গসংস্থান—পারস্পরিক সাদৃশ্যের বিবিধ বিষয়—ক্রমোন্নতি—আদিম বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের সংস্থান, মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, চুল, অস্থি, জননেন্দ্রিয় ইত্যাদি—মানুষের উদ্ভব বিষয়ক এই তিনটি মূল শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে তথ্যের বিন্যাস। (২৭-৪৬)

❑ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ❑

নিম্নতর কোনও জৈবিক গঠন থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষে উত্তরণের ধরন

মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠনের পরিবর্তনশীলতা—উত্তরাধিকার—রূপান্তরের কারণসমূহ—মানুষ এবং নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে রূপান্তরের একই নিয়মসমূহ—জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া—বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ধিত ব্যবহার ও অব্যবহারের ফলাফল—গতিরুদ্ধ বিকাশ—পুনরাবর্তন—পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রূপান্তর—বৃদ্ধির হার—বৃদ্ধিকে রোধ করা—প্রাকৃতিক নির্বাচন—পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে আধিপত্য বিস্তারকারী প্রাণী—তার শারীরিক কাঠামোর গুরুত্ব—তার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারার পিছনের কারণসমূহ—তার ফলে কাঠামোগত পরিবর্তন—শ্বদন্তের আয়তনের ক্রমহ্রাস—করোটির বর্ধিত আয়তন ও পরিবর্ধিত আকার—রোমহীনতা—লেজের অনুপস্থিতি—মানুষের প্রতিরোধহীন অবস্থা। (৪৭-৮৭)

❑ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ❑

মানুষের সঙ্গে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার তুলনা

সবচেয়ে অ-সভ্য মানুষ ও সবচেয়ে উচ্চশ্রেণির বানরদের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার ব্যাপক পার্থক্য—নির্দিষ্ট কিছু সহজাত প্রবৃত্তি—আবেগ—অনুসন্ধিৎসা—অনুকরণ—মনোনিবেশের ক্ষমতা---স্মৃতিশক্তি---কল্পনাশক্তি---যুক্তি---মস্তিষ্কের ক্রমবর্ধমান উন্নতি—জন্তু-জানোয়ার কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র—বিমূর্তায়ন, আত্মসচেতনতা—ভাবপ্রকাশের ভাষা—সৌন্দর্যবোধ—ঈশ্বরবিশ্বাস, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ, কুসংস্কার। (৮৮-১২৩)

❑ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ❑

মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার তুলনা, পূর্বের আলোচনার পরবর্তী অংশ

নৈতিক বোধ---মৌলিক প্রতিপাদ্য---সামাজিক প্রাণীর বৈশিষ্ট্য—সামাজিকতার উৎস— পরস্পরবিরোধী সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব---মানুষ একটি সামাজিক জীব—দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি স্বল্পস্থায়ী প্রবৃত্তিগুলির ওপর আধিপত্য করে—কেবলমাত্র অ-সভ্য বন্যদের চোখে মূল্যবান সামাজিক গুণসমূহ—আত্মসম্মানবোধ—বিকাশের উন্নততর অবস্থায় অর্জিত গুণ—আচার-আচরণ সম্পর্কে একই সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য—নৈতিক প্রবণতার পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা—সারসংকলন। (১২৪-১৫৮)

❑ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ❑

আদিম এবং সভ্য যুগে মননগত নৈতিক ক্ষমতার বিকাশ প্রসঙ্গে

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মননগত ক্ষমতার অগ্রগতি---অনুকরণের গুরুত্ব---সামাজিক ও নৈতিক কার্যক্ষমতা---একই গোষ্ঠীর মধ্যে এইসব ক্ষমতার বিকাশ—প্রাকৃতিক নির্বাচন যেভাবে সুসভ্য জাতিগুলিকে প্রভাবিত করেছে—সুসভ্য জাতিগুলিও যে একদা বর্বর অবস্থায় ছিল তার প্রমাণাবলি। (১৫৯-১৭৮)

❑ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ❑

মানুষের সাদৃশ্য এবং বংশবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে

জীবজগতের ধারাবাহিকতায় মানুষের স্থান—বংশবৃত্তান্তের প্রাকৃতিক নিয়ম—কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির অভিযোজনমূলক চরিত্র—মানুষ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যেকার বিভিন্ন ছোটখাটো সাদৃশ্য—প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় মানুষের স্থান—মানুষের উদ্ভবের স্থান ও মানুষের প্রাচীনত্ব—জীবাশ্মগত সংযোগসূত্রের অনুপস্থিতি—মানুষের বংশবৃত্তান্তের নিম্নতর স্তর, যা জানা যায় প্রথমত অন্যদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থেকে এবং দ্বিতীয়ত তার দৈহিক গঠন থেকে—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আদি উভলিঙ্গ অবস্থা—উপসংহার। (১৭৯-২০১)

❑ সপ্তম পরিচ্ছেদ ❑

মানুষের বিভিন্ন জাতি প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি ও গুরুত্ব

মানুষের বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়—মানুষের তথাকথিত জাতিগুলিকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবে ভাগ করার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—উপপ্রজাতি—একপ্রজাতির প্রবক্তা ও বহুপ্রজাতির প্রবক্তা—বৈশিষ্ট্যের সহধর্মিতা—একেবারে পৃথক পৃথক মানবজাতিগুলির মধ্যেও অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য—পৃথিবীতে প্রথম ছড়িয়ে পড়ার সময় মানুষের অবস্থা—প্রত্যেকটি জাতি একটিমাত্র জোড় থেকে সৃষ্টি হয়নি—বিভিন্ন জাতির বিলুপ্তি—বিভিন্ন জাতির গঠন— বিভিন্ন জাতির সদস্যদের মধ্যে যৌনমিলনের ফল—জীবনের বিভিন্ন অবস্থাগত প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার সামান্য প্রভাব—প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাব খুবই সামান্য বা একেবারেই নেই—যৌন নির্বাচন। (২০২-২৩৯)

❑ **সংযোজন** ❑

টমাস হেনরি হাক্সলি

মানুষ ও বানরের মস্তিষ্কের গঠন ও বিকাশে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য প্রসঙ্গে (২৪০-২৪৮)

মুখবন্ধ

কীভাবে বইটা লেখা হল, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে নিলে এই কাজটির প্রকৃতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। বেশ কিছু বছর যাবৎ আমি মানুষের উদ্ভব বা বিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করছিলাম, এখনই সেগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করব এমন কোনও সদিচ্ছা থেকে নয়, বরং প্রকাশ করার অনিচ্ছাই ছিল তখন। কারণ আমি জানতাম এর ফলে আমার মতবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক শোরগোল তোলা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমার মনে হয় 'অরিজিন অফ স্পিসিস' বইটির প্রথম সংস্করণে এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল যে এই বইটিতে 'মানুষের উদ্ভব ও তার বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে' এবং তার অর্থ হল পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির আবির্ভাবের রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে যে-কোনও সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মানুষকেও অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে একই তালিকাভুক্ত করতে হবে। কিন্তু সম্প্রতি এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যখন কাল ফখ্‌ৎ-এর মতো একজন প্রকৃতিতত্ত্ববিদ ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জেনেভার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনের সভাপতি হিসেবে খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই বলেন যে, 'অন্তত ইউরোপে কেউ আর এখন বিশ্বাস করে না যে সমস্ত প্রজাতির জীব পৃথকভাবে সৃষ্টি হয়েছে,' তখন এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রকৃতিতত্ত্ববিদদের অন্তত একটি বড় অংশই এখন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন একটি প্রজাতি হল অন্য একটি প্রজাতিরই রূপান্তরিত উত্তরাধিকারী। বিশেষত নবীন এবং উদীয়মান প্রকৃতিতত্ত্ববিদদের ক্ষেত্রে এ-কথা আরও বেশি করে সত্য। অনেকের কাছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) মতবাদটি সমাদৃত হলেও কেউ কেউ জোর দিয়ে বলছেন, আমি নাকি এটার ওপর বড় বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছি। বিচারকর্তা হিসেবে শেষ সিদ্ধান্ত অবশ্য ভবিষ্যৎই টানবে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞ এবং সম্মানীয় ব্যক্তিরা এখনও পর্যন্ত সবরকমে বিবর্তনতত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছেন।

অধিকাংশ প্রকৃতিতত্ত্ববিদ কর্তৃক এই মতবাদটি গৃহীত হওয়ার ফলে (সব ব্যাপারের মতো এক্ষেত্রেও শেষপর্যন্ত যাঁরা বিজ্ঞানী নন তাঁরাও ব্যাপারটা মেনে নেবেন) আমি আমার সংগৃহীত তথ্যগুলি সাজিয়ে নিলাম, যাতে দেখতে পারি আমার আগেকার

রচনার সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি মানুষের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য। এটা করার দরকারও ছিল, কারণ আমি কখনও কোনও-একটি বিশেষ প্রজাতির ওপর আলাদাভাবে এই মতবাদ প্রয়োগ করে দেখিনি। আমরা যখন কোনও-একটি প্রজাতির ওপর আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তখন প্রকৃতির সংযুক্তি-প্রবণতা থেকে উদ্ভূত জোরালো যুক্তিগুলি এসে আমাদের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায়। এই সংযুক্তি-প্রবণতা জীবজগতের সমস্ত বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে—যেমন অতীত ও বর্তমান সময়ে তাদের ভৌগোলিক বিভাজন এবং তাদের ভূতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার। আমাদের দৃষ্টির সান্নিধ্যে এসে পড়া কোনও প্রজাতি—তা সে মানুষ বা অন্য প্রাণী যা-ই হোক না কেন—তাদের গঠনের সাদৃশ্য, ভ্রূণের বিকাশ ও প্রাথমিক পর্যায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সবকিছুই বিচার করে দেখা উচিত। তবে আমার মনে হয় এই সুপ্রচুর তথ্য এখন সুস্পষ্টভাবেই বিবর্তনবাদের ভিত্তিকে জোরদার করে তুলেছে। একই সঙ্গে বিবর্তনের সপক্ষে অন্যান্য তথ্য থেকে পাওয়া জোরালো যুক্তিগুলিও মনে রাখতে হবে।

এই বইটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল এটা বিচার করে দেখা যে, প্রথমত, মানুষ অন্যান্য সমস্ত প্রজাতির মতো পূর্বোদ্ভূত কোনও জীব থেকে সৃষ্ট কি না ; দ্বিতীয়ত, কীভাবে তার ক্রমোন্নতি ঘটেছে; এবং তৃতীয়ত, মানুষের তথাকথিত জাতিগুলির মধ্যে পার্থক্যের তাৎপর্য কী। এই বিষয়গুলির মধ্যেই আমার বর্তমান আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব বলে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যেকার পার্থক্য প্রসঙ্গে অহেতুক কোনও গভীর বিশ্লেষণে যাব না। কারণ এ এক বিশাল কাজ এবং অনেক মূল্যবান গবেষণায় ব্যাপকভাবে আলোচিতও বটে। মানুষের অস্তিত্ব যে বহু প্রাচীন, সেটা সম্প্রতি প্রথমত মঁসিয়ে বুসার দ্য পার্থের প্রচেষ্টায় এবং পরে একদল সুপণ্ডিত ব্যক্তির বিপুল পরিশ্রমের ফলে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মানুষের উদ্ভবকে বোঝার পক্ষে এ-সবই অপরিহার্য উপাদান। সেইজন্য এই সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য বলে ধরে নিয়ে পাঠকদের আমি স্যর চার্লস লাইয়েল্, স্যর জন লুবক এবং অন্যদের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি পড়ে দেখতে অনুরোধ করব। মানুষের সঙ্গে বনমানুষের তফাত সম্বন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ করা ছাড়া আমি আর কিছু বলব না এই রচনায়, কারণ অধ্যাপক হাক্সলি (বহু গবেষক ও সমালোচক তাঁর মতামত মেনেও নিয়েছেন) নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন—প্রতিটি দৃশ্যমান বিষয়ে মানুষের সঙ্গে উচ্চশ্রেণির বানরদের যতটা তফাত, তার থেকে উচ্চশ্রেণির বানরদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণির বানরদের তফাত অনেক বেশি।

মানুষ সম্পর্কে মৌলিক কোনও তথ্য এখানে খুব কমই আছে। কিন্তু মোটামুটি একটা খসড়া করার পর আমি যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, তা আমার বেশ মনমতো হয়েছিল এবং ভেবেছিলাম অন্যদেরও তা কৌতূহলী করে তুলবে। অনেকসময় খুব জোর দিয়ে

বলা হয়—মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে কখনওই কিছু জানা যাবে না। আসলে অজ্ঞতা সবসময়েই প্রকৃত জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। সেইজন্য যারা জানে তারা নয়, বরং যারা কিছু জানে না বা বোঝে না তারাই খুব জোর দিয়ে বলে যে এই সমস্যাটা বা ওই সমস্যাটা কিছুতেই বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভবপর নয়।

প্রাচীনকালের কোনও নিম্নতর এবং বর্তমানে বিলুপ্ত কোনও জৈবিক গঠনের থেকেই যে অন্যান্য কিছু প্রজাতির সঙ্গে মানুষও উদ্ভূত হয়েছিল—এই সিদ্ধান্তটি আদৌ কোনও নতুন সিদ্ধান্ত নয়। লামার্ক বহুদিন আগেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু বিশিষ্ট প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকও এই মত সমর্থন করেছেন। যেমন—ওয়ালেস, হাক্সলি, লাইয়েল, ফখ্‌ৎ, লুবক, বুখনার, রল্‌ প্রমুখ এবং বিশেষত হ্যাকেল। হ্যাকেল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'জেনারেল মরফোলজি' (১৮৬৬) ছাড়াও সম্প্রতি (১৮৬৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭০-এ) প্রকাশ করেছেন 'Naturiliche Schopfungs geschicte' রচনাটি। এতে তিনি মানুষের বংশবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমার প্রবন্ধটি লেখা হওয়ার আগে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে আমি হয়তো কোনওদিনই আমার প্রবন্ধটি শেষ করে উঠতে পারতাম না। আমি যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তার প্রায় প্রত্যেকটিই সমর্থিত হয়েছে এই প্রকৃতিবিজ্ঞানীর রচনায়। অনেক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আমার থেকে অনেক বেশি, অনেক পূর্ণাঙ্গ। অধ্যাপক হ্যাকেল-এর রচনা থেকে কোনও তথ্য বা দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করার সময় আমি সর্বদাই সরাসরি তাঁর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। অন্যান্য বিবৃতিগুলি আমার পাণ্ডুলিপিতে যেমন ছিল তেমনই রেখেছি, শুধু অনিশ্চিত বা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও পাদটীকায় তাঁর রচনার কথা উল্লেখ করেছি।

বহু বছরের পর্যবেক্ষণের ফলে আমার মনে হয়েছে মানুষের বিভিন্ন জাতিতে ভাগ হয়ে যাওয়ার পিছনে যৌন নির্বাচন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু 'অরিজিন অফ স্পিসিস'-এ এই বিশ্বাসের কথাটুকু শুধু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থেকেছি আমি। মানবজাতিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিচার করতে বসে আমি বুঝতে পারি যে সমগ্র বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।[১] ফলস্বরূপ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি, যেখানে যৌন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা প্রথম খণ্ডের তুলনায় অত্যধিক দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এছাড়া অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। মানুষ এবং

১। এই রচনাটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনও পর্যন্ত অধ্যাপক হ্যাকেলই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি 'অরিজিন অফ স্পিসিস' প্রকাশিত হওয়ার আগে যৌন নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং বিষয়টির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁর বিভিন্ন রচনায় চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন তিনি।

নিম্নতর শ্রেণির প্রাণীদের বিভিন্ন আবেগের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছে ছিল। বহু বছর আগে স্যর চার্লস বেল্-এর গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি পড়ার পরই এই বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই বিশিষ্ট শারীরতত্ত্ববিদের মতে, মানুষের শরীরে এমন কিছু পেশী আছে যেগুলি শুধুমাত্র আবেগ প্রকাশ করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। এই ধারণাটি স্পষ্টতই অন্য কোনও নিম্নতর জৈবিক গঠন থেকে মানুষের উদ্ভব সংক্রান্ত ধারণার বিরোধী। তাই এ-বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সদস্যদের আবেগ প্রকাশের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য আছে, তা-ও দেখানোর ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের আয়তনের কথা ভেবে ওই প্রবন্ধটিকে আলাদাভাবে প্রকাশ করার জন্য রেখে দিতে হল।

১৮৭১

চার্লস ডারউইন

ডিসেন্ট অফ ম্যান

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিম্নশ্রেণির কোনও জৈবিক গঠন থেকে মানুষরূপে ক্রমবিবর্তনের প্রমাণসমূহ

মানুষের উদ্ভব বিষয়ক প্রমাণসমূহের প্রকৃতি—মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে সমরূপ অঙ্গ সংস্থান—পারস্পরিক সাদৃশ্যের বিবিধ বিষয়—ক্রমোন্নতি—আদিম বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের সংস্থান, মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, চুল, অস্থি, জননেন্দ্রিয় ইত্যাদি—মানুষের উদ্ভব বিষয়ক এই তিনটি মূল শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে তথ্যের বিন্যাস।

মানুষ কোনও পূর্বোদ্ভূত নিম্নশ্রেণির প্রজাতিরই বিবর্তিত উন্নততর রূপ কি না জানতে চাইলে প্রথমেই জানতে হবে শারীরিক গঠন ও মানসিক গুণের বিচারে মানুষ তাদের থেকে কোনওভাবে ভিন্ন কি না—তা সে ভিন্নতা যতই সামান্য হোক না কেন, আর যদি তাই হয়, তাহলে নিম্নশ্রেণির জীবদের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের মতো মানুষের বেলাতেও সেটা বংশগতভাবে বর্তায় কি না। আবার, এই ভিন্নতা কি অন্য প্রাণীদের মতো একই সাধারণ কারণজনিত কোনও ফল এবং সেগুলো কি তাদের মতো একই নিয়মের বশবর্তী, যেমন, শরীরের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কোনও অঙ্গের ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলস্বরূপ বংশগতভাবে তার প্রভাব ইত্যাদি? মানুষও কি একইভাবে অঙ্গের অসঙ্গতিতে, ক্রমবিকাশের সীমাবদ্ধতায় তার পূর্বতন বা আদিম অবস্থার দৈহিক গঠনের কোনও নিয়মে পুনরায় ফিরে যেতে পারে? খুব স্বাভাবিকভাবেই এটাও নিশ্চয় জিজ্ঞাস্য হতে পারে যে অন্যান্য বহু প্রাণীর মতো মানুষও কি বিভিন্ন প্রকারের ও উপজাতির মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে, যাদের মধ্যে তফাত অতি সামান্য, কিংবা কখনও কখনও এত বেশি যে তাদের সন্দেহজনক প্রজাতি হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করতে হবে? কীভাবে এই জাতিগুলি পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে? যৌন মিলনের পরে কীভাবে তারা প্রথম এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে? এইভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন আমাদের সামনে ক্রমশ উপস্থিত হয়।

প্রশ্নকর্তা এরপর আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে চলে আসবেন—মানুষের মধ্যে কি এত দ্রুতহারে বংশবৃদ্ধির প্রবণতা আছে যে টিকে থাকবার জন্য তাকে প্রায়শই কঠিন জীবনসংগ্রাম করতে হবে? এবং তার ফলস্বরূপই কি শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে সুবিধাজনক বৈচিত্র্যগুলি রক্ষা পায় আর ক্ষতিকর বৈচিত্রগুলি নির্মূল হয়ে যায়? তবে কি মানুষের সব জাতি অথবা প্রজাতি, যে অভিধা-ই ব্যবহার করা হোক না কেন, জোর করে একে অন্যকে সরিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ? আমার দেখব এই সমস্ত প্রশ্নেরই, যা বাস্তবিকপক্ষে

তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, উত্তর হবে হ্যাঁ-বাচক, ঠিক নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের নিয়মপদ্ধতির মতোই। এখানে উল্লিখিত কিছু প্রশ্নের আলোচনা আপাতত স্থগিত রাখব এবং প্রথমে আমরা দেখব যে মানুষের শারীরিক গঠনে কম-বেশি এমন কোনও চিহ্ন আছে কি না যার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় মানুষের উদ্ভব হয়েছে নিম্নশ্রেণির কোনও জৈবিক রূপ থেকে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে মানুষের মানসিক শক্তির সঙ্গে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মানসিক শক্তির তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

মানুষের শারীরিক গঠন

এটা শুনতে বেশ খারাপ লাগারই কথা যে মানুষের শারীরিক গঠন ঠিক অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুর আকার বা গড়নের মতোই। তার কাঠামোর সমস্ত হাড়কেই বানর, বাদুড় বা সীলমাছের হাড়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তার পেশী, স্নায়ু, রক্তবাহী নালি বা শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মস্তিষ্কও যে এই একই নিয়ম মেনে চলে সেটাও অধ্যাপক হাক্সলি ও অন্যান্য শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা দেখিয়েছেন। বিশোফ-এর মতো একজন বিরোধী সমালোচকও স্বীকার করেছেন যে মানুষের মস্তিষ্কের প্রতিটি প্রধান অংশ ও ভাঁজের সঙ্গে ওরাং-ওটাং-এর মস্তিষ্কের সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু তিনি মনে করেন মস্তিষ্কের বিকাশের কোনও পর্যায়েই উভয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল ছিল না এবং তা থাকতেও পারে না, কারণ তাহলে তো তাদের মানসিক শক্তিও একই রকমের হত। ভালপিয়ান বলেছেন, 'মানুষের সঙ্গে বনমানুষের মস্তিষ্কের সত্যিকারের তফাত খুব কম। এই ব্যাপারে যেন কেউ ভুল না করেন যে মস্তিষ্কের চরিত্র, করোটির গঠন ও আকারে মানুষের অবস্থান একেবারে বনমানুষের কাছাকাছি। তাছাড়া বেবুন ও সাধারণ জাতের বানরদের সঙ্গেও করোটির গঠনের ব্যাপারে মানুষের যথেষ্ট মিল আছে।' কিন্তু মস্তিষ্কের গঠন বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয়ে মানুষ ও উচ্চশ্রেণির স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্যের বর্ণনা এখানে নিতান্তই অর্থহীন।

তবে শারীরিক গঠনের সঙ্গে সরাসরি বা সুস্পষ্ট কোনও সম্বন্ধ না থাকলেও দু'-একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন, যেগুলির সাহায্যে এই সাদৃশ্য বা সম্পর্ককে ভালভাবে দেখানো যেতে পারে।

নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের থেকে কিছু রোগ যেমন মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়, তেমনি মানুষও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের কিছু কিছু রোগের কারণ, যেমন গ্ল্যান্ডার্স, জলাতঙ্ক, বসন্ত, সিফিলিস, কলেরা, হার্পিস ইত্যাদি। এই তথ্য উভয়ের মধ্যেকার স্নায়ুকলা এবং রক্তের মুখ্য গঠন ও উপাদানের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যকে যতটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে, ততটা স্পষ্ট প্রমাণ সবচেয়ে সংবেদনশীল অণুবীক্ষণ বা সবচেয়ে ভাল রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যেও পাওয়া যায় না। আমাদের মতোই বানরদেরও কিছু রোগ হয় যেগুলি আদৌ সংক্রামক নয়। অধ্যাপক রেঙ্গার, সেবুস আজারে নামে একশ্রেণির বানরকে তাদের নিজস্ব বাসভূমিতে দীর্ঘদিন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে

তারা সর্দিতে ভোগে এবং তার সাধারণ লক্ষণগুলি মানুষের ক্ষেত্রেও একই। ঘন ঘন সর্দি হলে তারা ক্ষয়রোগেও আক্রান্ত হয়। তাছাড়া এই ধরনের বানররা সন্ন্যাস রোগ, পেট ফুলে যাওয়া এবং চোখে ছানি প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়। শৈশবে দুধে-দাঁত পড়ার সময় প্রায়ই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তারা। এদের ওপর ওষুধের ক্রিয়াও ঠিক আমাদেরই মতো। কোনও কোনও জাতের বানরদের আবার চা, কফি এবং উৎকৃষ্ট মদের ওপর দারুণ লোভ থাকে। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে তারা খোশমেজাজে ধূমপানও করে।[১] ব্রেহ্‌ম একে সমর্থন করে বলেছেন যে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীরা বুনো বেবুনদের ধরার জন্য কড়া দেশজ মদ ভর্তি পাত্র টোপ হিসেবে ব্যবহার করে, কারণ তা খেয়ে তারা সহজেই মাতাল হয় পড়ে। তিনি এই ধরনের কিছু মাতাল বেবুনকে আটক রেখে পরীক্ষা করে তাদের ব্যবহার ও আশ্চর্য মুখভঙ্গি সম্পর্কে নানা মজাদার তথ্য পেশ করেছেন। পরের দিন সকালে তারা অত্যন্ত হতাশ ও খিটখিটে হয়ে পড়ে। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে করুণভাবে তাকিয়ে থাকে। তখন বিয়ার বা মদ দিলে তারা বিরক্তি প্রকাশ করে কিন্তু লেবুর জল পেলে তারিয়ে তারিয়ে পান করে। এটেলেস জাতীয় আমেরিকান বানররা একবার ব্র্যান্ডি খেয়ে মাতাল হবার পর আর কখনও তা স্পর্শ পর্যন্ত করে না। দেখা যাচ্ছে কখনও কখনও তারা মানুষের চেয়েও সুবিবেচক। এইসমস্ত সামান্য ঘটনা প্রমাণ করে মানুষ ও বানরের স্বাদগ্রহণের স্নায়ুগুলি কত কাছাকাছি এবং উভয়ের স্নায়ুতন্ত্র কীরকম একইভাবে কাজ করে থাকে।

মানুষের দেহে অভ্যন্তরস্থ পরজীবী জীবাণুর আক্রমণ কখনও কখনও তার মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া বহিঃস্থ পরজীবীরাও নানাভাবে আক্রমণ করে। এই একই জাতি বা বংশের অন্তর্ভুক্ত পরজীবীরা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরও আক্রমণ করে এবং খোসপাঁচড়ার ক্ষেত্রেও আক্রমণকারী পরজীবীগুলি হয়ে থাকে একই প্রজাতির। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীব, পাখি, এমনকী পোকামাকড়দের মতোই মানুষও গর্ভধারণ, রোগের আক্রমণ ও তার স্থায়িত্ব ইত্যাদি প্রায় সব বিষয়েই একই রহস্যময় নিয়মের অনুবর্তী এবং চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের যে-কোনও ক্ষতও আরোগ্যলাভের পথে তাদের মতো প্রায় একই উপায়ে সেরে ওঠে এবং অঙ্গচ্ছেদনের পর কোনও ক্ষত সৃষ্টি হলে, বিশেষ করে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায়, ক্ষতস্থান কিছুটা পুনর্গঠিত হয়, ঠিক যেমনটি নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের বেলাতেও ঘটে থাকে।

জীবের জন্ম সংক্রান্ত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি, পুরুষের প্রণয়-নিবেদন থেকে শুরু করে সন্তানের জন্মদান ও লালন-পালন পর্যন্ত, আশ্চর্যজনকভাবে সকল স্তন্যপায়ী

১। জীবজগতের খুব নিচু স্তরের কিছু কিছু প্রাণীর মধ্যে ওইসব বস্তুর প্রতি একইরকম আসক্তি লক্ষ করা যায়। মিঃ এ. নিকেলস আমাকে জানিয়েছেন তিনি অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে ফ্যাসিওলারক্টাস সিনেরাস নামক তিনটি নিম্নশ্রেণির বানর জাতীয় প্রাণীর ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে কোনওরকম অনুশীলন ছাড়াই তারা মদ ও ধূমপানের প্রতি তীব্র আসক্তি প্রকাশ করেছে।

প্রাণীদের ক্ষেত্রে একইরকম। মানুষের বাচ্চার মতো বানররাও প্রায় একইরকম অসহায় অবস্থার মধ্যে জন্মায়। কোনও কোনও জাতের বানররা আবার মানুষের মতোই শৈশবে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক বাপ-মায়ের মতো দেখতে হয় না। কেউ কেউ বেশ জোর দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভেদ দেখান এই বলে যে অন্যান্য জীবের তুলনায় মানবশিশুর পরিণত হয়ে উঠতে কিছু বেশি সময় লাগে। কিন্তু যদি আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষদের লক্ষ করি তাহলে দেখব এই প্রভেদ এমন কিছু বেশি নয়। কারণ একটি ওরাং শিশুও দশ থেকে পনেরো বছরের আগে যৌবন লাভ করে না। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবের পুরুষদের মতোই মানবজাতির পুরুষেরাও দেহের আকার, শারীরিক শক্তি, চুলের পরিমাণ ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের জাতের মেয়েদের থেকে আলাদা, উভয়ের মানসিক গঠনেও প্রচুর প্রভেদ থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উচ্চশ্রেণির জীব, বিশেষত বনমানুষেরা, দৈহিক গঠন, পেশীতন্তুর গঠন, জীব রাসায়নিক গঠন, মানসিক গঠন প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের খুবই কাছাকাছি জায়গায় রয়েছে।

ভ্রূণের ক্রমবিকাশ

মানুষের ভ্রূণ, যা এক ইঞ্চির প্রায় একশো পঁচিশ ভাগ ব্যাসবিশিষ্ট একটি ডিম্বাণু থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়, তা কোনও অর্থেই অন্য প্রাণীদের ডিম্বাণুর থেকে আলাদা নয়। মানুষের ভ্রূণকেও প্রাথমিক অবস্থায় অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের থেকে আলাদা করে চেনা প্রায় অসম্ভব। এই সময় শরীরের রক্তবাহী ধমনীগুলো ধনুকের মতো বাঁকানো অবস্থায় থাকে, যেন ব্রঙ্কিয়া-তে রক্ত পাঠাবার জন্যই এমন ব্যবস্থাপনা। কিন্তু উচ্চশ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এ-রকম কোনও ব্যবস্থা না থাকলেও দেখা যায় তাদের গলার কাছে (১নং ছবি, f ও g) পূর্বাবস্থার নিদর্শন হিসেবে চেরা দাগ রয়ে গেছে। পরবর্তী পর্যায়ে হাত-পায়ের ক্রমোন্নতি ঘটে। সুবিখ্যাত ফন্ বেয়ার লিখেছেন, 'সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীদের পা, পাখির ডানা ও পা এবং মানুষের হাত-পা—সবই সেই একই প্রাথমিক গঠন থেকে সৃষ্ট।' অধ্যাপক হাক্সলি বলেছেন, 'বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের সঙ্গে বানরের কিছু কিছু প্রভেদ চোখে পড়ে। আবার বানরদের সঙ্গে কুকুরের বিকাশে যতটা তফাত, প্রায় ততটাই তফাত চোখে পড়ে কুকুরের সঙ্গে মানুষের বিকাশের বেলাতেও। শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি আশ্চর্য মনে হলেও এটি পরীক্ষিত সত্য।'

যেহেতু এই বইয়ের অনেক পাঠকের ভ্রূণের গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই, তাই মানুষ ও কুকুরের ভ্রূণের দুটি ছবি এখানে দেওয়া হল। দুটিই বিকাশলাভের প্রাথমিক পর্যায়ের চিত্র, খুব সাবধানে ও যতদূর সম্ভব নির্ভুলভাবে অনুকৃত।[২]

উচ্চ পর্যায়ের ওইসব বিশেষজ্ঞদের মতামত উদ্ধৃত করার পর, একগাদা ধার করা তথ্যের সাহায্যে আমার পক্ষে এটা দেখানো নিতান্তই অর্থহীন যে মানুষের ভ্রূণ অবিকল অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরই মতো। তবে এটুকু বলা যায় যে মানুষের ও

২। মানুষের ভ্রূণের ছবিটির জন্য অধ্যাপক একারের 'আইকন ফিজিওল', ১৮৫১-১৮৫৯,

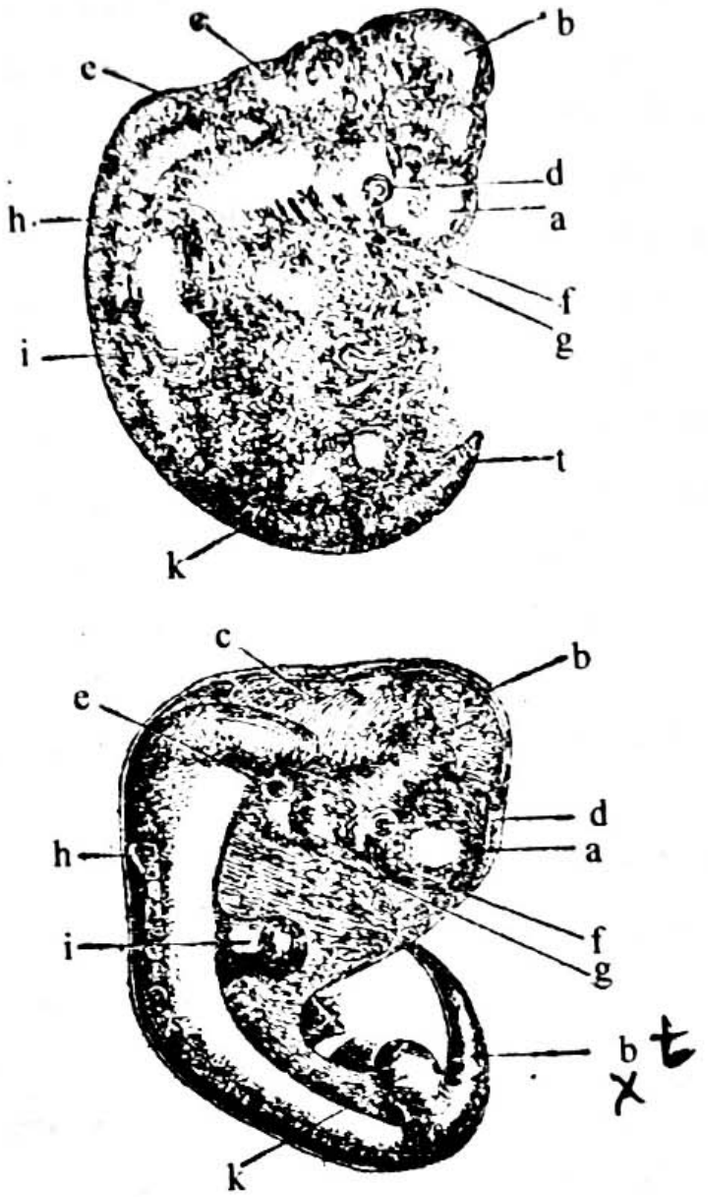

১নং ছবি—উপরে মানুষের ভ্রূণের ছবিটি একার-এর গ্রন্থ থেকে নেওয়া। নীচে কুকুরের ভ্রূণের ছবিটি বিশোফের গ্রন্থ থেকে পাওয়া।

a. সম্মুখ-মস্তিষ্ক, সেরিব্রাল হেমস্ফিয়ারস
b. মধ্য-মস্তিষ্ক, কর্পোরা কোরাড্রিজেমিনা
c. পশ্চাৎ-মস্তিষ্ক, সেরিবেলাম, মেডুলা অবলংগাটা
d. চোখ
e. কান
f. প্রথম ভিসেরাল আর্চ
g. দ্বিতীয় ভিসেরাল আর্চ
h. ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়ায় মেরুদণ্ডী স্তম্ভ ও মাংসপেশী
i. সম্মুখবর্তী } হাত-পা
k. পশ্চাদ্‌বর্তী }
l. লেজ বা অনুত্রিকাস্থি

সারণী ৩০, ছবি ২ দ্রষ্টব্য। ভ্রূণটি প্রকৃত মাপের চেয়ে দশগুণ বড় করে দেখানো হয়েছে। কুকুরের ভ্রূণটির জন্য অধ্যাপক বিশোফের 'Entwicklungsgeschichte des Hunde-Eies', ১৮৪৫, সারণী ১১, ছবি ৪২ বি দ্রষ্টব্য। ছবিটি একটি পঁচিশ দিন বয়সের ভ্রূণের প্রকৃত মাপের চেয়ে পাঁচগুণ বড়। দুটি চিত্রেই অন্তর্বর্তী নাড়ি-ভুঁড়ি ও গর্ভাশয়ের উপাদানসমূহকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক হাক্সলির 'Man's Place in Nature' নামক বই থেকে প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী ছবি দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে। অধ্যাপক হ্যাকেলও তাঁর 'Schopfungsgeschichte' নামক গ্রন্থে একইরকম ছবি ব্যবহার করেছেন।

নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের ভ্রূণবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে গঠনগত সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, ভ্রূণের প্রথম অবস্থায় হৃদপিণ্ড বলতে শুধুমাত্র একটি ধুক্‌ধুক্‌ করা নালীকেই বোঝায়; দেহের যাবতীয় বর্জ্যপদার্থ একটি সরু পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে; এবং অনুত্রিকাস্থি (os coccyx) সত্যিকারের লেজের মতো বেরিয়ে থাকে, 'প্রাথমিক অবস্থার পায়ের পেছন থেকে লম্বা হয়ে।'[৩]

শ্বাসযন্ত্র সম্বলিত সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণে করপোরা উলফিয়ানা নামে একটি গ্রন্থি থাকে যা দেখতে ও কাজে পরিণত মাছের বৃক্কের মতো।[৪] এমনকী ভ্রূণের বিকাশের শেষ পর্যায়েও মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে কিছু আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। অধ্যাপক বিশোফের মতে, মানুষের ভ্রূণের সাত মাস বয়সের সময় তার মস্তিষ্কের ভাঁজ একটি পূর্ণবয়স্ক বেবুনের মতো বিকাশের একই পর্যায়ে পৌঁছয়। অধ্যাপক ওয়েন বলেছেন, পায়ের বুড়ো আঙুল 'যা দাঁড়াতে বা হাঁটতে আলম্ব হিসেবে কাজ করে, সেটিই সম্ভবত মানুষের গঠনের সবচাইতে উল্লেখযোগ বৈশিষ্ট্য।' কিন্তু অধ্যাপক উইম্যান প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা একটি ভ্রূণকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, 'পায়ের বুড়ো আঙুল অন্যান্য আঙুলের চাইতে ছোট এবং তাদের সঙ্গে সমান্তরাল না থেকে একপাশে বাঁকানো অবস্থায় থাকে, যা এ-বিষয়ে অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীদের স্বাভাবিক অবস্থার মতোই।' অধ্যাপক হাক্সলির লেখা থেকে আর-একটি উদ্ধৃতি দিয়ে ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনার ছেদ টানব আমি। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—মানুষ কি কুকুর, ব্যাঙ, পাখি বা মাছের থেকে স্বতন্ত্র কোনও উপায়ে সৃষ্টি হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'এ প্রশ্নের নিঃসংশয়ে উত্তর একটাই—মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের ধারা তার ঠিক পরের স্তরের প্রাণীদের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত। এ-বিষয়ে কুকুর ও বানরের মধ্যে যতটা মিল, তার চেয়ে অনেক বেশি মিল দেখা যায় বানর ও মানুষের মধ্যে।'

মৌলিক বা প্রাথমিক অঙ্গ

এ-বিষয়টি যদিও আগের দু'টি বিষয়ের মতো অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবুও অন্য কারণে এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। উচ্চশ্রেণির এমন কোনও একটি প্রাণীরও নাম করা যাবে না, যারা আদিম অবস্থার কোনও অঙ্গ এখনও শরীরে বহন করে না—এমনকী মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গগুলিকে পরবর্তীকালে সৃষ্ট অঙ্গগুলির থেকে আলাদা করতে হবে, যদিও সবসময় কাজটি খুব সহজ নয়। হয় প্রাথমিক অঙ্গগুলি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েছে [যেমন পুরুষ-চতুষ্পদদের দুগ্ধগ্রন্থি বা জাবরকাটা প্রাণীদের কৃন্তক দন্ত (incisor), যা কখনওই মাড়ি কেটে বেরোতে পারে না], অথবা বর্তমান প্রজন্মে সেগুলো এত সামান্য কাজে লাগে যে আজকের মতো অবস্থাতেই সেগুলো কোনওদিন সৃষ্ট হয়েছিল বলে মনেই

৩। অধ্যাপক উইম্যান, 'প্রোক্লেম অফ আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস', চতুর্থ খণ্ড।

৪। অধ্যাপক ওয়েন, 'অ্যানাটমি অফ ভার্টিব্রেটস', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৩।

হয় না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের অঙ্গগুলিকে অবশ্য সরাসরি প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গ বলা যায় না, কিন্তু তারা ক্রমশ সেদিকেই এগোচ্ছে। অন্যদিকে, পরবর্তীকালে সৃষ্ট বা বর্ধিষ্ণু (Nascent) অঙ্গগুলি সম্পূর্ণ বিকশিত না হলেও খুবই প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনে সেগুলো আরও বিকশিত হতে পারে। প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গগুলি বস্তুত পরিবর্তনশীল। এর কারণটাও সহজবোধ্য। আসলে এগুলো এখন অকেজো বা প্রায়-অকেজো, ফলে তারা আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের অধীন নয়। কখনও কখনও এগুলো একেবারে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেলেও অনেক সময় উল্টো পথে তাদের পূর্বাবস্থায় আবার ফিরে যেতে পারে, যে কারণে বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য।

যে যে কারণে বিভিন্ন অঙ্গ প্রাথমিক অবস্থায় থেকে গেছে তার মুখ্য কারণ হল বয়ঃপ্রাপ্তির কালে অঙ্গগুলির অব্যবহার, যে-সময়ে এদের ব্যবহৃত হওয়ার কথা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া বংশগতির প্রভাবজনিত কারণও আছে। 'অব্যবহার' মানে কিন্তু শুধু পেশীসমূহের ক্রিয়ার হ্রাস নয়, শরীরের কোনও অংশে বা অঙ্গে রক্তচাপের অদলবদলে রক্তপ্রবাহের স্বল্পতা অথবা কোনও অঙ্গের অভ্যাসজনিত নিষ্ক্রিয়তার কথাও মনে রাখতে হবে। তবে প্রাথমিক অঙ্গগুলি অনেক সময় কোনও প্রজাতির স্ত্রী বা পুরুষদের মধ্যে অকেজো অবস্থায় দেখা যেতে পারে, যা কিনা ওই একই প্রজাতির বিপরীত লিঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত থাকতে পারে। এই আদিম বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গগুলি, আমরা পরে দেখব, প্রায়শই সৃষ্টি হয়েছে এখানে উল্লিখিত অঙ্গগুলির থেকে স্বতন্ত্র উপায়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অঙ্গগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেও অবলুপ্ত হয়েছে, কারণ প্রজাতির জীবনে পরিবর্তিত অভ্যাসের পক্ষে সেটা হয়তো ক্ষতিকর ছিল। হ্রাস বা অবলুপ্তির এই প্রক্রিয়া সম্ভবত ক্ষতিপূরণ ও বৃদ্ধির মিতাচার (economy of growth)—এই দু'টি মৌলিক নীতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অঙ্গের ক্রমহ্রাসমানতার শেষ পর্যায়ে যখন অব্যহারজনিত কারণে অঙ্গহ্রাস সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বৃদ্ধির মিতাচারজনিত কারণও আর তেমন সক্রিয় নয়, সেই পর্যায়টিকে বুঝে ওঠা খুবই দুরূহ। কোনও অঙ্গ যা ইতিমধ্যেই অকেজো ও ক্ষুদ্রাকার হয়ে পড়েছে, তার চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণ বিলুপ্তিকে, যেক্ষেত্রে উপরিউক্ত নীতিদ্বয়ের কোনও ভূমিকা নেই, সম্ভবত প্যানজেনেসিসের প্রকল্প (hypothesis of pangenesis) দিয়ে বোঝা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গের সম্পূর্ণ বিষয়টি আমার আগের একটি লেখায় ব্যাখ্যা সহকারে আলোচিত হয়েছে, তাই এ ব্যাপারে এখানে আর কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি না।

মানবশরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাথমিক অবস্থার কিছু পেশী লক্ষ করা যায়।[৫]

৫। উদাহরণস্বরূপ, মিঃ রিচার্ড (Annales des sciences Nat.—তৃতীয় শ্রেণি, প্রাণীতত্ত্ব; ১৮৫২, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১৩) সেইসমস্ত প্রাথমিক বা আদিম শরীর-অংশের বর্ণনা ও ছবি দিয়েছেন, যাদের তিনি বলেছেন 'হাতের বংশানুক্রমিক (pedieux delamain) পেশী, যেগুলো কখনও কখনও খুবই ছোট আকারের হয়। অপর একটি পশ্চাদ্‌বর্তী টিবিয়াল (be tibial) পেশী, যা সাধারণত বর্তমানে হাতে অনুপস্থিত থাকে কিন্তু মাঝে মাঝে পেশীটিকে কম-বেশি আদিম বা প্রাথমিক অবস্থায় পুনরাবির্ভূত হতে দেখা যায়।

নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের শরীরের বেশ কিছু পেশীকেও অনেক সময় খুবই হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থায় মানুষের শরীরে দেখা যায়। প্রত্যেকেই লক্ষ করে থাকবেন যে বহু প্রাণী, বিশেষত ঘোড়া, তার শরীরের চিকন চামড়াকে সর্বত্র আশ্চর্যভাবে নাড়াতে বা কাঁপাতে পারে, এবং তা সম্ভব হয় প্যানিকিউলাস কারনোসাস্ নামক পেশীর জন্য। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশেও এই পেশীটির কার্যকারিতা দেখা যায়। যেমন কপালে, যার সাহায্যে আমরা ভ্রূ তুলতে পারি। ঘাড়ের কাছের সুবিকশিত প্লাটিস্মা মাইওডিস এইরকম পেশী। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টার্নার জানিয়েছেন, শরীরের পাঁচটি ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত পেশীতন্তু, যেমন বগল, স্কন্ধাস্থির নিকটে ইত্যাদি জায়গার সমস্ত পেশীগুলিই প্যানিকিউলাস পেশীব্যবস্থার অন্তর্গত। প্রায় ছ'শো মানবশরীর পরীক্ষা করে শতকরা তিনভাগ শরীরে তিনি দেখেছেন যে, বুকের খাঁচার উপরের পেশীতন্তুগুলি, যেমন মাস্কুলাস স্টারনালিস অথবা স্টারনালিস ব্রুটোরাম, যেগুলি পেটের পেশী রেকটাস অ্যাবডোমিনালিসের বর্ধিত অংশ নয়, কিন্তু প্যানিকিউলাস পেশীর সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত। তিনি বলেছেন, 'আদিম অঙ্গসংস্থান যে বিশেষ অবস্থানগত পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল—এই বক্তব্যের স্বপক্ষে একটি চমৎকার প্রমাণ হাজির করে এই পেশীটি।'

কোনও কোনও ব্যক্তির করোটির উপরিভাগের পেশী-সংকোচনের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা থাকে এবং এই পেশীগুলো এখনও পরিবর্তনশীল হলেও অংশত প্রাথমিক বা আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে। এম. এ দ্য ক্যাঁদল আমাকে একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা জানিয়েছেন যা এই ক্ষমতার দীর্ঘদিন ধরে বা বংশপরম্পরায় চালু থাকার এবং এর অস্বাভাবিক বিকাশের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত। তিনি এমন একটি পরিবারকে জানেন, যে-পরিবারের বর্তমান কর্তা যৌবনে করোটির চামড়া নাচিয়ে (পেশী সম্প্রসারণের সাহায্যে) কয়েকটি ভারী বই মাথার উপর থেকে দূরে নিক্ষেপ করতে পারতেন এবং এভাবে তিনি বহু বাজি জিতেছেন। তাঁর বাবা, কাকা, ঠাকুরদা এবং তিন ছেলে সকলেই এই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। প্রায় আটপুরুষ আগে এই পরিবারটি দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত এই শাখাটির কর্তা অপর শাখাটির পারিবারিক কর্তার সাতপুরুষের সম্পর্কিত জ্ঞাতিভাই। দ্বিতীয় শাখাটির বর্তমান কর্তা ফ্রান্সের অন্য একটি অঞ্চলে বসবাস করেন। তাঁকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ওই বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দেন। বর্তমানকালে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় একটি পেশী যে কত দীর্ঘদিন ধরে তার ক্ষমতাকে বংশপরম্পরায় ধরে রাখতে পারে, এটা তারই এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। সম্ভবত সুদূর অতীতের মানবাকৃতির পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই পাওয়া এই ক্ষমতা, কারণ দেখা যায় বানরদেরও এই ক্ষমতা আছে এবং তারা অনবরত এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মাথার উপরকার চামড়াকে উঁচু-নিচু করতে পারে।

বহির্ভাগের পেশী যা কানের বাইরের দিককে এবং অন্তর্ভাগের পেশী বা কানের ভেতরের দিকের বিভিন্ন অংশকে নাড়াতে সাহায্য করে, তা এখনও মানুষের ক্ষেত্রে

প্রাথমিক বা আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে এবং এ-সমস্তই প্যানিকিউলাস পেশীব্যবস্থার অন্তর্গত। এগুলির বিকাশ, কিংবা অন্তত এগুলির কার্যকলাপ, পরিবর্তনশীল প্রকৃতির। আমি এমন একজন মানুষকে দেখেছি যে তার সম্পূর্ণ বহিঃকর্ণ সামনের দিকে নিয়ে আসতে পারে। কেউ কেউ উপরের দিকে এবং পিছনের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। এদের মধ্যে একজন আমাকে বলেছিল যে যদি আমরা মাঝেমাঝে কানে হাত দিই এবং সেইদিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করি, তাহলে আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টার দ্বারা কান নাড়ানোর বিশেষ ক্ষমতা ফিরে পাওয়া সম্ভব। কান খাড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ফেরানোর ক্ষমতা নিঃসন্দেহে পশুদের একটি বড় গুণ যার দ্বারা তারা বুঝতে পারে কোন্ দিক থেকে বিপদ আসছে। কিন্তু আমি কখনও এমন কোনও মানুষের কথা শুনিনি যার মধ্যে এই ক্ষমতা বর্তমান এবং যা কিনা তার কাজে লাগে। সমস্ত বহিঃকর্ণকে তার বিভিন্ন ভাঁজ ও সুস্পষ্ট চিহ্ন (হেলিক্স ও অ্যান্টিহলিক্স, ট্রাগাস ও অ্যান্টিট্রাগাস ইত্যাদি) সমেত একটি প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গ বলা যেতে পারে, যা নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের ক্ষেত্রে কান খাড়া করার সময় কোনওরকম বোঝা না হয়ে কানকে রক্ষা এবং শক্তিশালী করে। তবে কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের ধারণা যে এই অংশের কোমলাস্থি (cartilage) কম্পনকে পৌঁছে দেয় শ্রবণ-স্নায়ুতে। কিন্তু মিঃ টয়ন্‌বি[৬] এ-বিষয়ে পরীক্ষিত তথ্যাদি পেশ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বহিঃকর্ণের স্বতন্ত্র কোনও কাজ নেই। শিম্পাঞ্জি ও ওরাং-ওটাংয়ের কান দেখতে অনেকটা মানুষের কানের মতোই এবং প্রধান পেশীগুলিও একইরকম, যদিও তা খুবই কম বিকশিত। চিড়িয়াখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা আমাকে জানিয়েছেন যে শিম্পাঞ্জি বা ওরাং-ওটাং কখনও তাদের কান নাড়াতে বা খাড়া কতে পারে না। এ থেকে বোঝা যায় অন্তত কাজের ক্ষেত্রে মানুষের মতোই এদের বহিঃকর্ণও একইরকম প্রাথমিক বা আদিম অবস্থায় রয়েছে। এইসমস্ত প্রাণীদের এবং মানুষের পূর্বপুরুষদের কান খাড়া করার ক্ষমতা কেন লোপ পেল, তা আমরা জানি না। যদিও আমি এ-বিষয়ে নিশ্চিত নই, তবু এমনটা হতে পারে যে তারা বৃক্ষবাসী ও দারুণ শক্তিশালী হওয়ার দরুন খুব কম সময়েই বিপদের মধ্যে পড়ত, ফলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাদের কান নাড়ানোর খুব-একটা প্রয়োজন হত না এবং সম্ভবত এইভাবেই ধীরে ধীরে তাদের এ-ক্ষমতাটি লোপ পেয়েছে। আকারে বড় আর শক্তিশালী পাখিদের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। সুদূর সামুদ্রিক দ্বীপের অধিবাসী হওয়ার দরুন শিকারি জন্তুর আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে গেছে তারা এবং তার ফলে ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলেছে ডানা মেলে ওড়বার ক্ষমতা। অবশ্য মানুষ ও কিছু কিছু জাতের বানরের কান নাড়ানোর অক্ষমতা অংশত পূরণ হয়

৬। 'দ্য ডিজিজেস অফ দ্য ইয়ার', লেখক জে. টয়ন্‌বি, এফ. আর. এস, ১৮৬০, পৃঃ ১২। প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক প্রেয়ার আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি পরবর্তীকালে কানের কাঠামোর কাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং এই পুস্তকের মতো প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

কোনও দিকের শব্দ শোনার জন্য তাদের মাথা ঘোরাতে পারার ক্ষমতার সাহায্যে। এটা বেশ জোর দিয়েই বলা হয় যে একমাত্র মানুষের কানেই লঁতি (lobule) আছে। কিন্তু 'এর প্রাথমিক অবস্থা গরিলাদের মধ্যেও দেখা যায়।' এবং অধ্যাপক প্রেয়ার-এর কাছে আমি শুনেছি যে, নিগ্রোদের মধ্যে অনেক সময় এর অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিঃ উল্‌নার বহিঃকর্ণের একটি ছোট্ট বৈশিষ্ট্যের কথা আমাকে জানান, যা তিনি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই লক্ষ করেছেন এবং তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন। বিষয়টি প্রথম তাঁর নজরে আসে পাক-এর (পরীবিশেষ) মূর্তি গড়ার সময়, যেখানে তিনি সরু ছুঁচলো কান তৈরি করেছিলেন। সেইসময় তাঁকে বিভিন্ন বানরের এবং আরও সযত্নে মানুষের কান নিয়ে পরীক্ষা করতে হয়েছিল। বৈশিষ্ট্যটি হল ভিতরের দিকে ভাঁজ করা সীমা বা হেলিক্স থেকে বেরিয়ে আসা একটি ছোট্ট ভোঁতা অংশের অদ্ভুত উপস্থিতি। এটা যাদের থাকে, জন্মের সময় থেকেই থাকে, এবং অধ্যাপক লুড্‌ভিগ মেয়ার-এর মতে মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যেই এই এটা বেশি দেখা যায়। মিঃ উল্‌নার হুবহু এ-রকম একটি মডেল তৈরি করেছেন এবং আমাকে তার একটা ছবি পাঠিয়েছেন (২নং ছবি)। ভোঁতা অংশটি যে শুধু ভিতরের দিকের কানের কেন্দ্রাভিমুখে বেরিয়ে থাকে তাই নয়, প্রায়ই বাইরের দিকে ঈষৎ উঁচু হয়ে থ্যাকে, ফলে সামনাসামনি বা পেছন থেকে লক্ষ করলে সহজেই চোখে পড়ে। এর কোনও সুনির্দিষ্ট আকার নেই, অবস্থানও খুব নির্দিষ্ট নয়, কখনও থাকে একটু উঁচুতে, কখনও-বা একটু নিচুতে, এমনকী এক কানে এর দেখা মিললেও অন্য কানে তা না-ও থাকতে পারে। শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের চিড়িয়াখানায় একটি স্পাইডার-মাংকির (Ateles beelzebuth) কানেও এই একই ব্যাপার লক্ষ করেছি আমি। ডঃ ই. রে ল্যাংকেস্টার হামবুর্গের চিড়িয়াখানায় একটি শিম্পাঞ্জির কানেও এই একই জিনিস দেখেছেন। হেলিক্স স্পষ্টতই কানের ভিতরের দিকের ভাঁজ করা অংশের চূড়ান্ত সীমা এবং ভাঁজ করা অংশটি কোনও-না-কোনওভাবে সম্পূর্ণ বহিঃকর্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যার ফলে বহিঃকর্ণ বরাবরের জন্য একটু পিছনে হেলে একই অবস্থানে থাকে। বেশ কিছু বানর, যারা উন্নতির উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছয়নি, যেমন বেবুন ও ম্যাকাকাস-এর কয়েকটি প্রজাতির কানের উপরিভাগ সামান্য ছুঁচলো এবং কানের প্রান্তসীমা মোটেই ভিতরের দিকে ভাঁজ করা নয়। কিন্তু বহিঃকর্ণের প্রান্তসীমা যদি এভাবে ভাঁজ করা থাকত, তাহলে একটি বিন্দু ভিতরের দিকে কেন্দ্রাভিমুখী

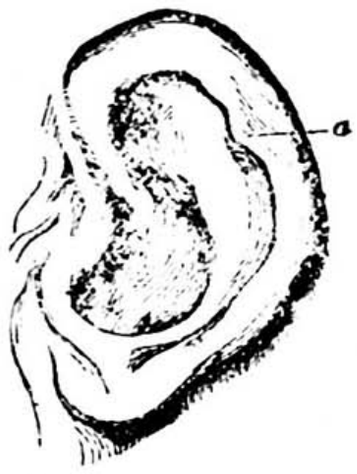

২নং ছবি—মানুষের কান ; ছাঁচ এবং অঙ্কন মিঃ উল্‌নারের ; a—প্রক্ষিপ্ত বা উদ্‌গত বিন্দু

এবং সম্ভবত বাইরের দিকেও কিছুটা উঁচু হয়ে থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই এই অংশের উৎপত্তির কারণ বলেও আমি বিশ্বাস করি। অন্যদিকে, অধ্যাপক এল. মেয়ার তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন যে সম্পূর্ণ বিষয়টিই হচ্ছে নিছক পরিবর্তনশীলতার ব্যাপার এবং এই বেরিয়ে থাকা অংশগুলি মোটেই বাস্তব নয়, আসলে এগুলো তাদের দুপাশে অবস্থিত অন্তর্বর্তী কোমলাস্থির পুরোপুরি গড়ে না-ওঠার কারণেই সৃষ্ট। আমি স্বীকার করতে সম্পূর্ণ রাজি আছি যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা সঠিক হতে পারে, যেমন অধ্যাপক মেয়ারের উল্লিখিত উদাহরণগুলির ক্ষেত্রে, যেখানে ওগুলির মধ্যে প্রচুর ছোট ছোট ছুঁচলো অংশ আছে অথবা যার সমস্ত প্রান্তসীমাই সর্পিল। ডঃ এল. ডাউনের সহায়তায় আমি নিজেই মাইক্রোসেফ্যালাস জাতীয় একটি জড়বুদ্ধির কান পর্যবেক্ষণ করেছি যার প্রক্ষিপ্ত অংশটি ছিল হেলিক্সের বাইরের দিকে, অন্তর্বর্তী ভাঁজ করা প্রান্তসীমায় নয়, ফলে কানের পূর্ববর্তী কোনও চূড়ার সঙ্গে এই অংশটির সম্পর্ক থাকতে পারে না। তথাপি কোনও কোনও ক্ষেত্রে, আমার মতে, বহিঃকর্ণে এই ধরনের ছোট ভোঁতা বিন্দু আসলে আমাদের মানবাকৃতি পূর্বসূরিদের ছুঁচলো খাড়া কানেরই অবশেষ মাত্র। এ ঘটনার পৌনঃপুনিকতা ও ছুঁচলো কানের ওই অংশের সঙ্গে এর অবস্থানগত সাদৃশ্যই আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করেছে। আমাকে পাঠানো একটি ফোটোতে কানের এই অংশটি এত বড় যে অনুমান করে নিতে হয়, অধ্যাপক মেয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, প্রান্তসীমা বরাবর কোমলাস্থির সমবিকাশের ফলেই বহিঃকর্ণের আকার সুষম হয়ে থাকে এবং এখানে প্রক্ষিপ্ত অংশটি সমস্ত কানের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে। উত্তর আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের অধিবাসী দুজন লোকের কানের ঊর্ধ্বতম প্রান্তসীমা মোটেই ভিতরের দিকে ভাঁজ করা নয়, বরং ছুঁচলো, এবং সাধারণ চতুষ্পদ জন্তুর কানের সঙ্গে তাদের নিকট সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এ-রকম একটি ক্ষেত্রে সাইনোপিথেবাস নিগার জাতীয় একটি বানরের কানের সঙ্গে একটি মানবশিশুর কানের তুলনা করে শিশুটির পিতা দেখছেন যে আকৃতিগতভাবে উভয়ে নিকট সম্বন্ধযুক্ত। যদি এই দু'টি ক্ষেত্রে বহিঃকর্ণসীমা স্বাভাবিক নিয়মে ভেতরের দিকে ভাঁজ করা থাকত, তাহলে একটি অন্তর্বর্তী প্রক্ষিপ্ত অংশ অবশ্যই গঠিত হত। আরও অন্তত দু'টি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বাইরের আকৃতি এখনও খানিকটা ছুঁচলোই রয়ে গেছে, যদিও কানের ঊর্ধ্বাংশের প্রান্তসীমা স্বাভাবিকভাবেই ভিতরের দিকে ভাঁজ করা, তবে দুটির মধ্যে একটি ক্ষেত্রে বেশ সঙ্কীর্ণ অবস্থাতে। এই পাতার উডকাটটি (৩ নং ছবি) ভ্রূণাবস্থায় একটি ওরাং-ওটাং-এর ফোটোর বিশ্বস্ত নকল (ডঃ নিটশের পাঠানো)। লক্ষণীয় যে এই সময়ে ভ্রূণের কানের ছুঁচলো বহিঃরেখা প্রাপ্তবয়স্ক একটি ওরাং-ওটাং-এর কানের থেকে (যার সঙ্গে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের কানের নিকট সাদৃশ্য থাকে) কত আলাদা। এটা স্পষ্ট যে এ-রকম একটি কানের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র অংশের ভাঁজ, যদি বিকাশের পরবর্তী

পর্যায়ে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত না হয়, ভিতরের দিকে একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ সৃষ্টি করবে। মোটের ওপর এটা এখনও পর্যন্ত আমার কাছে সম্ভবপর বলেই মনে হয় যে, মানুষ ও বানর উভয়ের ব্যাপারেই এই অংশগুলি কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তী অবস্থারই নিদর্শনস্বরূপ।

অতিরিক্ত পেশীতন্তু ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য গঠনকাঠামো সহ নিক্‌টিটেটিং মেম্‌ব্রেন বা তৃতীয় চক্ষুপল্লবটি বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে পাখিদের ক্ষেত্রে এবং তাদের

৩নং ছবি—ওরাং-ওটাং-এর একটি পরিণত ভ্রূণ। একটি ফোটোর হুবহু নকল, যেখানে জীবনের এই প্রারম্ভিক সময়ে কানের গঠন দেখানো হয়েছে।

কাছে এর বিশেষ কার্যকরী গুরুত্ব রয়েছে, কারণ এর সাহায্যে খুব দ্রুত সমস্ত চক্ষুগোলককে ঢেকে নেওয়া যায়। কিছু সরীসৃপ ও উভচর প্রাণী এবং কোনও কোনও মাছের (যেমন হাউর) মধ্যে এই একই জিনিস লক্ষ করা যায়। স্তন্যপায়ী গোত্রের অন্তর্গত কিছু নিম্নশ্রেণির প্রাণী, যেমন হংসচঞ্চু বা ক্যাঙারু, এবং সিন্ধুঘোটকের মতো কিছু উচ্চ শ্রেণির স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যেও এটি যথেষ্টই বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু সমস্ত শারীরতত্ত্ববিদই স্বীকার করেছেন যে মানুষ, চতুষ্পদী জন্তু এবং অবশিষ্ট অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এর অবস্থান নিতান্তই একটি প্রাথমিক বা আদিম অংশ হিসেবে, যাকে উপপল্লব (Semilunar fold) বলা হয়।[৭]

৭। অধ্যাপক মুলারের 'এলিমেন্টস অফ ফিজিওলজি', ইংরেজি ভাষান্তর, ১৮৪২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৭। অধ্যাপক ওয়েন, 'অ্যানাটমি অফ ভার্টিব্রেটস', ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬০; ওই একই বইতে সিন্ধুঘোটকের ওপর প্রবন্ধ, 'প্রোক্রিয়েশন ইন জুলজিক্যাল সোসাইটি', ৮ নভেম্বর, ১৮৫৪। আরও দেখুন, আর. নক্সের, 'গ্রেট আর্টিস্টস অ্যান্ড অ্যানাটমিস্টস', পৃঃ ১০৬। আদিম বা লুপ্তপ্রায় এই অংশটি দৃশ্যত ইউরোপের অধিবাসীদের তুলনায় নিগ্রো এবং অস্ট্রেলিয়ানদের ক্ষেত্রে কিছুটা বড়। দ্রষ্টব্য, কার্ল ফখৎ, 'লেক্‌চারস অন ম্যান', ইংরেজি ভাষান্তর, পৃঃ ১২৯।

বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কাছেই ঘ্রাণশক্তি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোমন্থক প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি বিপদসংকেত হিসেবে কাজ করে, মাংসাশী প্রাণীদের ক্ষেত্রে শিকার ধরতে সাহায্য করে, আবার বুনো শুয়োরের মতো জন্তুদের ক্ষেত্রে এই দু'টি উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি খুব সামান্যই প্রয়োজনে লাগে, এমনকী কালো মানুষদের ক্ষেত্রেও, যদিও তাদের মধ্যে এর বিকাশ সভ্য ও সাদা মানুষদের তুলনায় অনেকটাই বেশি।[৮] তথাপি, এটি তাদের বিপদ-বার্তা জানায় না, আবার কিছু খুঁজতেও সাহায্যও করে না; তীব্র দুর্গন্ধময় পরিবেশ এক্সিমোদের ঘুমের কোনও ব্যাঘাত ঘটায় না বা বর্বরদের ক্ষেত্রে অর্ধগলিত মাংস আহার থেকে নিবৃত্ত করে না। ইউরোপীয়দের মধ্যে ঘ্রাণের অনুভূতি একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম এবং এ ব্যাপারে আমি আরও নিশ্চিত হয়েছি জনৈক বিখ্যাত প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্‌কে পরীক্ষা করে, যাঁর মধ্যে এই অনুভূতি অত্যন্ত বেশি এবং তিনি তা প্রমাণ করেছেন। ক্রমবিবর্তনের নীতিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা এ-কথা সহজে স্বীকার করতে চাইবেন না যে মানুষের ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি এখন যে অবস্থায় আছে, তা মানুষের স্বোপার্জিত। উত্তরাধিকারসূত্রে এই বিশেষ ক্ষমতা সে খুবই দুর্বল ও প্রাথমিক অবস্থায় লাভ করেছে সেইসব আদিম পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে, যাদের কাছে ঘ্রাণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কার্যকারী ক্ষমতাবিশিষ্ট এবং নিয়মিত ব্যবহারযোগ্য। যে-সমস্ত প্রাণীদের এই অনুভূতি যথেষ্ট বিকশিত, যেমন কুকুর বা ঘোড়া, তাদের ক্ষেত্রে কোনও প্রাণী বা স্থানের স্মৃতি গন্ধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সম্ভবত এবার আমরা বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কী এবং এ বিষয়ে ডঃ মডস্লে ঠিকই বলেছেন যে মানুষের ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি 'শুধুমাত্র বিস্মৃত দৃশ্য এবং স্থানের স্পষ্ট ছবি ও অনুভূতি মনে করার ব্যাপারেই কার্যকরী।'

অন্যান্য দ্বিপদী বানর জাতীয় প্রাণীদের থেকে একটা ব্যাপারে মানুষ স্পষ্টতই আলাদা—তার শরীর প্রায় রোমহীন। পুরুষদের দেহে বেশির ভাগ জায়গায় তবু ইতস্তত ছড়ানো সামান্য কিছু রোম বা চুল দেখা যায়, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা প্রায় থাকে না বললেই চলে। রোমশতার ব্যাপারে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আবার একই জাতির সকলের রোম শুধুমাত্র পরিমাণেই নয়, অবস্থানেও

৮। দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের প্রখর ঘ্রাণশক্তি সম্পর্কে অধ্যাপক হামবোল্ডের বক্তব্য যথেষ্টই পরিচিত, অন্যরাও তা সমর্থন করেন। মিঃ হুজো 'Etudes sur les Fuculte's Mentales' ইত্যাদি, খণ্ড ১, ১৮৭২, পৃঃ ৯১-তে জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন নিগ্রো এবং রেড ইন্ডিয়ানরা তাদের ঘ্রাণানুভূতি দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেও যে-কোনও ব্যক্তিকে চিনতে পারে। ডঃ ডব্লু. ওগল ঘ্রাণশক্তি ও শরীরের তৈলাক্ত অঞ্চলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির বর্ণগত উপাদান এবং তৎসহ শরীরের চামড়ার মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার লক্ষ করেন। সেইজন্যই আমি পরবর্তী সময়ে বলেছি সাদা বর্ণের জাতিগুলির তুলনায় কালো বর্ণের জাতিগুলির ঘ্রাণানুভূতি প্রখর ও সূক্ষ্ম হয়। দ্রষ্টব্য, তাঁর গবেষণাপত্রগুলি, 'মেডিকো-চিররেজিক্যাল ট্রানজাকশন', লন্ডন, খণ্ড ৩, পৃঃ ২৭৬।

আলাদা হতে পারে। কোনও কোনও ইউরোপবাসীর কাঁধ একেবারে রোমশূন্য, আবার কারুর হয়তো ঘন রোমে আচ্ছাদিত। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে আমাদের শরীরে ছড়িয়ে থাকা রোম আসলে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের শরীর জুড়ে সুষম রোমাচ্ছাদনেরই লুপ্তপ্রায় চিহ্নবিশেষ। এ-কথা আরও ভালভাবে বোঝা যায় যখন হাত-পা বা শরীরের কোনও অংশের পুরনো প্রদাহিত স্থানে ওষুধপত্র বা মালিশ লাগালে সেখানকার ধূসর রঙের পাতলা ছোট ছোট রোম কখনও কখনও 'ঘন, লম্বা ও গাঢ় কালো রঙের চুলে' পরিণত হয়।

স্যর জেম্‌স প্যাগেট আমাকে জানিয়েছেন যে একই পরিবারভুক্ত কয়েকজনের ভ্রূপল্লবে প্রায়ই এমন দু-একটি চুল দেখা যায় যেগুলি অন্যদের তুলনায় অনেক দীর্ঘ। এই সামান্য বৈশিষ্ট্যটিও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বলেই আমার ধারণা। এই দীর্ঘ কেশগুচ্ছও তাদের সুদূর পূর্বপুরুষদেরই প্রতিনিধিস্বরূপ, কারণ শিম্পাঞ্জি ও ম্যাকাকাস জাতীয় বানরদের কোনও কোনও প্রজাতির মধ্যে চোখের উপরে রোমহীন চামড়া থেকে উৎপন্ন বিক্ষিপ্ত কিন্তু রীতিমতো দীর্ঘ চুল দেখা যায়, যা আমাদের ভ্রূর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। কোনও কোনও বেবুনের রোমশ ভ্রূপ্রদেশ থেকেও একইরকম লম্বা চুল বেরিয়ে থাকতে দেখা যায়।

এখানে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। ছ-মাস বয়সের মানুষের ভ্রূণ পাতলা পশমের মতো রোম বা লানুগো-য় আবৃত থাকে। মাস পাঁচেকের সময় এগুলি প্রথম উদগত হয় এবং ভ্রূ ও মুখমণ্ডলে, বিশেষত মুখগহ্বরের চারপাশে, মাথার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে এ-রকম চুল দেখা যায়। এস্‌রিশ্‌ট একটি মেয়ে-ভ্রূণে এমনকী গোঁফের আভাস পর্যন্ত দেখেছেন। কিন্তু এ ঘটনা খুব-একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কেননা বিকাশের প্রথমাবস্থার বাহ্যচরিত্রলক্ষণে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাধারণত আরও অনেক ধরনের মিলই বর্তমান থাকে। ভ্রূণের শরীরে রোমের অভিমুখ ও বিন্যাস একজন প্রাপ্তবয়স্কের মতোই, যদিও নানারকম পরিবর্তনের সম্ভাবনা থেকেই যায়। কপাল ও কানদুটি সমেত সমস্ত শরীর জুড়েই বিস্তৃত থাকে ঘন রোমরাজি, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল হাতের তালু ও পায়ের পাতা দুটি থাকে মসৃণ, রোমহীন, ঠিক যেমনটি দেখা যায় নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের চার হাত-পায়ের নীচে। এটাকে নিছকই একটা সমাপতন বলে মেনে নেওয়া যায় না। বরং মনে করা যেতে পারে যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে যারা রোমশ অবস্থায় জন্মায়, সম্ভবত তাদের শরীরের রোমের আচ্ছাদনই ভ্রূণের অবয়বের এই রোমশতার প্রথম পূর্বসূরি। জন্ম থেকেই যারা শরীর ও মুখ ঘন রোমে আবৃত, এ-রকম তিন-চার জনের কথা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই অদ্ভুত অবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রাপ্ত ও দাঁতের অস্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।[৯]

৯। অধ্যাপক অ্যালেক্স ব্রান্ড সম্প্রতি এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমন্বিত এক রাশিয়ান পিতাপুত্রের খবর জানিয়েছেন। দুজনের ছবিই আমি প্যারিস থেকে পেয়েছি।

অধ্যাপক অ্যালেক্স ব্রান্ড আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তির মুখের চুল একটি ভ্রূণের রোমের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছেন তাদের গঠনরীতি প্রায় এক। তাই তিনি বলেছেন, উপরোক্ত বিষয়টিকে চুলের বিকাশের গতিরোধের এবং ক্রমবৃদ্ধির ফল হিসেবে দেখানো যেতে পারে। অনেক দুর্বল শিশুর পিঠে লম্বা রেশমের মতো রোম দেখা যায় যা আমি শিশু-হাসপাতালের জনৈক শল্য-চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনেছি। তার কারণও সম্ভবত এই একই।

উন্নত সভ্য জাতের মানুষদের ক্ষেত্রে পেছনের পেষক-দাঁত (posterior molar) বা আক্কেল-দাঁত ক্রমশ অবলুপ্তির দিকেই এগোচ্ছে। অন্যান্য পেষক-দাঁতের তুলনায় আক্কেল-দাঁত আকারে অনেক ছোট, যেমনটি দেখা যায় শিম্পাঞ্জি ও ওরাংওটাংদের ক্ষেত্রে, এবং এদের মাত্র দু'টি করে আলাদা ছেদক-দাঁত থাকে। কম-বেশি সতেরো বছরের আগে আক্কেল-দাঁত মাড়ি কেটে বেরোয় না এবং আমি নিশ্চিত যে অন্যান্য দাঁতের চেয়ে অনেক আগেই তা ক্ষয় হয়ে যায় বা পড়ে যায়। কোনও কোনও দন্ত-বিশারদ অবশ্য তা স্বীকার করেন না। আবার অন্যান্য দাঁতের তুলনায় এই দাঁতটি গঠন ও বিকাশকালের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে, মেলানিয়ান জাতির মধ্যে আক্কেল-দাঁত তিনটি আলাদা ছেদক-দাঁতের সঙ্গে একত্রে থাকে এবং সাধারণত সুস্থ অবস্থাতেই থাকে। অন্যান্য দাঁতের তুলনায় এগুলি পৃথক আকারের হলেও ককেশিয়ান জাতির ক্ষেত্রে এই পার্থক্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অধ্যাপক শ্যাফহউসেন জাতিগুলির মধ্যেকার এই পার্থক্যকে সূচিত করেছেন এইভাবে : সভ্য জাতিগুলির ক্ষেত্রে 'চোয়ালের পশ্চাদংশের আকার সর্বদাই ছোট।' তার কারণ হিসেবে আমার মনে হয়, নিয়মিত নরম এবং সিদ্ধ খাদ্য খাওয়ার যে-অভ্যাস সভ্যজাতিগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার ফলে তাদেরকে চোয়ালের কসরত খুবই কম করতে হয়। মিঃ ব্রেস আমাকে জানিয়েছেন, আমেরিকায় এখন বাচ্চাদের মাড়ির কিছু দাঁত তুলে ফেলা প্রায় একটা সার্বজনীন ঘটনায় এসে দাঁড়িয়েছে, কারণ স্বাভাবিক দাঁতের পূর্ণ বিকাশের জন্য যতটা দরকার চোয়ালের হাড় ঠিক ততটা বাড়তে পারে না।[১০]

পৌষ্টিক নালীতে আমি একটিমাত্র লুপ্তপ্রায় অঙ্গের কথা জানি, যাকে সিকাম-এর ভারনিফর্ম অ্যাপেন্ডেজ (vermiform appendage of the caecum) বলা হয়। সিকাম হল অন্ত্রের একটি শাখা বা বর্ধিত অংশবিশেষ, যা ক্যুল দ্য সাক-এ গিয়ে শেষ হয়েছে। নিম্নশ্রেণির অনেক তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট দীর্ঘ। কোয়ালা জাতীয় ক্যাঙারুর ক্ষেত্রে এটি তার পুরো শরীরের তিন গুণেরও বেশি

১০। অধ্যাপক মঁতেগাজা ফ্লোরেন্স থেকে আমাকে লিখেছেন যে তিনি সাম্প্রতিককালে মানুষের বিভিন্ন জাতির শেষ বা তৃতীয় মোলার-দাঁত (আকারে বড়, পেষক-দাঁত) বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং তিনিও এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, অর্থাৎ উচ্চতর বা সুসভ্য জাতিগুলোর মধ্যে তৃতীয় পেষক-দাঁত অপুষ্টিজনিত কারণে হয় ক্ষয়ে যাচ্ছে, নতুবা ক্রমবিলুপ্তির পথে।

লম্বা। কখনও কখনও দেখা যায় এটি নীচের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে কিংবা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত অবস্থায় রয়েছে। খাদ্যাভ্যাস বা খাদ্যের পরিবর্তনের ফলে দেখা যায় কোনও কোনও প্রাণীর ক্ষেত্রে সিকাম খুব ছোট হয়ে এসেছে এবং ভারমিফর্ম অ্যাপেন্ডেজ সেক্ষেত্রে এই হ্রাসপ্রাপ্ত অঙ্গের লুপ্তপ্রায় একটি অংশ হিসেবে পড়ে রয়েছে। অধ্যাপক কানেসত্রিনি মানুষের ক্ষেত্রে এর বিভিন্ন আকারের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। অ্যাপেনডিক্সের ক্ষুদ্র আকার এবং কানেসত্রিনির সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে আসলে এটি একটি লুপ্তপ্রায় প্রাথমিক অঙ্গবিশেষ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এটি যেমন আদৌ না থাকতে পারে, তেমনি আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দারুণভাবে বিকশিত অবস্থাতেও দেখা যেতে পারে। এর অবস্থানের অর্ধেক বা তিন ভাগের দু-ভাগ জায়গাই কখনও কখনও এর আয়তনে ভরে যায়, আর শেষাংশ চওড়া ও শক্ত হয়ে বেড়ে ওঠে। ওরাংওটাং-এর অ্যাপেনডেজ বেশ লম্বা এবং কুণ্ডলীকৃত। মানুষের ক্ষেত্রে এটি হ্রাসপ্রাপ্ত সিকামের শেষপ্রান্তে দেখা যায় এবং সাধারণত চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়, যার ব্যাস মাত্র এক ইঞ্চির এক-তৃতীয়াংশ। এটি শুধু যে অপ্রয়োজনীয় তাই নয়, কখনও কখনও মৃত্যুর কারণও হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে সম্প্রতি দু'টি ঘটনার কথা শুনেছি আমি। ঘটনার কারণ কোনও শক্ত ক্ষুদ্র বস্তু, যেমন দানা খাদ্য, এর মধ্যে কোনওক্রমে প্রবেশ করলে প্রচণ্ড প্রদাহ ও যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়।[১১]

নিম্নশ্রেণির কিছু বানর (quadrumana), লেমুর ও মাংসাশী প্রাণী এবং অধিকাংশ ক্যাঙারুর মধ্যে হাতের ঊর্ধ্বাংশের হাড়ের (humerus) শেষাংশে সুপ্রা-কন্ডিলয়েড ফোরামেন (Supra-condiloid foramen) নামে একটি ছিদ্র থাকে, যার মধ্যে দিয়ে সম্মুখ-হাতের প্রধান স্নায়ু এবং প্রায়শই প্রধান ধমনী অতিক্রম করে। মানুষের বাহুতেও সাধারণত এই একই ধরনের ছিদ্রের চিহ্ন দেখা যায়, কখনও কখনও সেটা বেশ স্পষ্টভাবেই থাকে। হাড়ের একটা হুকের মতো বাঁকের ফলেই এটা সৃষ্টি হয় এবং সম্পূর্ণ হয় একপ্রস্থ অস্থিবন্ধনী পেশীর সাহায্যে। ডঃ স্ট্রুথার্স[১২], যিনি এই বিষয়টি নিয়ে বহুদিন ধরে কাজ করছেন, লক্ষ করেছেন যে এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটি কখনও কখনও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। একজন লোকের কথা তিনি বলেছেন

১১। এম. সি. মার্তাস (Revue des deux modes) এবং হ্যাকেল (Geneneue Morphologie) উভয়েই উল্লেখ করেছেন যে এই লুপ্তপ্রায় অঙ্গটি কখনও কখনও মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে।

১২। বংশানুক্রম প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ডঃ স্ট্রুথার্সের প্রবন্ধ, 'লান্‌সেট্', ১৫ ফেব্রুয়ারি, পৃঃ ৮৭৩ এবং ওই একই পত্রিকায় অপর এক গবেষণাপত্র যার প্রকাশকাল ২৪ জানুয়ারি, ১৮৬৩, পৃঃ ৮৩। আমার জানা খবর অনুযায়ী ডঃ নক্সই সম্ভবত প্রথম শারীরবিদ্ যিনি মানুষের দেহের এই অদ্ভুত বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিলেন। দ্রষ্টব্য, তাঁর 'গ্রেট আর্টিস্টস অ্যান্ড অ্যানাটমিস্টস', পৃঃ ৬৩। আরও দ্রষ্টব্য, ডঃ গ্রবার-এর গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিকথা, 'Bulletin de l'Aead. Imp de st. Petersbourg', খণ্ড ১২, পৃঃ ৪৪৮।

যার সন্তানদের মধ্যে চারজনের শরীরে তাদের পিতার মতো বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান। ছিদ্রটি যদি থাকে, তাহলে প্রধান স্নায়ু অবশ্যই তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, এবং এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এটি হচ্ছে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের সুপ্রা-কন্ডিলয়েড ফোরামেন-এর লুপ্তপ্রায় অংশেরই অনুরূপ। অধ্যাপক টার্নার হিসেব করে দেখিয়েছেন, বর্তমানে মানুষের শতকরা একভাগের মধ্যে এটি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে যদি মানুষের মধ্যে পুনরায় এর বিকাশ ঘটে (আর তা ঘটা একেবারে অসম্ভবও নয়), তাহলে তা হবে পুনরায় সেই অতি প্রাচীন অবস্থায় ফিরে যাওয়া, কারণ উচ্চশ্রেণীর বানরদের মধ্যেও বর্তমানে এটি অনুপস্থিত।

মানুষের বাহুর হাড়ে কখনও-সখনও আর একটি ফোরামেন বা ছিদ্রও দেখা যায়, যাকে ইন্টার-কন্ডিলয়েড বলে। সবসময় না হলেও বিভিন্ন জাতের বনমানুষ, গরিলা, বানর এবং এই জাতীয় অনেক নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের দেহে মাঝেমধ্যে এর দেখা মেলে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, এই ছিদ্রটি মানুষের মধ্যে এখনকার তুলনায় অনেক বেশি দেখা যেত প্রাচীনকালে। মিঃ বাস্‌কে[১৩] এ-বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ জোগাড় করেছেন : অধ্যাপক ব্রকা প্যারিসের দক্ষিণ প্রান্তের কবরখানা থেকে সংগৃহীত বাহুর হাড়ের শতকরা সাড়ে চার ভাগ ক্ষেত্রে ছিদ্রটি লক্ষ করেছিলেন এবং ওরোনি-তে ব্রোঞ্জ যুগের মাটির গহ্বর থেকে পাওয়া বত্রিশটি প্রগণ্ডাস্থির (humeri) মধ্যে আটটিতে এই ছিদ্র দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেন এই অস্বাভাবিক অনুপাত সম্ভবত পারিবারিক কবরখানার কারণেই। মঁসিয়ে দুপোঁ আবার লেসি-উপত্যকার গুহায় রেইনডিয়ার যুগের ছিদ্রযুক্ত হাড় দেখেছিলেন শতকরা ত্রিশ ভাগ। মঁসিয়ে লুগয়ে আজাঁতুঁলের ডল্‌মেন*-এ রক্ষিত শতকরা পঁচিশ ভাগ দেহে এই ছিদ্র লক্ষ করেছিলেন এবং মঁসিয়ে প্রুনার বে একই অবস্থায় ভরিল থেকে পাওয়া হাড়ে এর সংখ্যা দেখেছিলেন শতকরা ছাব্বিশ ভাগ। মঁসিয়ে প্রুনার বে বলেছেন, 'গুয়াঁস (guanche) অস্থিকাঠামোর ক্ষেত্রে এটি একটি খুবই সাধারণ ঘটনা।' কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হল—এ বিষয়ে ও অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ে প্রাচীন জাতিগুলির সঙ্গে সাম্প্রতিককালের জাতিদের তুলনায় অনেক বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায় নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের। এর প্রধান কারণ সম্ভবত প্রাচীন জাতিগুলি তাদের সুদূর পশুসদৃশ পূর্বপুরুষদের দীর্ঘ বংশধারার অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী।

মানুষের ক্ষেত্রে অন্যান্য কশেরুকা বা মেরুদণ্ডের অংশ-সহ অনুত্রিকাস্থিটি লেজের মতোই অকেজো হলেও আসলে তা কিন্তু অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ওই অংশেরই

১৩। 'অন দ্য কেভস অফ জিব্রালটার', ট্রানজাকশন ইন ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ প্রিহিস্টোরিক্যাল আর্কিওলজি', তৃতীয় অধিবেশন, ১৮৬, পৃঃ ১৫। অধ্যাপক ওয়াইম্যান সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে (৪র্থ বার্ষিক রিপোর্ট, পিয়াবডি মিউজিয়াম, ১৮৭১, পৃঃ ২০), পশ্চিম আমেরিকা ও ফ্লোরিডা অঞ্চলের প্রাচীন ঢিপিগুলির মধ্যে কবরস্থ মানুষদের শতকরা একত্রিশ ভাগের হাড়ে এই ছিদ্র আছে। একই ব্যাপার নিগ্রোদের মধ্যেও খুবই বেশি দেখা যায়।

* ডলমেন—দুটি খাড়া প্রস্তরখণ্ডের উপর রাখা প্রস্তরখণ্ড বিশেষ।

সমতুল। মানুষের ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় এই অংশটি যে বেশ প্রত্যক্ষ ও শেষপ্রান্ত থেকে কিছুটা বর্ধিত, তা যে-কোনও ভ্রূণের ছবিতেই দেখা যেতে পারে (ছবি-১)। এমনকী জন্মের পরেও কোনও কোনও দুর্লভ ক্ষেত্রে অংশটি লেজের একটি ছোট্ট প্রাথমিক অংশের পরিচয়-সহ বাইরে বেরিয়ে থাকে।[১৪] সাধারণত মাত্র চারটি কশেরুকা নিয়ে গঠিত এই অনুত্রিকাস্থিটি আকারে বেশ ছোট এবং দৃঢ়সম্বদ্ধ। এগুলি যে গঠনের প্রাথমিক বা আদিম রূপের অবশেষ হিসাবেই রয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়, কেননা মেরুদণ্ডের তলস্থিত অংশটি ছাড়া বাকিগুলি শুধুমাত্র মধ্য-অংশকেই (centrum) ধারণ করে থাকে। কতকগুলি ছোট পেশীতন্তুর আবরণে ঢাকা থাকে এগুলি। অধ্যাপক টার্নার আমাকে জানিয়েছেন যে এগুলির মধ্যে একটিকে থেইল্ চিহ্নিত করেছিলেন লেজেরই প্রাথমিক পুনরাবৃত্তি হিসেবে—এটি এমন একটি পেশী যা বহু স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে দারুণভাবে বিকশিত হয়েছে।

মানুষের সুষুম্নাকাণ্ড পৃষ্ঠদেশের শেষপ্রান্ত বা প্রথম 'লাম্বার' কশেরুকা পর্যন্ত গেছে। কিন্তু সরু সুতোর মতো একটি তন্তু (filum terminale) মেরুনালীর সেক্রাল অংশের অক্ষ বরাবর নেমে গেছে, এমনকী সেটাকে অনুত্রিকাস্থির পিছন পর্যন্তও দেখা যায়। অধ্যাপক টার্নারের মতে এই তন্তুর ঊর্ধ্বাংশটি নিঃসন্দেহে সুষুম্নাকাণ্ডের অনুরূপ, কিন্তু নিম্নাংশটি শুধুমাত্র পায়ামেটার (piamater) বা স্নায়ুতন্ত্রের ঝিল্লি দিয়েই তৈরি। এক্ষেত্রেও অনুত্রিকাস্থিটি মেরুদণ্ডের মতো একটি গুরত্বপূর্ণ অঙ্গের অবশেষ বলেই বিবেচিত হয়, যদিও তার সঙ্গে মেরুনালীর কোনও যোগ নেই। অধ্যাপক টার্নারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি দেখিয়েছেন নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের লেজের সঙ্গে অনুত্রিকাস্থি কতটা সাদৃশ্যযুক্ত। অধ্যাপক লুস্কা কিছুদিন আগে অনুত্রিকাস্থির শেষপ্রান্তে খুবই অদ্ভুত কুণ্ডলীকৃত একটি অংশ আবিষ্কার করেছেন যা মধ্য-সেক্রাল ধমনীর সঙ্গে সংযুক্ত এবং এই আবিষ্কার অধ্যাপক ক্রাউস ও অধ্যাপক মেয়ারকে একটি বানর ও একটি বিড়ালের লেজ নিয়ে পরীক্ষায় উৎসাহিত করেছিল। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা একইরকম কুণ্ডলীকৃত অংশের সন্ধান পেয়েছেন, যদিও তা ঠিক শেষপ্রান্তে নয়।

জননপ্রক্রিয়ায় এমন কিছু কিছু অঙ্গের ব্যবহার আছে যা এখন প্রায় প্রাথমিক বা লুপ্ত অঙ্গের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তবে এগুলি আগের ব্যাপারগুলির থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাদা—এখানে এমন কোনও অঙ্গ বা অঙ্গের অংশ আমাদের আলোচ্য নয় যা প্রজাতিগুলির মধ্যে আর কার্যকরী অবস্থায় নেই, বরং প্রজাতির দু'টি বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে একটিতে কার্যকরী এবং অন্যটিতে নিতান্ত প্রাথমিক কার্যকরী অবস্থায় রয়েছে। তথাপি আগের উদাহরণগুলির মতো এক্ষেত্রেও প্রজাতিগুলি আলাদা

১৪। অধ্যাপক কাত্রেফাজ সাম্প্রতিককালে এই বিষয়ে কিছু তথ্য জোগাড় করেছেন, 'Revue des cours scientifiques', ১৮৬৭-৬৮, পৃঃ ৬২৫। ১৮৪০ সালে ফ্লিথমান এমন একটি লেজযুক্ত মানুষের ভ্রূণ প্রদর্শন করেছিলেন যা সচরাচর দেখা যায় না—এটা মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। লেজটিকে বহু শারীরবিদ আরল্যানজেন-এর প্রাণিতত্ত্ববিদদের আলোচনা-সভায় উপস্থিত থেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন। [দ্রষ্টব্য, মার্শালের 'Nied erlandi-schen Archiv fir zoologie', ১৮৭১]।

আলাদা ভাবে সৃষ্ট হয়েছে এই ধারণা থেকে এই প্রাথমিক অঙ্গের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা কঠিন। এইসব প্রাথমিক অঙ্গের ব্যাপারে আমি পরে দেখাব যে নিতান্ত উত্তরাধিকারপ্রথাই এক্ষেত্রে কাজ করে, অর্থাৎ একটি লিঙ্গ যে-অঙ্গটি প্রাপ্ত হয়, তা অন্য লিঙ্গে অংশত সঞ্চারিত হয়। এখানে আমি এই ধরনের কয়েকটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গের উদাহরণ দেব। আমরা সকলেই জানি যে মানুষ সমেত সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রজাতির পুরুষদেরই প্রাথমিক দুগ্ধ-গ্রন্থি আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট বিকশিত হয়ে ওঠে এবং প্রচুর দুধ উৎপাদন করতে পারে। উভয় লিঙ্গের মধ্যে এই দুগ্ধগ্রন্থির কিছু সাদৃশ্যও চোখে পড়ে, যেমন হামে আক্রান্ত হওয়ার সময় উভয়েই স্ফীত হয়ে ওঠে। ভেসিকিউলা প্রোসটাটিকা, যা অনেক পুরুষ-স্তন্যপায়ীর শরীরে থাকে, তা যে সংযুক্তি-নালীসহ নারীর জরায়ুরই অনুরূপ—এ-কথা এখন সর্বস্বীকৃত। এই দেহাংশটি সম্বন্ধে অধ্যাপক লিউকার্ট-এর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্বীকার না করে উপায় নেই। বিশেষত সেইসমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এ-কথা আরও স্পষ্ট যাদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে জরায়ু দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে[১৫], কেননা তাদের পুরুষদের ভেসিকিউলাও অনুরূপভাবে বিভক্ত। জননতন্ত্রের অন্তর্গত আরও কিছু লুপ্তপ্রায় অঙ্গের কথা এখানে আর উল্লেখ করা হল না।

এখানে যে তিন শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কথা উল্লেখ করা হল, তা অভ্রান্ত। তবে 'অরিজিন অফ স্পিসিস'-এ যেভাবে বিশদে বলেছি, এখানে তার পুনরাবৃত্তি অর্থহীন। একই শ্রেণির অন্তর্গত সমস্ত প্রাণীদের শারীরিক কাঠামোর সাদৃশ্য বেশ বোঝা যায় যদি আমরা তাদের একজন সাধারণ পূর্বপুরুষের কথা স্বীকার করে নিই এবং বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতার কারণে তাদের পার্থক্যের কথা মনে রাখি। অন্য কোনও মতবাদের দ্বারা মানুষ বা বানরের হাত, ঘোড়ার পা, সীলমাছের পাখনা, বাদুড়ের ডানা ইত্যাদির মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।[১৬] একই আদর্শ ছক অনুযায়ী তারা গঠিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়াটা নিশ্চয়ই কোনও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রসূত ব্যাখ্যা নয়। বিকাশের ক্ষেত্রে ভ্রূণের শেষ দশায়

১৫। লিউকার্ট, টডের 'সাইক্লোপিডিয়া অফ অ্যানাটমি', ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪১৫। মানুষের এই অঙ্গটির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক, কিন্তু অন্যান্য অনেক লুপ্তপ্রায় অঙ্গের মতো এটিও বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য-সহ পরিবর্তনশীল।

১৬। অধ্যাপক বিয়ানকনি সম্প্রতি প্রকাশিত ছবি-সহ একটি চমৎকার বইতে (La Thioric Dar wirienne et la dite independlente, ১৮৭৪) দেখাতে চেয়েছেন যে উপরোল্লিখিত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুরূপ গঠন-কাঠামোকে তাদের ব্যবহারিকতা অনুযায়ী যান্ত্রিক নীতিতেই সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আর কেউই বোধহয় এত ভালভাবে দেখাতে পারেননি যে এই ধরনের গঠন-আকৃতি কী আশ্চর্যভাবে এদের মুখ্য উদ্দেশ্যের পক্ষে উপযোগী হয় ওঠে, এবং আমি মনে করি এই উপযোগীকরণকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বাদুড়ের ডানা পরীক্ষা করে তিনি (বিয়ানকনি) যা উপস্থিত করেন, অগুস্ত কোঁৎ-এর কথা ধার করে বলা যায়—'আমার কাছে তা শুধুমাত্র একটি অধিতাত্ত্বিক নীতি বলে মনে হয়', অর্থাৎ সংরক্ষণ হল—'প্রাণীর স্তন্যপায়ী প্রকৃতির অখণ্ডতা'। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি আদিম বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের আলোচনা করেছেন

পরিবর্তনের মূল নীতি কীভাবে হঠাৎ কার্যকরী হয় এবং অনুরূপ সময়ে বংশানুসরণ করে কেমন আশ্চর্যজনকভাবে ভ্রূণগুলি কাঠামো ও গঠনে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়, সেটা আমরা বুঝতে পারি এবং আরও বুঝতে পারি এই বিভিন্নতার মধ্যেও কীভাবে তারা তাদের একই পূর্বপুরুষের কাঠামোকে কম-বেশি ধরে রাখে নিজেদের অবয়বে। মানুষ, কুকুর, সীল, বাদুড়, সরীসৃপ ইত্যাদির ভ্রূণকে যে প্রথম অবস্থায় আলাদা করা কঠিন—এই চমকপ্রদ বিষয়টির অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া আজও সম্ভব হয়নি। আদিম বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের অস্তিত্বের কারণ হিসেবে আমরা বড়জোর অনুমান করেছি যে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একসময় এইসব অঙ্গ যথাযথভাবেই বিদ্যমান ছিল এবং কালক্রমে জীবনযাপনের অভ্যাস পরিবর্তনের ফলে এই অঙ্গগুলির ব্যবহার কমে যাওয়ায় এগুলি ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে বা কোথাও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে অথবা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে ক্রমশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি কীভাবে মানুষ এবং অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী একই সাধারণ কাঠামোয় তৈরি হয়েছে, কীভাবে তাদের সকলকে বিকাশের একই প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে এবং কেনই বা তাদের কয়েকটি লুপ্তপ্রায় আদিম অঙ্গও এক। ফলে তাদের বংশধারার সাদৃশ্যও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। এ ব্যাপারে অন্য কোনও মত গ্রহণ করার অর্থ হল এটাই স্বীকার করে নেওয়া যে আমাদের নিজেদের শারীরিক কাঠামো এবং চারপাশের অন্যান্য জীবজন্তুদের শারীরিক কাঠামোগুলো স্রেফ আমাদের ধোঁকা দেওয়ার উপকরণ মাত্র। এই সিদ্ধান্ত আরও জোরদার হবে যদি আমরা গোটা প্রাণীজগতের দিকে তাকাই এবং তাদের সাদৃশ্য ও শ্রেণিবিভাজন থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ, ভৌগোলিক বিভাজন ও ভূতাত্ত্বিক উত্তরাধিকারের (জীবাশ্মঘটিত) প্রমাণসমূহ বিচার করে দেখি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে-রকম স্পর্ধার সঙ্গে বলতেন যে তাঁরা দেবতাদের অংশ, তা যদি আমাদের সিদ্ধান্তকে কখনও প্রভাবিত করে, তাহলে সেটাকে স্রেফ কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। কিন্তু শীঘ্রই এমন এক দিন আসবে, যখন লোকে শুনলে আশ্চর্য হবে যে একসময় প্রকৃতিতত্ত্ববিদরা (যাঁরা কিনা মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলনামূলক শারীরিক গঠনতত্ত্ব ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা করেছেন) বিশ্বাস করতেন প্রত্যেকটি প্রাণীর ক্ষেত্রেই নাকি সৃজনের নিয়ম আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করেছে।

এবং তা-ও আবার সেইসমস্ত অঙ্গ যা এখনও আংশিকভাবে আদিম বা প্রাথমিক, যেমন গরু বা শুয়োরের এমন খুর যা মাটি স্পর্শ করে না। তিনি সুস্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন ওটা তাদের এখনও কাজে লাগে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তিনি এক্ষেত্রে গরুর চোয়াল কেটে উঠতে পারা কৃদন্ত বা চতুষ্পদ পুরুষ-পশুদের দুগ্ধগ্রন্থি বা গুবরে পোকার ডানা যা কাঁধের ডানা-আচ্ছাদনের মধ্যে থাকে কিংবা ফুলের গর্ভকেশরের চিহ্ন অথবা বিভিন্ন ফুলের পুংকেশর এবং আরও অনেক বিষয়ে আদৌ আলোচনা করেননি। যদিও আমি দারুণভাবে অধ্যাপক বিয়ানকনির কাজের প্রশংসা করি, তবু আমার মনে হয় অধিকাংশ প্রাণীতত্ত্ববিদের মধ্যে এই ধারণা এখনও অক্ষত যে অনুরূপ গঠন-আকৃতিকে নিছক অভিযোজনের নীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিম্নতর কোনও জৈবিক গঠন থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষে উত্তরণের ধরন

মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠনের পরিবর্তনশীলতা—উত্তরাধিকার—রূপান্তরের কারণসমূহ—মানুষ এবং নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে রূপান্তরের একই নিয়মসমূহ—জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া—বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ধিত ব্যবহার ও অব্যহারের ফলাফল—গতিরুদ্ধ বিকাশ—পুনরাবর্তন—পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রূপান্তর—বৃদ্ধির হার—বৃদ্ধিকে রোধ করা—প্রাকৃতিক নির্বাচন—পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে আধিপত্য বিস্তারকারী প্রাণী—তার শারীরিক কাঠামোর গুরুত্ব—তার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারার পিছনের কারণসমূহ—তার ফলে কাঠামোগত পরিবর্তন—শ্বদন্তের আয়তনের ক্রমহ্রাস—করোটির বর্ধিত আয়তন ও পরিবর্তিত আকার—রোমহীনতা—লেজের অনুপস্থিতি—মানুষের প্রতিরোধহীন অবস্থা।

এটা এখন স্পষ্ট যে মানুষের মধ্যে নানান বৈসাদৃশ্য আছে। একই জাতের দুজন মানুষকে দু-রকম দেখতে। আমরা কয়েক লক্ষ মানুষের মুখ তুলনা করে দেখলে দেখব যে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাত ও আয়তনেও প্রচুর পার্থক্য রয়েছে, যেমন পায়ের দৈর্ঘ্যে।[১] পৃথিবীর কোনও কোনও অংশে লম্বাটে ধরনের এবং অন্যত্র ছোট মাপের করোটি দেখা যায়, এমনকী একই জাতির সীমিত পরিসরেও গড়নের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়, যেমন আমেরিকার ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে, বিশেষত অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে, 'যারা রক্তের, আচার-ব্যবহারের এবং ভাষার বিশুদ্ধতায় ও সাদৃশ্যে সম্ভবত অদ্বিতীয়।' এমনকী স্যান্ডউইচ দ্বীপের মতো চারপাশে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা স্থানের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও করোটির গঠনে এই পার্থক্য লক্ষ করা যায়। একজন বিখ্যাত দন্তবিশারদের মতে, মুখাবয়বের মতো বিভিন্ন মানুষের দাঁতের গঠনেও প্রচুর পার্থক্য থাকে। বিভিন্ন মানুষের প্রধান প্রধান ধমনীর গতিপথ এত অস্বাভাবিক রকমের আলাদা যে অস্ত্রোপচারের কারণে ধমনীর গতিপথ সম্পর্কে একটা সাধারণ সূত্রে পৌঁছনোর জন্য ১০৪০টি শবদেহ পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। মাংসপেশী স্পষ্টতই পরিবর্তনশীল, যেমন অধ্যাপক টার্নার দেখেছেন পঞ্চাশজনের মধ্যে দুজনের পায়ের পেশীও একেবারে একরকম নয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই পার্থক্যগুলি রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। তিনি আরও বলেছেন, পায়ের সঠিক পেশীগত কার্যকলাপের ক্ষমতা অনেক সময়েই এইসব পার্থক্য সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়েছে।

১। 'ইনভেস্টিগেশন ইন মিলিটারি অ্যান্ড অ্যানথ্রোপলজিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স অফ আমেরিকান সোলজারস,' বি. এ. গোল্ড, ১৮৬৯, পৃঃ ২৫৬।

মিঃ জে. উড ৩৬ জন ব্যক্তির মধ্যে ২৯৫টি পেশীগত অসামঞ্জস্য এবং অন্য একটি ৩৬ জনের দলে প্রায় ৫৫৮টি পার্থক্য নথিভুক্ত করেছেন। শরীরের দু-দিকে একইরকম পার্থক্যকে এক্ষেত্রে একটি পার্থক্য হিসাবেই ধরা হয়েছিল। শেষের ঘটনাটিতে ৩৬টির মধ্যে একটিও 'শারীরতত্ত্বের বইতে ছাপা পেশীব্যবস্থার সাধারণ বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলেনি।' একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একই দেহে ২৫টি সুস্পষ্ট অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা গেছে। অনেক সময় একই পেশীও নানাদিক থেকেই আলাদা হতে পারে। যেমন অধ্যাপক ম্যাকালিস্টার হাতের পামারিস অ্যাসেসোরিয়াস পেশীতে কম করে কুড়িটি সুস্পষ্ট পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক উল্‌ফ জোর দিয়ে বলেছেন, শরীরের ভিতরের অংশগুলি (internal viscera) বাইরের তুলনায় অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। অন্তর্বর্তী অংশের প্রচলিত উদাহরণ টেনে লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি প্রায় মানুষের মুখসৌন্দর্যের মতো করে যকৃৎ, ফুসফুস, কিডনি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেকার গুরুতর পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও একই জাতির মধ্যে মানসিক গঠনের বৈসাদৃশ্য বা ভিন্নতা এতই বেশি পরিচিত যে সে সম্বন্ধে এখানে আর নতুন কিছু বলার নেই। নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যেও এই পার্থক্য রয়েছে। জন্তু-জানোয়ার নিয়ে যাঁদের ওঠা-বসা, তাঁরাও একথা স্বীকার করেন এবং কুকুর বা অন্যান্য গৃহপালিত পশুর বেলাতেও একই জিনিস দেখতে পাই আমরা। ব্রেহ্‌ম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে তিনি আফ্রিকাতে যে-সমস্ত বানরকে পোষ মানিয়ে ছিলেন, তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা প্রবণতা ও মেজাজের অধিকারী ছিল। উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন একটি বেবুনের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। চিড়িয়াখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা আমাকে আমেরিকার একটি বানর দেখিয়েছিলেন যারও বুদ্ধিমত্তা ছিল রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক রেঙ্গারও প্যারাগুয়েতে একই প্রজাতির কিছু বানরের আলাদা মানসিক বৈশিষ্ট্যের কথা জোর দিয়ে বলেছেন এবং তাঁর মতে এই পার্থক্য অংশত সহজাত এবং অংশত তাদের শিক্ষা ও প্রযুক্ত আচরণের ফল।

বংশগতি নিয়ে আমি অন্যত্র এত বিশদ আলোচনা করেছি যে এখানে দু-একটি কথা ছাড়া আর কিছু বলার নেই। নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের তুলনায় মানুষের ক্ষেত্রে বংশগতি সম্বন্ধে অনেক বেশি তথ্য জোগাড় করা হয়েছে, যার কিছু কিছু নিতান্তই তুচ্ছ, আবার কিছু কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যও খুব কম নয়। মানসিক গুণের ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব আমাদের পোষা কুকুর, ঘোড়া বা অন্যান্য গৃহপালিত পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। তাছাড়া বিশেষ রুচি ও অভ্যাস, সাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সাহস, ভাল ও বদ মেজাজ প্রভৃতি নিশ্চিতভাবেই উত্তরপুরুষে বর্তায়। মানুষের মধ্যে এই ঘটনা প্রায় প্রতিটি পরিবারেই দেখা যায়। মিঃ গ্যাল্টনের[২] কাছ থেকে আমরা জেনেছি যে প্রতিভা বিবিধ মানসিক গুণের এক

২। 'হেরিডিটারি জিনিয়াস : অ্যান এন্‌কোয়ারি ইনটু ইট্‌স লজ অ্যান্ড কনসিকোয়েন্‌সেস'।

জটিল ও চমৎকার যৌগ মাত্র এবং তা উত্তরপুরুষে বর্তায়, আবার অন্যদিকে ক্ষমতার হ্রাস, মানসিক অসুস্থতা প্রভৃতিও নিশ্চিতভাবেই বংশগতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে আমরা প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই অজ্ঞ, কিন্তু নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মতো মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে-অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটি প্রজাতিকে কয়েক প্রজন্ম ধরে যেতে হয়েছে, সেই অবস্থার সঙ্গে ওইসব পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক আছেই। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে বন্য পশুদের চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য থাকে এবং তা কার্যত তাদের বসবাসের ভিন্ন ভিন্ন ও পরিবর্তনশীল অবস্থার চাপেই হয়ে থাকে। মানুষের বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রেও এ-কথা একইভাবে সত্যি, এবং একই জাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও তা দেখা যায়—যদি তারা আমেরিকার মতো কোনও-একটা বিরাট জায়গায় বসবাস করে। অধিকতর সভ্য জাতিগুলির মধ্যেও (পরিবেশগত) অবস্থার প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেহেতু তারা পদমর্যাদার বিভিন্ন ধাপে রয়েছে অথবা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত, তার ফলে বর্বর জাতিগুলির সদস্যদের চেয়ে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিধিও হয়ে পড়ে অনেক বিস্তৃত। কিন্তু বর্বর জাতির সভ্যদের সমরূপতা নিয়ে প্রায়ই অতিরঞ্জন করা হয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এর কোনও অস্তিত্বই থাকে না।[৩] তথাপি, যে যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে মানুষকে যেতে হয়েছে, শুধু তা দেখেই যদি তাকে অন্যান্য জন্তুদের চেয়ে 'অনেক বেশি গৃহপালিত' বলা হয়, তাহলে ভুল হবে। অস্ট্রেলিয়ানদের মতো কোনও কোনও বর্বর জাতিকে খুব বেশি বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়নি, বরং অন্যান্য অনেক প্রজাতিকেই তাদের থেকে অনেক বেশি বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। অন্য আর-একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে-কোনও গৃহপালিত প্রাণীর থেকে মানুষ বহুলাংশে আলাদা—তার যৌনমিলন কখনওই কোনও পদ্ধতির বা অসচেতন নির্বাচনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষের কোনও জাতি বা দলকে অন্য মানুষেরা কখনও এমনভাবে বশীভূত করতে পারেনি, যাদের কিছুটা অংশকে আলাদাভাবে সংরক্ষিত রেখে অচেতনভাবেই মিলনের জন্য নির্বাচন করা সম্ভব হয়। একমাত্র প্রাশিয়ান পদাতিক বাহিনীর বিখ্যাত ঘটনাটি ছাড়া কখনওই নির্দিষ্ট কিছু ছেলে ও মেয়েকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেছে নিয়ে তাদের বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ করা হয়নি। প্রাশিয়ার ঘটনাটিতে মানুষ আসলে প্রণালীবদ্ধ নির্বাচনের নিয়মটিই পালন করেছিল। জানা গেছে যে পদাতিক সৈন্য ও তাদের দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীদের বসত-গ্রামগুলিতে বহু দীর্ঘদেহী মানুষ জন্ম নিয়েছিল। স্পার্টাতেও এক ধরনের নির্বাচন অনুসৃত হত।

৩। মিঃ বেট্ (দ্য ন্যাচারালিস্ট অন দ্য আমাজন—১৮৬৩, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯) দক্ষিণ আমেরিকার একই গোষ্ঠীভুক্ত ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'তাদের মধ্যে কোনও দুজনের মাথার আকৃতি একরকমের ছিল না। একজনের কিছু সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য-সহ ডিম্বাকৃতি মাথা এবং অন্যজনের গণ্ডদেশের বিস্তৃতি ও স্পষ্টতা, নাসারন্ধ্রের বিস্তৃতি এবং দৃষ্টির প্রখরতায় পুরোপুরি একজন মঙ্গোলিয়ান।'

জন্মের পরপরই একটা প্রাথমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সুন্দর গঠন ও প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ শিশুদের সযত্নে রক্ষা করা হত, বাদবাকিরা ছিল পরিত্যাজ্য।[৪]

যদি আমরা মানুষের সমস্ত জাতিগুলিকে একটিমাত্র প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিই, তাহলে তার পরিসর বিশাল। আমেরিকাবাসী বা পলিনেশিয়াবাসীদের মতো কিছু স্বতন্ত্র জাতিরও অবশ্য বিস্তৃত পরিসর আছে। এটা আমাদের অজানা নয় যে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে-থাকা যে-কোনও প্রজাতি সীমাবদ্ধ পরিসরের প্রজাতির চেয়ে অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। মানুষের মধ্যেকার এই বিপুল ভিন্নতাকে গৃহপালিত প্রাণীদের তুলনায় বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে-থাকা প্রাণীকুলের প্রজাতিগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই সম্ভবত সঠিক হবে।

মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে যে শুধুমাত্র একই সাধারণ কারণে বৈসাদৃশ্য ঘটে তা-ই নয়, উভয়ের ক্ষেত্রেই শরীরের একই অঙ্গ প্রায় সদৃশ ধরনেই পরিবর্তিত হয়। অধ্যাপক গডরন ও অধ্যাপক কাত্রেফাজ এত ব্যাপক গবেষণা করে এই বিষয়টি প্রমাণ করেছেন যে এখানে শুধু তাঁদের কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করাটুকুই যথেষ্ট। অস্বাভাবিকতা উভয় ক্ষেত্রেই এত সমরূপভাবে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় যে মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণী উভয়ের জন্য একই নাম এবং একই শ্রেণিবিভাগ ব্যবহার করা যেতে পারে, ঠিক যেমনটি দেখিয়েছেন ইসিডোর জিওফ্রয় সেন্ট-ইলেয়ার। গৃহপালিত পশুদের ভিন্নতা সম্পর্কিত প্রবন্ধে আমি নিম্নলিখিতভাবে একটু স্থূল পন্থাতেই পরিবর্তনের সূত্রগুলিকে রাখতে চেষ্টা করেছি : (ক) পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রত্যক্ষ ও নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া যা একই প্রজাতির প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বা প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং সদৃশ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব তাদের উপর ক্রিয়া করে প্রায় একই ধরনে; (খ) দীর্ঘদিন যাবৎ শরীরের কোনও অংশের ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলাফল; (গ) শরীরের অনুরূপ অঙ্গগুলির সংযোগ-প্রবণতা; (ঘ) শরীরের নানা অংশের পরিবর্তনশীলতা; (ঙ) বৃদ্ধির পরিপূরকনীতি—অবশ্য মানুষের ক্ষেত্রে এই সূত্রটির কোনও প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমি পাইনি; (চ) শরীরের একটি অংশের উপর আর-একটি অংশের যান্ত্রিক চাপের ফলাফল, যেমন জরায়ুর মধ্যস্থিত ভ্রূণের মাথার খুলিতে পেল্‌ভিস-এর চাপ; (ছ) বিকাশের গতিরোধ, যার ফলে শরীরের কোনও অংশের আকস্মিক হ্রাস বা অবনতি ঘটে

৪। মিটফোর্ড-এর 'হিস্ট্রি অফ গ্রিস', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৮২। এটা আরও জানা যায় জেনোফেন-এর 'মেমোর‍্যাবিলিয়া' বইটির একটি অংশ থেকে (যার প্রতি রেভারেন্ড জে. এন. হোর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন)। গ্রিকদের একটি স্বীকৃত নিয়মই ছিল যে পুরুষরা ভবিষ্যৎ সন্তানদের স্বাস্থ্য ও প্রাণপ্রাচুর্যের দিকে লক্ষ রেখে তাদের স্ত্রী-নির্বাচন করবে। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ সালে গ্রিক-কবি থিওগ্‌নিস্ মনে করেছিলেন মানুষের উন্নতির পক্ষে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন, যদি তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়। তিনি দেখেছিলেন সম্পদ প্রায়শই যৌন নির্বাচনের সঠিক কাজের পক্ষে বাধাস্বরূপ। এ বিষয়ে তাঁর একটি চমৎকার কবিতাও আছে।

থাকে; (ছ) পুনরাবর্তনের মাধ্যমে হারিয়ে-যাওয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পুনরাবির্ভাবের প্রবণতা; এবং শেষত, (ঝ) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তন। এই সবক'টি সূত্রই মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য, এমনকী এর অধিকাংশ সূত্র উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেকটি সূত্রের আলোচনা এখানে নিরর্থক।[৫] কিন্তু কয়েকটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তার জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন।

পরিবর্তিত অবস্থার প্রত্যক্ষ ও নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া

এটি খুবই জটিল বিষয়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে সমস্ত জীবজন্তুর ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত অবস্থা কখনও সামান্য, কখনও-বা যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাব ফেলে এবং যথেষ্ট সময় দেওয়া হলে সর্বক্ষেত্রে ফলাফল সম্ভবত প্রায় একই হত। কিন্তু এর সপক্ষে আমি এখনও কোনও স্পষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি। দেহগঠন বা কাঠামো সংশ্লিষ্ট অসংখ্য বিষয়, যা নির্দিষ্ট কারণে অর্জিত হয়েছে, তার উপযুক্ত কারণগুলি অবশ্য জানার চেষ্টা করা যায়। তবে এতে কোনও সন্দেহ নেই যে অবস্থার পরিবর্তন অনির্দিষ্ট সংখ্যক রূপান্তরক্রিয়ার কারণ হতে পারে, যার ফলে কোনও কোনও শারীরিক গঠন কিছু পরিমাণে নমনীয় গুণের অধিকারী হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গত যুদ্ধের সময় প্রায় দশ লাখ সৈন্যের দৈহিক পরিসংখ্যান, কোন্ অঞ্চলে তাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ইত্যাদি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে দৈহিক উচ্চতার ওপর আঞ্চলিক প্রভাব প্রায় সরাসরিভাবে কাজ করে, এবং আমরা আরও জানতে পারি, 'কোন্ কোন্ বিশেষ অবস্থা দৈহিক বৃদ্ধির অনুকূল এবং জন্মস্থান কীভাবে দৈহিক উচ্চতার ওপর তার স্পষ্ট প্রভাব রেখে যায়।' যেমন, 'পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের দৈহিক বিকাশের কালে উচ্চতাবৃদ্ধির হার বেশ ভাল।' অন্যদিকে, নাবিকদের জীবনে বিকাশের কাল অনেক দেরিতে আসে, কারণ দেখা গেছে, 'সতেরো-আঠারো বছরের স্থলসৈন্যদের উচ্চতার সঙ্গে নাবিকদের উচ্চতার বিশাল তফাত রয়েছে।' মিঃ বি. এ. গোল্ড উচ্চতার ওপরে কার্যকরী পরিবেশগত প্রভাবগুলির প্রকৃতি নিরূপণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র নঞর্থক কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, যেমন, দৈহিক উচ্চতা আবহাওয়া বা জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, মৃত্তিকা বা ভূমির উচ্চতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এমনকী জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বা প্রাচুর্যের সঙ্গেও ততটা সম্পর্কযুক্ত নয়। এই শেষ সিদ্ধান্তটি অধ্যাপক ভিলের্মের সিদ্ধান্তের সরাসরি বিরোধী, যিনি ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে বাধ্যতামূলকভাবে নিযুক্ত

৫। এই সূত্রগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি আমার 'ভ্যারিয়েশনস অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস্ আন্ডার ডোমেস্টিকেশন', ২য় খণ্ড, ২২ ও ২৩ পরিচ্ছেদে। এম. জে. পি. ডুরান্ড 'দ্য দিঁফ্লুয়েঁস্ দে মিলিউ' নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এখানে তিনি মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী উদ্ভিদের বিষয়টিতে অত্যন্ত জোর দিয়েছেন।

পদাতিক সৈন্য ও নৌসৈন্যদের উচ্চতার পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেছিলেন। একই দ্বীপে বসবাসকারী পলিনেশিয়ান সর্দার ও সাধারণ সৈন্যদের দৈহিক উচ্চতার তুলনা করলে, কিংবা একই মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত উর্বর আগ্নেয়গিরিজাত দ্বীপ ও অনুর্বর প্রবালদ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে[৬] তুলনা করলে, অথবা পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের ফিজিয়ান অধিবাসীদের (যাদের জীবিকানির্বাহের প্রণালীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে) তুলনা করলে এ সিদ্ধান্ত নাকচ করা প্রায় অসম্ভব যে উত্তম খাদ্য ও অধিক স্বাচ্ছন্দ্য দৈহিক উচ্চতার ওপর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যগুলি থেকে বোঝা যায় এ-ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কতটা অসুবিধাজনক। ডঃ বিড্ডো সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন যে ব্রিটেনের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে শহরে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করাটা তাদের উচ্চতার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে অর্থাৎ তাদের উচ্চতা কমে যায়, এবং তিনি মনে করেন আমেরিকার মতোই কিছুটা বংশগতির কারণেও এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ডঃ বিড্ডো আরও মনে করেন যে যখন কোনও 'জাতি দৈহিক বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়, তখন সে একইসঙ্গে প্রাণশক্তি ও নৈতিক শক্তিরও চরমে ওঠে।'

বাহ্যিক অবস্থা মানুষের ওপর সরাসরি অন্য কোনও প্রভাব ফেলে কিনা, তা সঠিক জানা যায় না। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে জলবায়ুঘটিত তারতম্যেরও নির্দিষ্ট প্রভাব আছে, যেহেতু স্বল্প উষ্ণতা ফুসফুস ও মূত্রাশয়ের পক্ষে কম-বেশি সহায়ক এবং যকৃৎ ও শরীরের চামড়া অধিক উষ্ণতায় বেশি কার্যকরী। আগে ভাবা হত ত্বকের রঙ ও চুলের বৈশিষ্ট্য বুঝি আলো ও তাপের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অস্বীকার করা যায় না যে এর সামান্য কিছু প্রভাব অবশ্যই আছে, তবু এ-কথা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে এমনকী বহু বছর ধরে কার্যকরী থাকলেও তার প্রবাব নিতান্তই সামান্য। মানুষের বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গে আলোচনার সময় এ-বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা করা হবে। গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রে অবশ্য এ-কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া তাদের রোমবৃদ্ধির ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এ-বিষয়ে এখনও তেমন কোনও প্রমাণ আমি পাইনি।

শরীরের কোনও অংশের বহুল ব্যবহার বা অব্যবহারের ফল

আমরা জানি, যথাযথ ব্যবহার যেমন পেশীশক্তিকে উজ্জীবিত করে, তেমনই অব্যবহার বা নির্দিষ্ট কোনও স্নায়ুতন্তুর বিনাশ ক্রমশ পেশীগত শক্তিহীনতার কারণ

৬। পলিনেশিয়ানদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, অধ্যাপক রিচার্ডের 'ফিজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫ ও ২৮৩, এবং অধ্যাপক গর্ডনের 'দ্য লেস্‌পেস্', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৯। আবার উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাসকারী হিন্দুদের সঙ্গে বাংলার (সমভূমির) অধিবাসীদের হাবভাবে অনেক মিল আছে। দ্রষ্টব্য, অধ্যপক এলফিনস্টোনের 'হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৪।

হয়ে দাঁড়ায়। চোখ নষ্ট হলে চোখের স্নায়ুও ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে আসে। কোনও-একটি শিরাকে বেঁধে দিলে তার পার্শ্ববর্তী রক্তবাহী নালীগুলি শুধুমাত্র ব্যাসেই বেড়ে যায় না, তাদের বেধ ও শক্তিও বাড়ে। যখন একটি কিডনি অসুস্থতার কারণে কাজ বন্ধ করে, তখন অন্যটি আকারে বেড়ে যায় এবং প্রায় দ্বিগুণ কাজ করে। অতিরিক্ত ভারবহনের দরুন হাড় শুধু মোটাই হয় না, দৈর্ঘ্যেও বেড়ে যায়। বিভিন্ন পেশা অভ্যাসগত কারণে শরীরের নানা অংশের আনুপাতিক পরিবর্তন ঘটায়। ইউনাইটেড স্টেট্স কমিশন পরীক্ষা করে দেখেছিল, গত যুদ্ধে যারা নাবিক হিসেবে কাজ করেছে, তাদের পা পদাতিক সৈন্যদের চেয়ে অন্তত ০.২১৭ ইঞ্চি বেশি লম্বা, যদিও নাবিকদের গড় উচ্চতা সাধারণত কম। এবং তাদের বাহুর মাপ ১.০৯ ইঞ্চি কম, অর্থাৎ তাদের স্বল্প উচ্চতার তুলনায়ও এই মাপ সমানুপাতিক নয়। বাহুর দৈর্ঘ্যের এই স্বল্পতা সম্ভবত অতিব্যবহারের ফল, যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। কিন্তু নাবিকেরা প্রধানত দাঁড় টানে, সেই অর্থে কোনও ভারী জিনিস তারা বহন করে না। আবার পদাতিক সৈন্যদের তুলনায় নাবিকদের গলার বেড় ও পায়ের পাতার উপরিভাগের বিস্তৃতি অনেক বেশি, কিন্তু বুক, কোমর ও নিতম্বের পরিধি বেশ কম।

পূর্বোল্লিখিত পরিবর্তনগুলি বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে জীবনের একই অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘকাল অনুসৃত হলে বংশানুক্রমিক হয়ে উঠত কিনা সঠিক জানা না গেলেও, তা হওয়া বোধহয় অসম্ভব নয়। অধ্যাপক রেঙ্গার দেখিয়েছেন—পায়াগাস ইন্ডিয়ানারা, যারা পুরুষানুক্রমিকভাবে সারা জীবন শরীরের নিম্নাংশকে অচল রেখে ডোঙা বা শালতি চালায়, তাদের কৃশ পা ও শক্তপোক্ত বাহু উত্তরপুরুষে বর্তায়। অন্যান্য লেখকরাও অনুরূপ ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অধ্যাপক ক্রান্ৎস্, যিনি দীর্ঘদিন এস্কিমোদের সঙ্গে কাটিয়েছেন, তাঁর মতে, 'এস্কিমোরা বিশ্বাস করে সীল-শিকারের জন্য (যা তাদের সর্বোৎকৃষ্ট শিল্প ও প্রধান ধর্ম) প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনশক্তি ও হাতের কৌশল বংশানুক্রমিক। কথাটা বোধহয় একেবারে ভিত্তিহীন নয়, কারণ একজন বিখ্যাত সীলমাছ-শিকারির ছেলে শৈশবে তার বাবাকে হারালেও পরবর্তীকালে নিজের যোগ্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে থাকে।' কিন্তু এক্ষেত্রে মানসিক ক্ষমতাও ঠিক শারীরিক গঠনের মতোই বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বলে মনে হয়। আবার ভদ্রলোকদের তুলনায় ইংরেজ শ্রমিকদের হাত জন্মাবধি দীর্ঘ বলে অনুমিত। অন্তত কোনও কোনও ক্ষেত্রে হাত-পা ও চোয়ালের বিকাশের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক দেখা যায়, তা থেকে মনে হয় যে-সমস্ত শ্রেণির মানুষ হাত-পা খুব বেশি ব্যবহার করে না, তাদের চোয়াল আকারে এ-কারণে ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। এ-কথা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সভ্য ও মার্জিত ভদ্রলোকদের তুলনায় শারীরিকভাবে বেশি পরিশ্রমী মানুষ অথবা বর্বরজাতির মানুষদের চোয়াল অনেক বড় হয়। তবে, হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, বর্বররা রান্না-না-করা খাদ্য চিবিয়ে খায় বলে তাদের চোয়ালের অতিরিক্ত ব্যবহার হয়, ফলে সংশ্লিষ্ট পেশী (masticatory muscles) ও হাড়ের ওপর তার প্রভাব পড়ে। গর্ভাবস্থায় শিশুদের পায়ের পাতার চামড়া শরীরের যে-

কোনও অংশের চামড়ার চেয়ে পুরু থাকে এবং নিঃসন্দেহে তার কারণ বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার, অর্থাৎ বহু প্রজন্ম ধরে মানুষের পায়ের পাতার ওপর যে-চাপ পড়ে তারই ফল এটা।

ঘড়ি-প্রস্তুতকারক ও তক্ষণশিল্পীদের দৃষ্টিশক্তি সাধারণত কম হয়। অথচ যারা ঘরের বাইরে প্রকৃতির খোলা হাওয়ায় বেশিক্ষণ থাকে তাদের, বিশেষ করে বর্বরদের, দৃষ্টিশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ।[৭] দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতা বা তীক্ষ্ণতা নিশ্চিতভাবেই বংশানুক্রমিক হতে পারে। দৃষ্টিশক্তি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষেত্রে বর্বরদের তুলনায় ইউরোপীয়দের তুলনামূলক ক্ষীণতা নিঃসন্দেহে বহু প্রজন্ম ধরে ক্রমিক অব্যবহারেরই অর্জিত ফল। কারণ অধ্যাপক রেঙ্গার[৮] জানিয়েছেন যে তিনি বরাবর লক্ষ করে দেখেছেন, অনেক ইউরোপীয় অ-সভ্য ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সারা জীবন কাটিয়েও ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতায় তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তিনি আরও লক্ষ করেছেন যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সঠিকভাবে গ্রহণের জন্য করোটিস্থিত ছিদ্রপথগুলি ইউরোপীয়দের চেয়ে আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেক বড় হয় এবং সম্ভবত এই তথ্যটি ইন্দ্রিয়গুলির তুলনামূলক মাত্রাগত পার্থক্যের দিকেও অঙ্গুলিনির্দেশ করে। অধ্যাপক ব্লুমেনবাখ্-ও আমেরিকার আদিবাসীদের করোটিতে নাকের বৃহৎ গর্তের (nasal cavities) কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এই ঘটনা তাদের তীব্র ঘ্রাণশক্তির সঙ্গে যুক্ত। অধ্যাপক প্যালাস-এর মতে, উত্তর-এশিয়ার সমতলবাসী মঙ্গোলিয়ানদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি আশ্চর্যরকম তীব্র। অধ্যাপক প্রিচার্ড মনে করেন গালের হাড় (zygoma) বরাবর করোটির বিস্তৃত বিস্তার তাদের অত্যুন্নত ইন্দ্রিয়শক্তিরই পরিচায়ক।

কেশুয়া ইন্ডিয়ানরা পেরুর উঁচু মালভূমিতে বসবাস করে। অধ্যাপক আলসিদ দ্যরবিনি বলেছেন যে সবসময় বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাসগ্রহণের ফলে তাদের বুকের ছাতি ও ফুসফুস অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে থাকে। ফুসফুসের বায়ুকোষগুলিও ইউরোপীয়দের চেয়ে আকারে বেশ বড় এবং সংখ্যায়ও অনেক বেশি। এ-তথ্য অবশ্য বেশ সন্দেহজনক মনে হতে পারে। কিন্তু মিঃ ডি. ফরবেস, দশ হাজার থেকে পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে বসবাসকারী আইমারা নামক একটি সংকর জাতির ক্ষেত্রে বিষয়টি

৭। একটি বিরল এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা হল—নাবিকদের দৃষ্টিশক্তি সাধারণত ডাঙার মানুষদের তুলনায় কম হয়ে থাকে। ডঃ বি. এ. গোল্ড তাঁর গ্রন্থে ('স্যানিটারি মেমোয়্যারস অফ দ্য ওয়ার অফ দ্য রবেলিয়ন', ১৮৬৯, পৃষ্ঠা ৫৩০) এ-কথা প্রমাণ করেছেন এবং তিনি মনে করেন নাবিকদের দৃষ্টিসীমা সাধারণত 'জাহাজের দৈর্ঘ্য ও মাস্তুলের উচ্চতা'র মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলেই তাদের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।

৮। 'স্যগেথিয়ের ফন প্যারাগুয়ে', পৃঃ ৮, ১০। ফুজিয়ানদের প্রখর দৃষ্টিশক্তি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এ বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য অধ্যাপক লরেন্সের বই, 'লেকচারস অন ফিজিওলজি' ইত্যাদি, ১৮২২, পৃঃ ৪০৪। মিঃ গিরদ্‌জিউলন সম্প্রতি এ-বিষয়ে প্রচুর মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন (দ্রষ্টব্য, 'রেভ্যু দ্য কুর সায়েনটিফিক', ১৮৭০, পৃঃ ৬২৫) এবং কমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার আসল কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন (C'est le travail assldu de pres)।

লক্ষ করে আমায় জানিয়েছেন যে, তাঁর দেখা অন্য সমস্ত জাতির মানুষদের চেয়ে শারীরিক পরিধি ও দৈর্ঘ্যে তারা অনেকটাই আলাদা। তাঁর তথ্যসারণীতে তিনি ১০০০ এককের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকের শারীরিক উচ্চতা বিচার করেছেন এবং একই মানানুসারে অন্যান্য অঙ্গের মাপ নিয়েছেন। দেখা গেছে আইমারাদের অগ্রবাহু (extended arms) ইউরোপীয়দের চেয়ে দৈর্ঘ্যে ছোট এবং নিগ্রোদের তুলনায় আরও বেশি ছোট। একইরকমভাবে তাদের পা-ও বেশ ছোট। উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক আইমার পায়ের উপরের অংশের হাড়ও (femur) পায়ের নিম্নাংশের হাড়ের (tibia) চেয়ে ছোট। গড় হিসেব অনুযায়ী, ঊর্ধ্বাংশ যদি ২১১ একক হয়, তাহলে নিম্নাংশ ২৫২ একক। অথচ একজন ইউরোপীয়ের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ২৪৪/২৩০ এবং তিনজন নিগ্রোর ক্ষেত্রে এই অনুপাত ২৫৮/২৪১ একক। আবার একইভাবে তাদের হাতের উপরের অংশের হাড়ও (humerus) অগ্রবাহুর তুলনায় ছোট। মিঃ ফরবেসের মতানুযায়ী, দেহকাণ্ডের নিকটবর্তী অঙ্গসমূহের এই ক্ষুদ্রতা সম্ভবত দেহের নিম্নাংশের অতিবৃদ্ধিরই আংশিক পরিপূরক। আইমারাদের কাঠামোগত আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গোড়ালির সামান্য অংশ বাইরে বেরিয়ে থাকার কথাও উল্লেখ করা দরকার।

আইমারা জাতির লোকেরা শীতল ও সুউচ্চ বাসভূমিতে থাকতে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, যখন স্পেনীয়রা পূর্বদিকের নিচু সমতলভূমিতে তাদের নামিয়ে এনে অধিক মজুরির বিনিময়ে সোনার খনিতে কাজ করতে প্রলুব্ধ করল, তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেছে। তথাপি মিঃ ফরবেস এখানে এমন কয়েকটি বিশুদ্ধ পরিবারের সন্ধান পেয়েছেন যারা দু-পুরুষ ধরে টিকে আছে এবং এখনও তাদের মধ্যে বংশানুক্রমিক কিছু কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু কোনওরকম মাপামাপি ছাড়াই এ-কথা বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তাদের ওই বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমহ্রাসমান এবং পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে উচ্চ-মালভূমির লোকেদের মতো তাদের শরীর-কাঠামো তত দীর্ঘ নয় এবং তাদের ফিমোরা দৈর্ঘ্যে কিছুটা বেড়ে গেছে, তার তুলনায় কম হলেও টিবিয়া-ও কিছুটা বেড়েছে। এ-বিষয়ে প্রকৃত পরিমাপগুলি জানা যেতে পারে মিঃ ফরবেস-এর স্মৃতিকথা থেকে। এরপরে সম্ভবত আর কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না যে উচ্চ অঞ্চলে দীর্ঘ কয়েক প্রজন্ম ধরে বসবাস করলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুভাবেই শরীরের আনুপাতিক গঠনবিন্যাসে বংশগত রূপান্তর দেখা দিতে পারে।[৯]

অস্তিত্বের পরবর্তীকালে কোনও বিশেষ অঙ্গের বেশি বা কম ব্যবহারের ফলে মনুষ্যদেহে তেমন কোনও রূপান্তর হয়তো না-ও ঘটতে পারে, কিন্তু উপরোল্লিখিত তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে এ-বিষয়ে তার প্রবণতা এখনও পুরোপুরি লোপ

৯। ডঃ উইলকেন্স (দ্রষ্টব্য, 'ল্যান্ডউইর্দ শ্যাফ্‌টও উশেনব্লাট'—সংখ্যা ১০, ১৮৬৯) সম্প্রতি একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী গৃহপালিত পশুদের দৈহিক গঠন কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

পায়নি এবং আমরা নিশ্চিত যে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে এই নিয়ম এখনও ক্রিয়াশীল। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে সুদূর অতীতে যখন মানুষের আদি পূর্বপুরুষরা পরিবর্তনশীল অবস্থায় ছিল এবং চতুষ্পদ থেকে ক্রমে দ্বিপদবিশিষ্ট প্রাণীতে পরিণত হচ্ছিল, তখন প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্ভবত শরীরের বিভিন্ন অংশের বেশি বা কম ব্যবহারের বংশগত প্রভাবের দ্বারা দারুণভাবে উপকৃত হয়েছিল।

গতিরুদ্ধ বিকাশ

গতিরুদ্ধ বিকাশ ও গতিরুদ্ধ বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম ক্ষেত্রে অঙ্গগুলির সাধারণ বৃদ্ধির কোনও হানি ঘটে না, যদিও তারা বিকাশের প্রাথমিক অবস্থাতেই থেকে যায়। বিভিন্ন অস্বাভাবিক অঙ্গগুলি এর মধ্যে পড়ে এবং কোনও-কোনওটা, যেমন নাকের নীচে চেরা ঠোঁট, প্রায়শই বংশানুক্রমিক বলে পরিচিত। অধ্যাপক ফখৎ-এর বর্ণনানুযায়ী জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধদের গতিরুদ্ধ মস্তিষ্ক-বিকাশের কথাটা এখানে উল্লেখ করাই আপাতত যথেষ্ট। সাধারণ মানুষের তুলনায় এদের করোটি অনেক ছোট এবং মস্তিষ্কের ভাঁজ প্রায় জটিলতাহীন। এদের কপালের হাড় বা দুই ভ্রূ-র ওপরের প্রক্ষিপ্ত অংশ যথেষ্ট ছোট হয় এবং চোয়াল সামনের দিকে প্রায় 'নির্লজ্জভাবে' বেরিয়ে থাকে, অর্থাৎ এদের দেখলে মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের কথাই মনে পড়ে। এদের বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য মানসিক ক্ষমতা খুবই দুর্বল। কথা বলার শক্তি নেই, বিশেষ কোনও বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না, তবে অনুকরণের কিছুটা ক্ষমতা এদের থাকে। সাধারণত এরা বেশ শক্তিশালী এবং যথেষ্ট কর্মঠ হয়, প্রায় সারাক্ষণ নেচে-কুঁদে-লাফিয়ে বেড়ায় এবং নানারকম মুখভঙ্গি করে। এরা প্রায়ই চার হাত-পায়ে সিঁড়ি চড়ে এবং, আশ্চর্য ব্যাপার হল, উঁচু আসবাব বা গাছে চড়তে এরা খুব ভালবাসে। ভেবে দেখুন, ছাগল বা উচ্চ উপত্যকার যে-কোনও প্রাণীই ছোটখাটো টিলায় ওঠার সময় কীভাবে আনন্দ প্রকাশ করে। আরও কিছু কিছু বিষয়ে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের সঙ্গে এই জড়বুদ্ধিদের মিল আছে। এ-রকম অসংখ্য ঘটনা নথিভুক্ত আছে যে কীভাবে এরা প্রতি গ্রাস খাওয়ার আগে সতর্কভাবে তা একবার শুঁকে নেয়। এ-রকম এক জড়বুদ্ধি ব্যক্তি উকুন মারতে হাতের সঙ্গে মুখও ব্যবহার করত। এদের অধিকাংশই অত্যন্ত নোংরা ধরনের অভ্যাসে অভ্যস্ত, সৌন্দর্য বা শালীনতার কোনও বোধ থাকে না এবং এদের অনেকেরই শরীরময় রোমের আধিক্য দেখা যায়।[১০]

১০। অধ্যাপক লেকক্ পশু-সদৃশ নির্বোধদের 'থেরয়েড' নামে চিহ্নিত করে তাদের চরিত্রের সারসংকলন করেছেন। দ্রষ্টব্য, 'জার্নাল অফ মেন্টাল সায়েন্স', জুলাই ১৮৬৩। আবার ডঃ স্কট (দ্রষ্টব্য, 'দ্য ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৭০, পৃঃ ১০) খাবারের গন্ধ সম্পর্কে এদের অচেতনতার কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়টি এবং নির্বোধদের রোমশতা বিষয়ক ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ মডস্লের গ্রন্থ, 'বডি অ্যান্ড মাইন্ড', পৃঃ ৪৬ থেকে ৫৭; পাইনেল-ও জনৈক নির্বোধের রোমশতা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানিয়েছেন।

বংশগতির মাধ্যমে লুপ্তাংশের পুনরাবর্তন

এখানে যা লিখছি তার কিছু কিছু আগের অনুচ্ছেদেই (গতিরুদ্ধ বিকাশ প্রসঙ্গে) হয়তো বলা যেত। শরীরের কোনও-একটি অংশের স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও যখন অংশটি ততক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে চলে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই একই প্রজাতির কোনও নিম্নশ্রেণির পূর্ণাঙ্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রাণীর ওই অংশটির প্রায় সদৃশ রূপ সে না পায়, তখন এক অর্থে তাকে লুপ্তাংশের পুনরাবর্তন বলা যেতে পারে। যে-কোনও শ্রেণির অন্তর্গত নিম্নস্তরের প্রাণীদের দেখে তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষদের গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা যায়। এ-কথা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে শরীরের কোনও জটিল অংশ ভ্রূণের বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মে গতিরুদ্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পুনরায় বাড়তে থাকবে, যাতে অবশেষে তার প্রকৃত কাজটি সে করতে পারে। এই ব্যাপারটিকে সম্ভবপর বলে মেনে নেওয়া যায় একমাত্র তখনই, যদি ধরে নেওয়া হয় যে এখানকার এই ব্যতিক্রমী বা গতিরুদ্ধ অংশটি বহু যুগ আগে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় কার্যকরী ছিল, তখনই এই ক্ষমতা সে অর্জন করেছিল। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধদের সরল মস্তিষ্ক বানরদের মস্তিষ্কগঠনের সঙ্গে এতদূর পর্যন্ত সাদৃশ্যযুক্ত হতে দেখা যায় যে তাকে এই অর্থে পুনরাবর্তনের উদাহরণ বলা যেতে পারে।[১১] এ-রকম আরও অনেক ঘটনাই আমাদের বর্তমান

১১। আমার 'ভ্যারিয়েশনস অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন' (২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭) বইটিতে শরীরে অতিরিক্ত স্তনগ্রন্থি বিশিষ্ট অনেক স্ত্রীলোকের কথা জানিয়েছি এবং এর কারণ হিসেবে আমি পূর্বপুরুষদের শারীরিক গঠনে প্রত্যাবর্তনের কথাই উল্লেখ করেছিলাম। মেয়েদের বুকে সুসমঞ্জসভাবে অবস্থিত অতিরিক্ত স্তনগ্রন্থি থাকার ঘটনাটি লক্ষ করেই এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম আমি। বিশেষ করে একটি ঘটনা আমাকে এই সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গিয়েছিল—জনৈকা স্ত্রীলোকের কুঁচকিতে একটি কার্যকরী স্তনগ্রন্থি ছিল এবং তার মায়ের শরীরেও ছিল অতিরিক্ত স্তনগ্রন্থি। কিন্তু আমি এ-ও দেখেছি যে শরীরের নানা অংশে, যেমন পিঠ, বাহুমূল বা উরুতে, স্তনগ্রন্থির মতো দেখতে অংশ সৃষ্টি হয়। জনৈকা নারীর উরুতে সৃষ্টি হওয়া এ-রকম স্তন থেকে এত দুধ পাওয়া যেত যে তার সাহায্যেই তার বাচ্চাকে দিব্যি খাওয়ানো যেত। কাজেই, অতিরিক্ত স্তনগ্রন্থি সৃষ্টির কারণ হচ্ছে পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন—এই সিদ্ধান্তটি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তটিকে এখনও আমি যথেষ্ট সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত বলেই মনে করি, কারণ এমন অনেক নারীর কথা আমি জানতে পেরেছি যাদের বুকে সুসমঞ্জসভাবে অবস্থিত দু-জোড়া স্তন দেখা গেছে। সকলেই জানেন যে লেমুর জাতীয় বানরদের বুকে দু-জোড়া স্তন থাকে। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যখন শুনি যে এমন পাঁচজন পুরুষমানুষের সন্ধানও পাওয়া গেছে যাদের প্রত্যেকের শরীরে একজোড়ারও বেশি স্তন আছে (অবশ্যই একেবারে প্রাথমিক ধরনের)। দ্রষ্টব্য, 'জার্নাল অফ অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি', ১৮৭২, পৃঃ ৫৬; এখানে ডঃ হ্যান্ডিসাইড দু'জন ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যে এই অস্বাভাবিক অংশটি দেখা গেছে। আরও দ্রষ্টব্য ডঃ বার্টেলস্-এর গবেষণাপত্র, 'রিচার্টস অ্যান্ড দ্যুবোয়া-রেমান্ডস্ আর্কাইভ', ১৮৭২, পৃঃ ৩০৪; তাছাড়া ডঃ বার্টেলস্ একজন মানুষের শরীরে পাঁচটি স্তনগ্রন্থির কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলির মধ্যে একটি

শিরোনামে আলোচনার যোগ্য। শরীরের কিছু কিছু অংশ, যা হামেশাই মানুষের সঙ্গে একই শ্রেণিভুক্ত নিম্নস্তরের প্রাণীদের দেহে দেখা যায়, তা কখনও কখনও মানুষের মধ্যেও দেখা দিতে পারে, যদিও স্বাভাবিক মনুষ্যভ্রূণে তার দেখা পাওয়া যায় না। হঠাৎ যদিও-বা দেখা যায়, সেক্ষেত্রে সেগুলি অস্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত হতে থাকে—অবশ্য মানব শ্রেণিভুক্ত নিম্নস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিকাশের ওই ধারাই স্বাভাবিক। পরবর্তী উদাহরণে এই মন্তব্যগুলি আরও পরিষ্কার হবে।

মোটামুটি বিকশিত অবস্থায় নাভির উপরে অবস্থিত ছিল (মেবেল ফন হেন্‌স্‌বাথ মনে করেন, এই ঘটনাটি কিছু কাইরোপ্‌টেরা জাতীয় প্রাণীর মোটামুটি বিকশিত স্তনের সঙ্গে তুলনীয়। মোটের ওপর আমাদের সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে যে মানুষের পূর্বপুরুষদের শরীরে একজোড়ার অধিক স্তনের অস্তিত্ব না থাকলে পরবর্তীকালের নারী বা পুরুষদের মধ্যে অতিরিক্ত স্তন কখনওই যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হয়ে উঠতে পারত কি না।

উপরোল্লিখিত গ্রন্থটিতে (ভ্যারিয়েশনস অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২) কিছু দ্বিধা সত্ত্বেও আমি একাধিক উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছিলাম যে মানুষ ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রাণীর হাতে বা পায়ে পাঁচটির বেশি আঙুল (Polydactylism) আসলে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়াকেই সমর্থন করে। কিছু ইক্‌থিওপ্‌টেরিজিয়া প্রাণীর হাতে বা পায়ে পাঁচটির বেশি আঙুল থাকে—অধ্যাপক ওয়েনের এই তথ্য আমাকে অনেকটাই সহায়তা করেছিল, যার ফলে আমি ধারণা করেছিলাম যে এগুলি (আঙুল) প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। কিন্তু অধ্যাপক জিগেনবোর (দ্রঃ 'জেনাইশ্চেন জেইতশ্চরিভ্‌ত্', বি. ৫, হেফ্‌ট্ ৩, পৃঃ ৩৪১) অধ্যাপক ওয়েনের বিরোধিতা করেছেন। অন্যদিকে, হাড়ের কেন্দ্রীয় অবস্থানের (central chain) উভয় পাশে গাঁটযুক্ত হাড়ের আভাস (bony rays) থাকা প্যাডল সেরাটোডাস (Paddle ceratodus) প্রাণীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মিঃ গাস্থার বলেছেন, মধ্যমার একপাশে বা দু'পাশে ছ'টি বা তার বেশি আঙুল এমন-কিছু বড় রকমের অসুবিধা সৃষ্টি করে না; এক্ষেত্রে এগুলি প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পুনরুদ্ভাবিত হয়। ডঃ কুতেভিন আমাকে জানিয়েছেন যে এমন একজন লোকের কথা তাঁরা নথিভুক্ত করেছেন যার হাতে ও পায়ে ২৪টি করে আঙুল আছে। এ থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে অত্যধিক আঙুলের উপস্থিতি প্রত্যাবর্তনের জন্যে হলেও তা শুধুমাত্র বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত নয়, এবং তার চেয়েও বড় কথা হল, আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি যে নিম্নশ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্বাভাবিক আঙুলের মতো তা ছেদনের পর পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা লাভ করে। অবশ্য আমি আমার বইয়ের (ভ্যারিয়েশনস অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন) দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যাখ্যা করেছি কেন এখন আমি নথিভুক্ত বিভিন্ন ঘটনার এই ধরনের পুনরুৎপাদনের ওপর যথেষ্ট আস্থাশীল নই। তথাপি লক্ষণীয় যে বেশির ভাগ গতিরুদ্ধ বিকাশ ও শারীরিক অংশের প্রত্যাবর্তন একটি আন্তঃসম্পর্কিত পদ্ধতিবিশেষ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, ওই অবস্থায় বা গতিরুদ্ধ দশায় ভ্রূণের বিভিন্ন প্রকার গঠন-আকৃতি যা অধ্যাপক মেকেল ও অধ্যাপক ইলিডোর জিওফ্রে সেন্ট-হিলেয়ার বার বার উল্লেখ করেছেন, যেমন নাকের নীচে চেরা ঠোঁট, যুগ্ম জরায়ু ইত্যাদির কথা। কিন্তু এখন বোধহয় সবচেয়ে নিরাপদ হবে যদি আমরা একইসঙ্গে অত্যধিক আঙুলের বিকাশ ও কিছু নিম্নশ্রেণির মানুষের পূর্বপুরুষদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া শারীরিক অংশের মধ্যে সম্পর্কের ধারণাটি আপাতত সরিয়ে রাখি।

বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে জরায়ু ক্রমশ দুটি স্বতন্ত্র মুখ ও পরিসর-সহ একটি যুগ্ম-অঙ্গ (যেমনটা দেখা যায় ক্যাঙারুদের ক্ষেত্রে) থেকে একক-অঙ্গে পরিণত হয়েছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণির বানর বা মানুষের ক্ষেত্রে জরায়ুতে সামান্য একটি অন্তর্বর্তী ভাঁজ যদিও দেখা যায়, তবুও তাকে কোনওভাবেই যুগ্ম-অঙ্গ বলা চলে না। ইঁদুরের ক্ষেত্রে এই উভয় সীমার মধ্যবর্তী একটি সঠিক পর্যায়ক্রমের উপস্থিতি দেখা যায়। সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রেই জরায়ু ক্রমবিকশিত হয় দু'টি প্রাথমিক নালী (primitive tubes) থেকে, যার নিম্নতর অংশ 'করনুয়া' (cornua) গঠন করে। ডঃ ফ্যারে বলেছেন, 'অন্তঃসীমায় দু'টি করনুয়ার মিলনে মানুষের দেহে জরায়ু অঙ্গটি গঠিত হয়, আবার যে-সব প্রাণীর ক্ষেত্রে মধ্যাংশ নেই তাদের করনুয়া দু'টি একত্রিত হয় না। জরায়ুর ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে করনুয়া দু'টি হয় জরায়ুর সঙ্গে মিশে যায় অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ লুপ্ত না হচ্ছে ততক্ষণ ক্রমশ ছোট হতে থাকে।' নিম্নশ্রেণির বানর ও লেমুর জাতীয় প্রাণী পর্যন্ত সকলের দেহেই জরায়ুর গঠনবৈশিষ্ট্য করনুয়া অংশ থেকেই লক্ষণীয়।

স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে এ-ধরনের ঘটনা খুব বিরল নয় যেখানে পরিণত জরায়ুতেও করনুয়া দেখা যায় অথবা যেখানে জরায়ু অংশত দু'ভাগে বিভক্ত। অধ্যাপক ওয়েনের মতে এইরকম ঘটনায় 'সুসংবদ্ধ ক্রমবিকাশের পর্যায়টিই পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়, যা একশ্রেণীর ইঁদুরের (rodents) মধ্যে বেশি দেখা যায়। এখান থেকে সম্ভবত আমরা ভ্রূণের বিকাশপর্যায়ে একটি সাধারণ গতিরুদ্ধতা, যা একইসঙ্গে পরবর্তী সময়ে আশানুরূপ উন্নত ও সুষম কার্যকারিতার দিক থেকে যথেষ্ট বিকশিত, তার একটা উদাহরণ পাচ্ছি, কারণ এই অংশত যুগ্ম-জরায়ুর উভয় অংশই গর্ভধারণের প্রয়োজনীয় কাজ করতে সক্ষম। অন্যান্য কিছু বিরল ঘটনার ক্ষেত্রে দু'টি স্বতন্ত্র জরায়ুর প্রতিটিকে সঠিক মুখ ও পরিসর-সহ গঠিত হতে দেখা যায়। ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশকালে এ-রকম কোনও পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সাধারণত যেতে হয় না। এবং একথা বিশ্বাস করা কষ্টকর, যদিও তা একেবারে অসম্ভব নয় যে, দুটি সাধারণ, আদিম ও সূক্ষ্ম নালী নিজেরাই জানে (যদি এইভাবেই বলা যায়) কীভাবে তারা প্রত্যেকে সুনির্মিত মুখ ও পরিসর-সহ অসংখ্য মাংসপেশী, স্নায়ুতন্ত্রী, গ্রন্থি, শিরা-উপশিরায় সজ্জিত দু'টি স্বতন্ত্র জরায়ুতে পরিণত হতে পারে। এ ঘটনা ঘটতে পারে একমাত্র তখনই, যদি তারা পূর্বকালে বিকাশের ওই একই পর্যায়ক্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়ে থাকে, যেমন ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণীদের বেলায় দেখা যায়। কেউই বলতে পারেন না যে স্ত্রীলোকদের যুগ্ম-জরায়ুর মতো এ-রকম অস্বাভাবিক অথচ নিখুঁতভাবে পরিপূর্ণ একটি গঠন-কাঠামো নিছক আকস্মিকতার ফল। পুনরাবর্তনের নীতি দিয়েই বরং তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যার ফলে দীর্ঘদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও অঙ্গ আবার পুনরাবির্ভূত হয় এবং দীর্ঘকালের ব্যবধানেও ওই কাঠামোর পূর্ণ বিকাশে সেটা সহায়তা করে।

উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলি এবং অনুরূপ বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ ও বিচার-বিবেচনা করার পর অধ্যাপক কানেস্ত্রিনি অবশেষে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি আর-

একটি দৃষ্টান্তের কথাও উল্লেখ করেছেন। এটি হল ম্যালার হাড় (malar bone)[১২], যা কোনও কোনও শ্রেণীর বানর ও অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সাধারণত দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। দু'মাস বয়সের মানুষের ভ্রূণে এই হাড় এইভাবেই থাকে, এবং গতিরুদ্ধ বিকাশের ফলে এমনকী পরিণত মানুষের ক্ষেত্রেও একই অবস্থায় তা দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণির মানবজাতিগুলির (prognathous) মধ্যে। তাই অধ্যাপক কানেস্ত্রিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মানুষের কোনও আদি-পুরুষের মধ্যে এই হাড়টি নিশ্চয়ই দু'টি স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত ছিল যা পরবর্তীকালে সম্মিলিত এককে পরিণত হয়েছে। মানুষের কপালের হাড় (frontal bone) একটিমাত্র অংশ দিয়ে গঠিত, কিন্তু মনুষ্যভ্রূণে বা শিশুদের ক্ষেত্রে এবং প্রায় সমস্ত নিম্নশ্রেণির স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, কপালের এই হাড়টি দু'টি অংশ দিয়ে গঠিত। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের শরীরে এই দু'টি অংশের জোড়ালাগার চিহ্ন অনেক সময় বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় এবং এখনকার তুলনায় মানুষের আদি পূর্বপুরুষের মাথার খুলিতে এটা অনেক বেশি দেখা যায়। অধ্যাপক কানেস্ত্রিনি এই বিষয়টি বিশেষ করে লক্ষ করেছেন ড্রিফ্‌ট-এর কবরখানা থেকে পাওয়া বানরজাতীয় প্রাণীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত মানুষের করোটির হাড়ে (brachycephalic type)। এ-ক্ষেত্রেও তিনি ম্যালার হাড়ের মতো একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই উদাহরণটি বা এখানে উল্লিখিত অন্যান্য উদাহরণ থেকে বোঝা যায়—কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মানুষের আধুনিক জাতিগুলির তুলনায় আদিম জাতিগুলির সঙ্গে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের নিকট সাদৃশ্যের কারণ সম্ভবত আধুনিক জাতিগুলি ক্রমবিকাশের দীর্ঘ পর্যায়ক্রমে তাদের একেবারে প্রথম দিককার আধা-মানুষ পূর্বপুরুষদের থেকে অনেকটাই দূরে সরে এসেছে।

১২। অধ্যাপক কানেস্ত্রিনি তাঁর বইয়ের (দ্রঃ, 'Annuario della Soc, del Naturalistic in Modena', ১৮৬৭) ৮৩ পাতায় প্রমাণিত তথ্য-সহ এই বিষয়ের ওপর অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন। অধ্যাপক লারিলার্ড পরীক্ষা করে দেখেছেন বিভিন্ন প্রকার মানুষ ও কিছু বানরের দেহে দুটি ম্যালার হাড়ের গঠন, সৌষ্ঠব, এমনকী সম্পর্ক পর্যন্ত সম্পূর্ণ একইরকমের। তাছাড়া তিনি মনে করেন না যে এদের এই বিন্যাস কোনও আকস্মিক ঘটনামাত্র। এ ব্যাপারে ডঃ সারিওতি-র একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তুরিনের পত্রিকায় (দ্রঃ, Gazzetta delle cliniche, Turin, ১৮৭১)। তাতে তিনি বলেছেন, হাড়ের বিভাজন-চিহ্ন শতকরা দু' ভাগ পরিণত করোটিতে পাওয়া যেতে পারে এবং তা কখনওই অন্যান্য জাতিগুলির তুলনায় আর্যজাতির পূর্বপুরুষদের মধ্যে বেশি ছিল বলে দাবি করা যায় না। এ বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য, জি. দেলোরেন্‌জি ('The nuovi casi dianomalia dell'osso malare', Torino, ১৮৭২) এবং অধ্যাপক ই. মর্শেলি-র ('Sopra unarara anomalia dell'osso malare', Modena, ১৮৭২) লেখা। এখনও পর্যন্ত আমি যতদূর জানি, অধ্যাপক গ্রুবার সম্প্রতি হাড়ের বিভাজন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বই লিখেছেন। এ-সমস্ত উল্লেখ এই জন্য করা যে জনৈক সমালোচক উপযুক্ত কোনও ভিত্তি ছাড়াই নির্দ্বিধায় আমার বিবৃতিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

পূর্বোল্লিখিত ঘটনাটির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত মানুষের আরও অনেক অস্বাভাবিক গঠনবৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন লেখক আলোচনা করেছেন এবং সেগুলিকে পুনরাবর্তনের উদাহরণ হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এ-সমস্ত ঘটনাই অল্পবিস্তর সংশয়ের কারণ হতে পারে, কেননা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দীর্ঘ সারণীর একেবারে নীচের ধাপে পৌঁছনো পর্যন্ত এই একই গঠন-কাঠামোযুক্ত প্রাণীদের দেখা মেলে না।[১৩]

মানুষের ছেদক-দন্ত (canine teeth) চিবোনোর পক্ষে একেবারে আদর্শ। কিন্তু ওয়েন-এর মতে, তাদের প্রকৃত ছেদক-দন্তসুলভ বৈশিষ্ট্য হল 'দাঁতের যে-অংশ মাড়ি থেকে বেরিয়ে থাকে তার আকার শঙ্কুর মতো, তলদেশ সামান্য সমুন্নত; যে ভোঁতা বিন্দুতে তা শেষ হয়, তার বাইরের দিক উত্তল এবং ভিতরের দিক সমতল বা সামান্য অবতল। মেলানিয়ান জাতি, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে এই শঙ্কু-আকৃতি সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা যায়। কৃন্তক-দন্তের তুলনায় ছেদক-দন্ত অনেক গভীরে প্রোথিত এবং ধারালো।' কিন্তু মানুষের এই ছেদক-দন্ত এখন আর শত্রুনিধনে বা শিকারের প্রয়োজনে বিশেষ অস্ত্র হিসেবে কোনও সাহায্য করে না বলে সংশ্লিষ্ট কাজের বিচারে একে লুপ্তপ্রায় প্রাথমিক বা আদিম অঙ্গ বলা যেতে পারে। মনুষ্যকরোটির যে-কোনও বিশাল সংগ্রহের কোনও কোনওটিতে দেখা যায়, যেমন অধ্যাপক হ্যাকেল-ও লক্ষ করেছেন, মানুষের ক্ষেত্রে ছেদক-দন্ত বনমানুষের (anthropomorphus apes) মতোই অন্যান্য দাঁতগুলির চেয়ে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকে, তবে বনমানুষের মতো অতটা বেরিয়ে থাকে না। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে চোয়ালের দাঁতের সারির মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকে যাতে করে বিপরীত দন্তপঙ্‌ক্তির ছেদক-দন্ত ওই জায়গায় বসতে পারে। অধ্যাপক ভাগ্‌নারের উদাহরণে, এক কাফ্রির (আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্বাংশের অধিবাসী) চোয়ালের দাঁতের সারিতে এই ফাঁক যথেষ্ট বড়। আদিমকালের পরীক্ষিত করোটিগুলির মধ্যে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে ছেদক-দন্ত

১৩। ইসিডোর জিওফ্রে সেন্ট-হিলেয়ার এইসব ঘটনার একটি পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেছেন (দ্রঃ, 'হিস্‌তোয়ার দে অ্যানোম্যালি', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭)। শরীরের বিভিন্ন অংশের গতিরুদ্ধ বিকাশের বেশ কিছু ঘটনা নথিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা নিয়ে আলোচনা না করায় জনৈক সমালোচক আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে দোষারোপ করেছেন (দ্রঃ, 'জার্নাল অফ অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি', ১৮৭১, পৃষ্ঠা ৩৬৬)। আমার মতবাদ অনুযায়ী, তিনি বলেছেন, 'বিকাশের সময় শরীরের কোনও অংশের প্রত্যেকটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থা শুধু তার উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মাত্র নয়, যদিও পূর্বে এটি স্বয়ং সে উদ্দেশ্যই সাধন করেছিল।' জানার পক্ষে এটা খুব জরুরি ছিল বলে আমার মনে হয় না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, বিকাশের প্রারম্ভিক অবস্থায় শারীরিক অংশগুলিতে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া বা প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত থেকেও বৈসাদৃশ্য ঘটে না কেন? তথাপি এই ধরনের বৈসাদৃশ্য সংরক্ষিত হয় ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় যদি কোনওভাবে তা কার্যকরী হতে পারে, যেমন বিকাশের সময়সীমা কমিয়ে বা সরলীকরণের দ্বারা। আবার কেনই-বা অস্তিত্বের পূর্বাবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন অপুষ্টিজনিত ক্ষয়কারক অংশ বা অত্যধিক পুষ্টির ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশের মতো ক্ষতিকারক অস্বাভাবিকতা প্রাথমিক অবস্থায় বা পূর্ণতাপ্রাপ্তির সময়ে দেখা যায় না?

খুব বেশি সামনের দিকে এগিয়ে আছে (এখনকার করোটির তুলনায়) এবং নাউলেট (Naulette) মাড়ির ক্ষেত্রে বলা হয় যে তা একেবারে বিশালাকৃতি।

বনমানুষদের মধ্যে দেখা যায় যে শুধু পুরুষ-বনমানুষদের ছেদক-দন্তই পরিপূর্ণ-ভাবে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু স্ত্রী-গরিলাদের মধ্যে এবং আরও কম পরিমাণে স্ত্রী-ওরাংওটাংদের মধ্যে এই দাঁত অন্যান্য দাঁতের চেয়ে খানিকটা বেশি বাইরে বেরিয়ে থাকে। তাই নারীদের মধ্যে মাঝেমাঝে বেশ খানিকটা বেরিয়ে থাকা ছেদক-দাঁত দেখা যাওয়ার ব্যাপারটা সম্ভবত এই সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনও মারাত্মক বাধা হয়ে ওঠে না যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে এইসব দাঁতের (ছেদক দাঁত) অনেকখানি বড় হয়ে ওঠাটা আসলে মানুষের বানরসদৃশ পূর্বপুরুষের কাছে ফিরে যাবারই একটা নমুনামাত্র। যে ব্যক্তি অবজ্ঞার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তকে নাকচ করেন যে তাঁর দাঁতের অনেকখানি বড় হয়ে ওঠার জন্য দায়ী আমাদের অতি-পূর্বপুরুষরাই—যাঁরা এই দাঁতকে ভয়ানক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন—অবজ্ঞা প্রকাশের জন্য তিনি হয়তো নিজের অজান্তেই দাঁত খিঁচিয়ে নিজের ক্রমবিকাশের ধারাকে প্রকাশ করবেন। এই দাঁতগুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা তাঁর আর না থাকলেও অবচেনতভাবেই তিনি তাঁর দাঁত-খিঁচোনো পেশী বা 'স্নারলিং মাস্‌ল' (স্যর পি. বেল কর্তৃক নামাঙ্কিত) কুঁচকে দাঁতগুলোকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করে তোলেন, ঠিক যেভাবে কুকুররা ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত হয় আর কি।

মানুষের দেহে মাঝেমাঝে এমন কতকগুলি পেশী বিকাশলাভ করে যেগুলি কেবলমাত্র বানরজাতীয় বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেই থাকার কথা। অধ্যাপক ভ্র্যাকোভিচ চল্লিশজন পুরুষকে পরীক্ষা করে তাদের উনিশজনের মধ্যে একটি পেশী দেখতে পান যাকে তিনি চিহ্নিত ক.রেন ইশ্চিও-পিউবিক নামে। আরও তিনজনের মধ্যে এই পেশীর কিছু অস্তিত্ব থাকলেও অবশিষ্ট আঠারোজনের মধ্যে তার কোনও চিহ্ন ছিল না। বত্রিশজন স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করে কেবলমাত্র তিনজনের শরীরের উভয় পাশে এই পেশী বিকশিত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল, আরও তিনজনের মধ্যে প্রাথমিক বন্ধনীর (ligament) আকারে এর অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে এই পেশীর উপস্থিতি স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষের মধ্যে অনেক বেশি এবং নিম্নশ্রেণির কোনও আকার থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারণার সঙ্গে মেলালে এই বিষয়টিকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, কারণ নিম্নশ্রেণির বহু প্রাণীর মধ্যেই এই পেশীটির সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাদের সকলের ক্ষেত্রেই জননক্রিয়ায় পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক পেশী হিসেবে কাজ করে থাকে এটি।

মিঃ জে. উড তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রে[১৪] অত্যন্ত যথাযথভাবেই মানুষের

১৪। এই নথিপত্রগুলি অত্যন্ত মনোযোগী অধ্যয়নের দাবি রাখে, বিশেষ করে যদি কেউ জানতে আগ্রহী হন কীভাবে আমাদের মাংসপেশীগুলি বাংরবার প্রভেদ সৃষ্টি করে এবং প্রভেদ সৃষ্টি করতে গিয়ে চতুষ্পদ প্রাণীদের সঙ্গে সাদৃশ্য গড়ে তোলে। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি আমার মূল

মধ্যে প্রচুর পেশীগত অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যেগুলি নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের স্বাভাবিক পেশীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। যে পেশীগুলি আমাদের নিকটতম সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বানর জাতীয় প্রাণীদের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত, তাদের সংখ্যা এত বেশি যে আলাদা করে সেগুলির কথা উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। শক্তিশালী দৈহিক কাঠামো ও সুনির্মিত করোটি-যুক্ত একজন পুরুষের দেহে কম করে সাতটি অস্বাভাবিক পেশী লক্ষ করা গেছে, যেগুলি সাধারণভাবে বিভিন্ন শ্রেণির বনমানুষজাতীয় বানরদের মধ্যেই থাকে। যেমন, ওই লোকটির গলার দু'পাশে একটা প্রকৃত-শক্তিশালী 'লেভাটর ক্ল্যাভিকুলা' পেশী ছিল, যা প্রায় সমস্ত বানরজাতীয় প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যায়, এবং বলা হয় যে প্রতি ষাটজন মানুষের মধ্যে অন্তত একজনের শরীরে এটা থাকে। আবার দেখা যায় ওই লোকটির পায়ে কড়ে আঙুলের (fifth digit) হাড়ে (metatarsal bone) একটি বিশেষ অ্যাব্‌ডাক্টর (পিছনদিকে সরে-যাওয়া একটা পেশী) ছিল, যা অধ্যাপক হাক্সলি ও মিঃ ফ্লাওয়ার-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী উচ্চশ্রেণির ও নিম্নশ্রেণির প্রায় সব বানরের মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। এখানে আর মাত্র দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করব আমি। একটি হল অ্যাক্রোমিয়োব্যাসিলার পেশী, যা মানুষের থেকে নিম্নশ্রেণির সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে থাকে এবং এটা সম্ভবত চতুষ্পদ প্রাণীদের চলাফেরার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রতি ষাটজন মানুষের মধ্যে একজনের শরীরে এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পরেরটি হল মিঃ ব্রাড্‌লি কর্তৃক আবিষ্কৃত মানুষের দুই পায়ে অবস্থিত একটা পেশী—অ্যাবডাক্টর ওসিস মেটাটারসি কোয়ান্তি। এর আগে পর্যন্ত এই পেশীটি মানুষের শরীরে বর্তমান আছে বলে জানা যায়নি, কিন্তু জানা ছিল যে বনমানুষদের শরীরে এটা সর্বদাই থাকে। হাত ও বাহুর পেশীগুলি, যা মানুষের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, মাঝেমাঝে এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের অনুরূপ পেশীর প্রায় সমরূপ হয়ে ওঠে।[১৫] এই ধরনের সাদৃশ্য ত্রুটিমুক্ত অথবা ত্রুটিযুক্ত হতে পারে, কিন্তু ত্রুটিযুক্ত ক্ষেত্রেও এগুলি (পেশীগুলি) স্পষ্টতই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির হয়ে থাকে। পুরুষদের শরীরে যেমন নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, তেমনি মেয়েদের শরীরেও নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন

বইতে উল্লিখিত বেশ কিছু দৃষ্টি-আকর্ষণকারী বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (দ্রঃ, 'প্রস্. রয়্যাল সোস্', খণ্ড ১৪, পৃঃ ৩৭৯-৩৮৪, খণ্ড ১৫, পৃঃ ২৪১-৪২, ৫৪৪; খণ্ড ১৫, পৃঃ ৫২৪)। এখানে আমার শুধু এটুকুই বলার আছে যে ডঃ মুরি ও মিঃ সেন্ট জর্জ মাইভার্ট তাঁদের প্রবন্ধে দেখিয়েছেন সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্থানীয় প্রাণী লেমুরজাতীয় বানরদের কিছু মাংসপেশী কেমন অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনশীল। এমনকী নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মাংসপেশীর কাঠামোগত পরিবর্তনও লেমুরজাতীয় বানরদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।

১৫। অধ্যাপক ম্যাকালিস্টার তাঁর পর্যবেক্ষণগুলিকে তালিকা করে সাজিয়ে দেখেছেন যে পেশীগত অস্বাভাবিকতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অগ্রবাহুতে, তারপর যথাক্রমে মুখমণ্ডলে ও পায়ে।

জায়গা করে নেয়, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এর কারণ আমাদের অজানা। অসংখ্য পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে মিঃ উড অবশেষে এই চমৎকার মন্তব্যটি করেছেন, 'পেশীর গঠনের সাধারণ অবস্থা থেকে কোনও নির্দিষ্ট খাতে বা দিকে পরিচালিত কোনও বিচ্যুতির পিছনের অজানা কারণটিকে উন্মোচন করা সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শারীরসংস্থানবিদ্যা সংক্রান্ত যথাযথ জ্ঞান অর্জন করার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'[১৬]

মানুষের ক্ষেত্রে এই অজানা কারণটিকে চিহ্নিত করা যায় অস্তিত্বের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া বা প্রত্যাবর্তন হিসেবে।[১৭] বংশানুক্রমঘটিত কোনও সম্পর্ক না থাকলে একজন মানুষের অন্তত সাতটি পেশীর সঙ্গে কিছু বানরের পেশীর সাদৃশ্যকে কোনওভাবেই নিছক সমাপতন বলে ধরে নেওয়া অসম্ভব। অন্যদিকে, বানরসদৃশ কোনও জীবন থেকে মানুষ ক্রমবিকশিত হয়ে থাকলে তার পক্ষে এমন কোনও বৈধ যুক্তি খাড়া করা যাচ্ছে না যে কেন কিছু পেশী কয়েক হাজার বছর বিরতির পর আবার আকস্মিকভাবে ফিরে আসবে না, ঠিক যেভাবে ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের পায়ে ও কাঁধের কালো রঙের ডোরাকাটা দাগের হঠাৎই আবির্ভাব হচ্ছে কয়েকশো অথবা কয়েক হাজার প্রজন্মের বিরতির পরে।

পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার এইসব ঘটনাগুলি প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বা প্রাথমিক অঙ্গের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে তাদের অনেকগুলির সম্বন্ধেই হয়তো এখানে-সেখানে অসতর্কভাবে কিছু কথা বলা হয়ে গেছে। এইভাবে

১৬। রেভারেন্ড ডঃ হগ্‌টন মানুষের হাতে ফ্লেক্সর পলিসিস লংগাস পেশীটির একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য জানিয়ে (দ্রঃ, 'প্রস্. আর. আইরিশ অ্যাকাডেমি', ২৭ জুন, ১৮৬৪, পৃঃ ৭১৫) বলেছেন, 'এই চমৎকার উদাহরণটি থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ কখনও কখনও ম্যাকাকাসজাতীয় বানরদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হাতের বুড়ো আঙুল ও অন্যান্য আঙুলের পেশীবন্ধ (tendons) ব্যবস্থা ধারণ করে। কিন্তু আমার নিশ্চিতভাবে জানা নেই এ-রকম কোনও ঘটনা থেকে এটা মনে হতে পারে কি না যে ম্যাকাকাস মানুষকে ঊর্ধ্বমুখে ঠেলে দিচ্ছে বা মানুষ ম্যাকাকাসকে নিম্নমুখে ঠেলে দিচ্ছে, অথবা এটা প্রকৃতির সম্পূর্ণ সহজাত একটি খেয়াল মাত্র।' অবশ্যই এটা আশাব্যঞ্জক যে একজন যোগ্য শারীরতত্ত্ববিদ ও বিবর্তনবাদের একজন তীব্র বিরোধী প্রথম দু'টি উক্তির মধ্যে যে-কোনও একটির সম্ভাব্যতা আছে বলে স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক ম্যাকালিস্টারও বানরজাতীয় চতুষ্পদ প্রাণীদের ফ্লেক্সর পলিসিস লংগাস পেশীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উল্লেখযোগ্য নানান বৈসাদৃশ্যের কথা বলেছেন (দ্রঃ, 'প্রস. আর. আইরিশ অ্যাকাডেমি', ১০ম খণ্ড, ১৮৬৪, পৃঃ ১৩৮)।

১৭। এই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার আগে মিঃ উড অপর একটি প্রবন্ধে গলা, ঘাড় ও বুকের কিছু পেশীর বৈসাদৃশ্যের কথা বলেছেন (দ্রঃ, 'রিল ট্রানজাক্‌শনস', ১৮৭০, পৃঃ ৮৩)। তিনি এখানে দেখান যে এই পেশীগুলি কী ভীষণ পরিবর্তনশীল এবং নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের স্বাভাবিক পেশীগুলির সঙ্গে এরা কত বেশি নিকট সাদৃশ্যযুক্ত। অবশেষে তিনি বিষয়টির উপসংহার টানেন এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে যে, 'আমার অভিলাষ পূর্ণ হবে যদি আমি দেখাতে সমর্থ হই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু গঠন-আকৃতি মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশে বৈচিত্র্য আনার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে সুস্পষ্ট কার্যের ধারা প্রদর্শন করে এবং তাকে শারীরতত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে ডারউইনের প্রত্যাবর্তন নীতি বা বংশগতির সূত্রের প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।'

করনুয়া দিয়ে গঠিত মানুষের জরায়ু সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে এটা আসলে প্রাথমিক বা আদিম অবস্থায় স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ওই অঙ্গেরই সমতুল। মানুষের মধ্যে কিছু লুপ্ত বা আদিম অঙ্গ, যেমন উভয় লিঙ্গে অনুত্রিকাস্থি এবং পুরুষদের শরীরে দুগ্ধ-গ্রন্থি প্রায় সবসময় দেখা যায়। আবার অন্য কিছু অংশ, যেমন সুপ্রা-কন্ডিলয়েড ফোরামেন (হিউমারাস-এ অবস্থিত একটি ছিদ্র) কেবলমাত্র মাঝেমাঝে দেখা যায় এবং সেইজন্য এগুলিকে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া বা প্রত্যাবর্তনের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এইসময় প্রত্যাবর্তিত গঠন-আকৃতি এবং পুরোপুরি আদিম বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গ গুলি নিম্নশ্রেণির কোনও জৈবিক আকার থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারণাকেই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে।

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তন

নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মতো মানুষেরও বেশ কিছু গঠন-আকৃতি এত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যে একটি অংশ পরিবর্তিত হলে অন্যটিও পরিবর্তিত হতে শুরু করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা তার কোনও কারণ দর্শাতে অসমর্থ হই। আমরা বলতে পারি না যে একটি অংশ আর-একটিকে পরিচালিত করছে কিনা অথবা উভয়েই পূর্ব-বিকশিত তৃতীয় কোনও অংশ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কিনা। অধ্যাপক আই. জিওফ্রয় তাই বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে দেহের বিভিন্ন অস্বাভাবিক অংশ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। অনুরূপ গঠন-আকৃতিযুক্ত অংশগুলি একসঙ্গে পরিবর্তিত হতে বাধ্য, ঠিক যেমন আমরা দেখি দেহের দুই বিপরীত অংশে এবং উপর ও নীচের হাত-পায়ের মধ্যে। অধ্যাপক মেকেল অনেক আগেই বলেছিলেন—যখন বাহুর পেশী তাদের প্রকৃত অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তাদের অধিকাংশই পায়ের পেশীকে অনুকরণ করে এবং বিপরীতক্রমে পায়ের পেশীও হাতের পেশীকে নকল করে। দেখা ও শোনার অঙ্গ, দাঁত ও চুল, চামড়ার রঙ, চুলের রঙ ও গঠন—সবকিছুই কম-বেশি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অধ্যাপক শ্যাফহউসেনই সর্বপ্রথম পেশীর গঠন ও বলিষ্ঠ সুপ্রা-অরবিটাল রিজের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নজাতির মানুষদের মধ্যে খুব বেশি চোখে পড়ে।

যে-সমস্ত বৈসাদৃশ্যগুলিকে কম-বেশি সম্ভাব্যতাসহ পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলির শিরোনামে বিন্যস্ত করা যায়, সেগুলি ছাড়াও বেশ কিছু বৈসাদৃশ্যকে আপাতভাবে বলা যেতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত, কারণ তাদের আবির্ভাব সম্পর্কে উপযুক্ত কারণ আমাদের অজ্ঞানতার জন্য অজানাই রয়ে গেছে। তবে দেখানো যেতে পারে যে এই ধরনের বৈসাদৃশ্য, তা সে সামান্য কিছু ব্যক্তিগত পার্থক্য অথবা গঠন-আকৃতির উল্লেখযোগ্য ও আকস্মিক বিচ্যুতি-সহ পার্থক্য যা-ই হোক না কেন, সেগুলি প্রাণীদের বেড়ে ওঠার পরিবেশগত অবস্থার থেকেও অনেক বেশি নির্ভর করে প্রাণীদের নিজস্ব গঠন-আকৃতির ওপর।

প্রজননসংখ্যা বৃদ্ধির হার

অনুকূল অবস্থায় সভ্য মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গত পঁচিশ বছরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে এবং অধ্যাপক ইউলার-এর হিসেব অনুযায়ী আগামী বারো বছরে এই সংখ্যা আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠবে। যদি পঁচিশ বছরের হিসেব ধরি, তাহলে আমেরিকার বর্তমান লোকসংখ্যা (প্রায় তিন কোটি) ৬৫৭ বছরের মধ্য জল-স্থল সর্বক্ষেত্রে এত ব্যাপক পরিমাণে বেড়ে যাবে যে চারজন লোকের জন্য এক বর্গগজ জমি বরাদ্দ হবে। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রাথমিক বা মৌলিক বাধা হয়ে দাঁড়ায় জীবিকানির্বাহ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমস্যা। এই বিষয়টি অনুমান করতে আমাদের বেগ পেতে হয় না যখন দেখি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জীবন নির্বাহ করা অনেক সহজ এবং প্রচুর জমি-জায়গাও সেখানে রয়েছে। যদি এইসমস্ত জিনিস, অর্থাৎ জমি, জীবিকা-নির্বাহের উপায় ইত্যাদি, ব্রিটেনে হঠাৎই দ্বিগুণ হয়ে যেত, তাহলে আমাদের লোকসংখ্যাও দ্রুতই দ্বিগুণ হয়ে যেত। সভ্য জাতিগুলি প্রধানত সংযত বিবাহপ্রথার মধ্য দিয়ে এই প্রাথমিক বাধাকে কার্যকরী করে। এছাড়া অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণিগুলির মধ্যে খুব বেশি মাত্রায় শিশু-মৃত্যুর হারও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইরকম গুরুত্বপূর্ণ হল নানান রোগে আক্রান্ত প্রায় সকল বয়সের মানুষের একটি বড় সংখ্যার মৃত্যু, যারা খুব স্বল্প জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি করে অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে বসবাস করে। আবার মহামারী ও যুদ্ধের ফলে যে লোকসংখ্যা হ্রাস পায় তা শীঘ্রই পরিপূরণ হয়ে যায় এবং অনুকূল অবস্থায় বসবাসকারী জাতিগুলির ক্ষেত্রে এই সংখ্যা পরিপূরণকেও ছাড়িয়ে যায়। দেশত্যাগের সংখ্যা সাময়িক একটা বাধা হিসেবে কাজ করলেও সত্যিকারের গরিব লোকেদের ক্ষেত্রেও এটা খুব-একটা কার্যকরী নয়। সভ্য লোকদের তুলনায় অ-সভ্য বুনো লোকদের প্রজনন প্রকৃতপক্ষে কম—বলেছেন ম্যালথাস। কথাটার মধ্যে একটা সত্যতা থাকতেও পারে। আমরা এ-ব্যাপারে সঠিক তথ্য কিছু জানি না, যেহেতু অ-সভ্য লোকেদের জন্য আদমসুমারের কোনও ব্যবস্থা নেই। পাদ্রি বা অন্যান্য যাঁরা দীর্ঘকাল এই ধরনের লোকেদের মধ্যে কাটিয়েছেন, তাঁদের নানান বিবৃতি থেকে মনে হয় এদের পরিবারগুলি সাধারণত ছোট হয়, বড় পরিবার ক্বচিৎ দেখা যায়। এদের স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘসময় যাবৎ শিশুদের স্তন্যপান করায়—এই ঘটনা এদের মধ্যে জন্মহার কম হওয়ার একটা কারণ হতেও পারে। কিন্তু এটাও ঠিক যে অ-সভ্য লোকেরা প্রায় সবসময়ই নানান দুঃখ-দুর্দশায় ভোগার জন্য এবং সভ্য লোকেদের মতো পুষ্টিকর খাদ্য না-পাওয়ার জন্য এদের প্রজননক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পায়। আগের একটি রচনায় আমি দেখিয়েছি যে সমস্ত গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু ও পাখি এবং কৃষিকার্য দ্বারা উৎপন্ন উদ্ভিদদের প্রজননক্ষমতা প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা ওই একই শ্রেণীর প্রজাতিগুলির থেকে অনেক বেশি। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এটা কোনও বৈধ আপত্তি বলে গ্রাহ্য হতে পারে না যে পশুপাখিদের জন্য হঠাৎ অত্যধিক খাবারের যোগান বা তাদের খুব মোটা হয়ে পড়া এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত খারাপ মাটি থেকে হঠাৎই অত্যন্ত

উর্বর মাটিতে স্থানান্তরকরণ, এগুলি তাদের কম-বেশি বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী। এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে সভ্য লোকেরা, যারা একদিক থেকে খুব বেশি গৃহপালিত, তাদের প্রজননক্ষমতা বুনো বা অ-সভ্য লোকেদের তুলনায় বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। আরও মনে হয় যে সভ্য জাতিগুলির ক্রমবর্ধমান প্রজননক্ষমতা আমাদের গৃহপালিত পশুদের মতোই একটি বংশগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। তাছাড়া আমরা তো জানিই মানুষের মধ্যে যমজ সন্তান উৎপাদন একটি বংশগত প্রবণতা।

অ-সভ্য লোকেরা সভ্য লোকেদের তুলনায় কম প্রজননক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অবশ্যই দ্রুত বৃদ্ধি পেত, যদি না তাদের জনসংখ্যা বিভিন্নভাবে প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত হত। সম্প্রতি মিঃ হান্টারের অনুসন্ধানে ভারতের সাঁওতাল বা পাহাড়ি উপজাতিদের মধ্যে এই ব্যাপারে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। বসন্ত রোগের টিকা আবিষ্কার হওয়ায়, প্লেগ ইত্যাদি মহামারী প্রশমিত হওয়ায় এবং নিজেদের মধ্যে লড়াই-টড়াই কমে যাওয়ার ফলে তাদের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাচ্ছে। অবশ্য এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হত না, যদি তারা পার্শ্ববর্তী জেলা বা প্রদেশগুলোতে ভাড়া-খাটার কাজে ছড়িয়ে না পড়ত। বুনো বা অ-সভ্য লোকেরা প্রায় প্রত্যেকেই বিয়ে করে। তথাপি তাদের ক্ষেত্রে কিছু বাধা আছে, কারণ তাদের পক্ষে সাধারণত খুব কম বয়সে বিয়ে করা সম্ভব হয় না। বিবাহেচ্ছুদের প্রমাণ করতে হয় যে তারা তাদের স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ জোগাতে সমর্থ এবং সাধারণত বিয়ের কনেকে তার বাপ-মায়ের কাছ থেকে কিনে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত অর্থ তাদের উপার্জন করতে হয়। বেঁচে থাকার জন্য উপকরণ সংগ্রহের সমস্যা সভ্য জাতিগুলোর তুলনায় অ-সভ্য জাতিগুলোর জনসংখ্যাকে অনেক বেশি সরাসরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ সমস্ত উপজাতিরাই কয়েক বছর অন্তর সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। দুর্ভিক্ষের সময় অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে বাধ্য হয় তারা এবং অচিরেই তাদের শরীর ভেঙে পড়ে। দুর্ভিক্ষের সময় এবং পরে তাদের পেটের অস্বাভাবিক আকার ও কৃশকায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাপারে অনেক খবরই প্রকাশিত হয়েছে। এইসময় তারা খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদের শিশুদের একটি বড় অংশ অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে— যেমনটি আমি নিজের চোখে দেখেছি অস্ট্রেলিয়ায়। যেহেতু দুর্ভিক্ষগুলি কয়েক বছর অন্তর কিছু বিশেষ ঋতুর ওপর নির্ভরশীল, সেইজন্য তাদের জনসংখ্যাও ওইসঙ্গেই বাড়ে-কমে। খাদ্যের নিয়মিত জোগান না-থাকার দরুন তাদের জনসংখ্যা কখনওই দ্রুতহারে ও নিয়মিতভাবে বাড়তে পারে না। আবার যখন তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাধ্য হয়ে একে অপরের এলাকায় ঢুকে পড়ে, তখন তার মীমাংসা হয় লড়াইয়ের মাধ্যমে— অবশ্য প্রায় সব সময়ই তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকে। এছাড়া খাদ্য অন্বেষণের সময় তারা জলে-স্থলে নানান বিপদেরও সম্মুখীন হয় এবং কোনও কোনও দেশে জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণে তাদের প্রাণসংশয় হতেও দেখা যায়। এমনকী ভারতবর্ষের কোনও কোনও লোকালয় বাঘের আক্রমণে প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে বলেও জানা যায়।

অধ্যাপক ম্যালথাস জনসংখ্যাবৃদ্ধির এইসমস্ত বাধা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তিনি শিশুহত্যা, বিশেষ করে কন্যা-শিশুহত্যার বিষয়টির উপর যথেষ্ট জোর দেননি যা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং গর্ভপাত ঘটানোর বিষয়টি সম্পর্কেও প্রায় নিরুচ্চারই থেকে গেছেন। এই রীতিগুলি এখনও পৃথিবীর নানা অঞ্চলে টিকে আছে এবং সম্ভবত শিশুহত্যা, মিঃ স্লেন্যান্-এর তথ্যানুযায়ী, আগে আরও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এই রীতিগুলি অ-সভ্য জাতিগুলির মধ্যে প্রবর্তিত হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা বুঝতে পেরেছিল জন্ম নেওয়া সমস্ত শিশুকে প্রতিপালন করার সামর্থ্য তাদের নেই। লাম্পট্যও জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধের একটা কারণ হতে পারে, তবে এটা জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের অক্ষমতা থেকে উদ্ভূত নয়। অবশ্য এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে কোথাও কোথাও (যেমন জাপানে) জনসংখ্যা কমানোর জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এই লাম্পট্যকে প্ররোচনা দেওয়া হত।

মানুষ তার মনুষ্যত্বের উপলব্ধিতে পৌঁছনোর আগেকার সেই সুদূর যুগে যদি আমরা ফিরে যাই, তাহলে দেখতে পাব তারা সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা যতটা পরিচালিত হত যুক্তির দ্বারা ততটা নয়, এমনকী আজকের দিনের একেবারে নিম্নশ্রেণীর অ-সভ্য লোকেদের তুলনায়ও তাদের যুক্তিবুদ্ধির পরিমাণ ছিল অনেক কম। সেইসময় আমাদের আধা-মানুষ পূর্বপুরুষেরা শিশুহত্যা বা মেয়েদের বহু-স্বামী প্রথা রপ্ত করেনি, কারণ নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তি কখনও এত বিকৃত[১৮] নয় যে তারা নিয়মিত তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে কিংবা তাদের স্ত্রীর ওপর অন্যের আধিপত্য নির্দ্বিধায় মেনে নেবে। তাদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে দূরদর্শিতাসঞ্জাত কোনও বাধা ছিল না এবং নারী-পুরুষরা অল্প বয়সেই একে অপরের সঙ্গে দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত হত। তাই মানুষের পূর্বপুরুষেরা দ্রুত তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল, কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও নিশ্চয়ই সাময়িক কিংবা স্থায়ী কোনও-না-কোনও প্রাকৃতিক বাধাদানের ব্যবস্থা ছিলই, এমনকী বর্তমানের অ-সভ্য জাতিগুলির তুলনায়ও তাদের ক্ষেত্রে এই বাধা আরও বেশি ছিল। অবশ্য অধিকাংশ জীবজন্তুর ক্ষেত্রে এইসমস্ত

১৮। 'স্পেকটেটর' পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় (১২, ১৮৭১, পৃঃ ৩২০) জনৈক লেখক মন্তব্য করেছেন—'মিঃ ডারউইন মানুষের বিকাশের অধোগমনের একটি নতুন মতবাদ পুনরুত্থাপিত করতে বাধ্য হয়েছেন। উচ্চশ্রেণির জন্তুদের সহজাত প্রবৃত্তি যে মানুষের বন্য জাতিগুলির আচার-আচরণের তুলনায় অনেক উন্নত মানের, তা দেখিয়েছেন তিনি। এবং সেই কারণেই প্রচলিত গোঁড়া ধ্যানধারণা অনুযায়ী এই তথ্য পুনরুত্থাপিত করতে নিজেকে বাধ্য করেছেন তিনি, যদিও সেই ধ্যানধারণা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন। মানুষের জ্ঞানার্জনের ব্যাপারটি সাময়িক অথচ দীর্ঘকাল ধরে কার্যকরী নৈতিক অধঃপতনের কারণ ঘটেছিল—এ সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক অনুমানসিদ্ধ তত্ত্ব তিনি পুনরুত্থাপিত করেছেন এবং বন্য জাতিগুলির খারাপ রীতিনীতিসমূহ, বিশেষত তাদের বিবাহপ্রথাই যে এর মূলস্বরূপ, তা দেখিয়েছেন। মানুষের নৈতিক অধঃপতনের ইতিবৃত্তধারা তার সর্বোচ্চ সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা অর্জিত নিষিদ্ধ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে এর বাইরে আর কিছু করতে পারে কি?

বাধার প্রকৃতির ব্যাপারে আমরা কতটুকুই বা জানি! মানুষের সম্বন্ধেও তার থেকে বেশি কিছু আমাদের জানা নেই। ঘোড়া ও গবাদি পশুদের প্রজননক্ষমতা বেশ কম, কিন্তু যখন তাদের দক্ষিণ আমেরিকার খোলামেলা পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হল, দেখা গেল ব্যাপক হারে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের পরিচিত যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে কম সন্তান-উৎপাদক হাতিরা এখন যে-হারে প্রসব করছে যদি সেইভাবেই করে যায়, তাহলে কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী হাতিতে ভরে যাবে। বানরদের প্রতিটি প্রজাতির ক্ষেত্রে সংখ্যাবৃদ্ধি অবশ্যই কিছু উপায় দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, তা বলে অধ্যাপক ব্রেহ্‌ম নির্দেশিত শুধুমাত্র শিকারি জন্তুদের আক্রমণের দ্বারা নয়। এটা অচিন্ত্যনীয় যে আমেরিকার বন্য ঘোড়া ও গবাদি পশুর বংশবৃদ্ধি করার প্রকৃত ক্ষমতা প্রথমদিকে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বেশি ছিল এবং প্রতিটি অঞ্চল তাদের বংশবৃদ্ধির দরুন ভরে যাওয়ার পরই সেই ক্ষমতা সীমিত হয়ে গেল। সন্দেহ নেই যে এক্ষেত্রে বা অন্যান্য বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধা দেখা দেয় এবং এই বাধাগুলির প্রকার ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সম্ভবত প্রতিকূল ঋতু ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল পর্যায়ক্রমিক খাদ্যাভাবই এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এইসব কারণেই হয়তো মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের সংখ্যাও তেমন বাড়তে পারেনি।

প্রাকৃতিক নির্বাচন

এখানে আমরা দেখলাম শারীরিক ও মানসিক গঠনে মানুষ বিভিন্ন হয় এবং এই বৈসাদৃশ্য ঘটে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে একই স্বাভাবিক কারণে ও একই স্বাভাবিক নিয়ম মেনে, ঠিক যেমনটি দেখা যায় নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের ক্ষেত্রে। পৃথিবীর নানান প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে মানুষ এবং অবিরাম ছড়িয়ে পড়ার সময় বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে সে। একই গোলার্ধের একদিকে টিয়েরা দেল ফুয়েগো, উত্তমাশা অন্তরীপ ও তাসমানিয়া, এবং অন্য গোলার্ধে উত্তরমেরু অঞ্চলের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই নানান প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং নিজেদের বর্তমান বাসভূমিতে পৌঁছনোর আগে তারা নিশ্চয়ই বহুবার তাদের শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অন্যান্য জীবজন্তুর মতো মানুষের আদি পূর্বপুরুষেরাও নিশ্চয়ই যে-হারে সংখ্যাবৃদ্ধি করত তার তুলনায় তাদের জীবনধারণের উপকরণ মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে প্রায়শই অস্তিত্বরক্ষার লড়াইতে নামতে হত তাদের এবং সক্রিয় হয়ে উঠত প্রাকৃতিক নির্বাচনের অমোঘ নিয়ম। এইভাবে সমস্ত রকমের সুবিধাজনক পরিবর্তনগুলি ঘটনাক্রমে বা নিয়মিতভাবে রক্ষা পেয়েছে এবং যেগুলি ক্ষতিকারক সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। আমি দৈহিক গঠনের এমন কোনও উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতির কথা বলছি না যা শুধুমাত্র দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেই ঘটে থাকে, বলছি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পার্থক্যের কথাই। যেমন, আমরা জানি আমাদের হাত ও পায়ের পেশী যা আমাদের

চলতে-ফিরতে সাহায্য করে, তা নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের[১৯] মতোই নিরন্তর পরিবর্তনশীল। সেক্ষেত্রে কোনও অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের পূর্বপুরুষেরা, বিশেষত যে-অঞ্চলের পরিবেশে কিছু প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেই চলেছে, যদি দু'টি সমান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ত যার অর্ধাংশের অন্তর্ভুক্ত হত সেইসব মানুষেরা যারা তাদের জীবিকা নির্বাহ বা আত্মরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সবচেয়ে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারত, তাহলে দেখা যেত যে কম মানসিক উৎকর্ষসম্পন্ন অন্য অর্ধাংশের তুলনায় নিজেদের অনেক বেশি সংখ্যায় বাঁচিয়ে রাখতে এবং অনেক বেশি সংখ্যায় বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হত তারা।

পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার সময় থেকে শুরু করে যে-সব কঠিন বা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে এখন টিকে রয়েছে মানুষ, তা থেকে বলা যায় যে সে-ই ইচ্ছে জীবজগতের সবচেয়ে প্রবল প্রাণী। অন্য যে-কোনও উন্নত প্রাণীর চেয়ে অনেক ব্যাপকভাবে সে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীময় এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণী তার কাছে নতিস্বীকার করেছে। স্পষ্টতই সে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার শারীরিক কাঠামো, উন্নত বুদ্ধিমত্তা এবং সামাজিক অভ্যাসের মাধ্যমে, যা তাকে তার সঙ্গীসাথীদের সাহায্য ও রক্ষা করতে প্রণোদিত করে থাকে। এইসমস্ত বৈশিষ্ট্যের সুগভীর তাৎপর্য প্রমাণিত হয়েছে জীবনযুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলের মধ্যেই। আবার তার বুদ্ধিমত্তার শক্তি দিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে স্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত কথা বলার ভাষা, যার ওপরেই তার এই চমকপ্রদ অগ্রগতি মূলত নির্ভরশীল। মিঃ চনসি রাইট বলেছেন, 'কথা বলার জন্য ভাষাকে রপ্ত করার প্রক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এমনকী এ-ব্যাপারে খুব সামান্য পারদর্শী হয়ে ওঠার জন্যও যে পরিমাণ মস্তিষ্ক-খরচ করতে হয়, তা অন্য যে-কোনও ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় মস্তিষ্ক-খরচের তুলনায় অনেক বেশি।' বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, পশুধরার ফাঁদ ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে সে এবং সেগুলিকে ব্যবহার করতেও শিখেছে। এ-সবের সাহায্যে সে আত্মরক্ষা করে, জীবজন্তু ধরে বা শিকার করে এবং অন্যভাবে খাদ্য-সংগ্রহ করে। ভেলা বা ডোঙা তৈরি করেছে মাছ ধরা বা পার্শ্ববর্তী উর্বর দ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য। আগুন জ্বালানোর কৌশল আবিষ্কার করেছে, যার সাহায্যে কঠিন শিকড়বাকড়কে খাওয়ার উপযুক্ত এবং বিষাক্ত ফলমূলকে ত্রুটিমুক্ত করে তোলা যায়। সুপ্রাচীনকাল থেকে বিচার করলে দেখা যায়, একমাত্র ভাষা আবিষ্কার বাদে এই আগুন জ্বালানোর কৌশল আবিষ্কারই মানুষকৃত সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এইসমস্ত আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষ কঠিনতম

১৯। মিঃ মুরি ও মিঃ মাইভার্ট তাঁদের 'অ্যানাটমি অফ দ্য লেমুরওডিয়া' (দ্রঃ 'ট্রানজাকট. জুলজিক্যাল সোসাইটি', ৭ম খণ্ড, ১৮৬৯, পৃঃ ৯৬-৯৮) প্রবন্ধে বলেছেন, 'শরীরে কিছু কিছু মাংসপেশীর উপস্থিতি এতই অনিয়মিত যে তারা উপরোক্ত শ্রেণির কোনও-একটিতে ভালভাবে পড়ে না।' এই মাংসপেশীগুলি এমনকী একই শরীরের দুই বিপরীত পাশে থেকেও ভিন্নতা প্রকাশ করে।

পরিবেশ বা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে এবং এই আবিষ্কারগুলো নিঃসন্দেহেই তার পর্যবেক্ষণশক্তি, স্মৃতিশক্তি, কৌতূহলস্পৃহা, কল্পনাপ্রবণতা ও যুক্তিনির্ভর কাজকর্মের ক্রমোন্নতিরই প্রত্যক্ষ ফল। আর তাই আমি বুঝে উঠতে পারি না কীভাবে মিঃ ওয়ালেস[২০] মন্তব্য করেন যে, 'প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা মানুষের পূর্বপুরুষদের মস্তিষ্ক বানরদের তুলনায় সামান্যই উন্নত হয়েছিল।'

মানুষের মননগত ক্ষমতা ও সামাজিক অভ্যাসগুলি তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার দৈহিক গঠন-আকৃতির গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। সেই কারণে এই বিষয়টি নিয়েই এই পরিচ্ছেদের বাকি অংশটুকুতে আলোচনা করছি আমরা এবং মননগত ও সামাজিক বা নৈতিক বিষয়ের উন্নতি সংক্রান্ত আলোচনা রাখা হয়েছে অন্য একটি পরিচ্ছেদে।

একটি হাতুড়িকে ঠিকঠাক চালানোও যে খুব সহজ নয়, তা ছুতোর মিস্ত্রির কাজ শিখতে যাওয়া যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়। একজন ফুজিয়ানের মতো অব্যর্থ নিশানায় পাথর ছুঁড়ে নিজেকে রক্ষা করা বা পাখি শিকার করা আসলে হাত, বাহু ও কাঁধের পেশীগুলির আন্তঃসম্পর্কিত কাজের চূড়ান্ত নৈপুণ্যেরই ফল এবং সেইসঙ্গেই একটি চমৎকার শিল্পগুণও বটে। একটি পাথর বা বর্শা ছোঁড়ার সময় এবং অন্যান্য কাজের সময় একজন মানুষকে দৃঢ় পায়ে দাঁড়াতে হয় এবং সেখানেও একই সময়ে যুগপৎ অসংখ্য পেশীর পূর্ণ ব্যবহার দেখা যায়। স্থূল যন্ত্র বানানোর জন্য পাথর ভেঙে একটি ছোট্ট টুকরো বের করা অথবা হাড় দিয়ে কোনও ধারালো বর্শা বা বঁড়শি তৈরি করার জন্যও অত্যন্ত নিখুঁত কারিগরি জ্ঞানের দরকার হয়। মিঃ স্কুলক্র্যাফ্‌ট[২১]-এর মতো একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে পাথরের টুকরো দিয়ে বানানো ছুরি, বল্লম বা তিরের ফলা তৈরি করার জন্য প্রয়োজন হয় 'অসাধারণ দক্ষতা ও সুদীর্ঘ অনুশীলন'। আদিম মানুষের মধ্যে যে শ্রম-বিভাজন ছিল, তা এই কথার সত্যতাকেই প্রমাণ

২০। যাঁরা 'অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিভিউ'তে প্রকাশিত মিঃ ওয়ালেসের বিখ্যাত গবেষণাপত্র 'দ্য অরিজিন অফ হিউম্যান রেসেস ডিডিউস্‌ড ফ্রম দ্য থিওরি অফ ন্যাচরাল সিলেকশন' পড়েছেন, তাঁরা সম্ভবত আমার মূল বইতে তাঁর মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করবেন। আমি এখানে মিঃ ওয়ালেসের সেই কাজটির প্রসঙ্গে স্যর জে. লুবক-এর অত্যন্ত সঠিক মন্তব্যটি (দ্রঃ, 'প্রিহিস্টোরিক টাইমস', পৃঃ ৪৭৯) উল্লেখ না করে পারলাম না—'কোনওরকম একদেশদর্শিতার মধ্যে না গিয়ে মিঃ ডারউইন এটিকে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাটিকে) ব্যক্ত করেছেন। যদিও সকলেরই জানা যে তিনি একা-একাই এই ধারণাকে আয়ত্ত করেছেন ও প্রকাশ করেছেন, তবু সবসময় তিনি একই যুক্তি বা ব্যাখ্যা রাখেননি।'

২১। 'ডাবলিন কোয়ার্টারলি জার্নাল অফ মেডিক্যাল সায়েন্স'-এ প্রকাশিত মিঃ লসন জেইত-এর 'ল্য অফ ন্যাচরাল সিলেকশন' থেকে উদ্ধৃত। ওই একই রিপোর্ট থেকে ডঃ কেলার-কে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

করে। প্রত্যেক মানুষ তার প্রয়োজনমতো পাথরের অস্ত্রশস্ত্র বা মৃৎপাত্র তৈরি করে নিত না, বরং নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি এইসমস্ত কাজে ব্যাপৃত থাকত এবং তার বিনিময়ে অবশ্যই তারা শিকারের ভাগ পেত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, ঘষা পাথরের অংশ থেকে মসৃণ যন্ত্র তৈরি করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের দীর্ঘ সময় লেগেছিল। নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, নিখুঁত নিশানায় পাথর ছোঁড়ার জন্য অথবা পাথর দিয়ে নানান স্থূল যন্ত্র তৈরি করার জন্য মানুষ-সদৃশ প্রাণীরা হাত ও বাহুর এক দারুণ উৎকর্ষতায় পৌঁছেছিল এবং যথেষ্ট অনুশীলন করলে যান্ত্রিক দক্ষতার ব্যাপারে তারা অবশ্যই সুসভ্য মানুষের মতো প্রায় সবকিছুই তৈরি করতে পারত। এই প্রসঙ্গে হাতের গঠনের সঙ্গে স্বরযন্ত্রের তুলনা করা যেতে পারে। আমরা জানি, বানরদের স্বরযন্ত্র চিৎকার করে নানান সংকেত জানানোর কাজে লাগে, বা একটি প্রজাতির ক্ষেত্রে সুশ্রাব্য স্বরপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। মানুষের স্বরযন্ত্রও প্রায় একইরকম, কিন্তু বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবহারের ফলে তা স্পষ্ট করে কথা বলার কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মানুষের সঙ্গে নিকট-সাদৃশ্য আছে এমন চার হাত-পা যুক্ত প্রাণীদের বা আমাদের পূর্বপুরুষদের সবচেয়ে চমৎকার প্রতিনিধিদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব ওইসমস্ত প্রাণীদের হাত আমাদের হাতের মতো একই সাধারণ নিয়মে গঠিত, কিন্তু বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের হাত ততটা উপযোগী হয়ে ওঠেনি। নিজেদের হাতকে তারা কুকুরের সামনের পায়ের মতো একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার কাজে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারে না। যেমন, শিম্পাঞ্জি ও ওরাংওটাং-এর মতো বানররা হাঁটার সময় হাতের তালুর বহিরাংশ বা আঙুলের গাঁট ব্যবহার করে থাকে। তাদের হাত গাছে ওঠার পক্ষেই সবথেকে উপযোগী। বানরেরা যখন গাছের ডাল বা ঝুরি আঁকড়ে ধরে, তখন ঠিক আমাদের মতোই তাদের বুড়ো আঙুল থাকে একপাশে আর অন্যপাশে থাকে বাকি চারটি আঙুল ও হাতের তালু। এইভাবে তারা অনেক বড় বড় জিনিসপত্রও মুখের কাছে তুলতে পারে, যেমন বোতলের গলা ধরে মুখের মধ্যে জল ঢেলে দিতে পারে। বেবুনরা হাত দিয়ে পাথর সরাতে সক্ষম এবং মাটি আঁকড়ে গাছের শিকড় টেনে তুলতে পারে। এরা আবার বুড়ো আঙুলকে অন্যান্য আঙুলের বিপরীত দিকে রেখে বাদাম, পোকামাকড় ও নানারকম ছোট জিনিস ধরতে পারে এবং এইভাবে তারা পাখির বাসা থেকে ডিম ও বাচ্চা তুলে আনে। আমেরিকান বানররা জংলি কমলালেবুকে গাছের ডালে জোরে জোরে ঠুকতে থাকে যতক্ষণ না ফলটার খোসায় চিড় ধরে, তারপর দু-হাতের আঙুল দিয়ে খোসাটা ছাড়িয়ে ফেলে। শক্ত খোসাওয়ালা ফলগুলোকে পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে খোসাটা ভেঙে ফেলে ফলটা বার করে নেয়। কিছু কিছু বানর শামুকজাতীয় প্রাণীর খোলা দুই বুড়ো আঙুলের সাহায্যে ছাড়ায়। তাছাড়া আঙুল দিয়ে এরা শরীরের কোনও অংশে ফুটে যাওয়া কাঁটা-জাতীয় কিছু টেনে তোলে এবং একে অপরের উকুন ইত্যাদি বেছে দেয়। এরা পাথর গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে অথবা শত্রুকে লক্ষ্য করে

তা ছুঁড়ে দিতেও পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-কথা বলতেই হয় যে এইসমস্ত কাজ এরা খুব-একটা পরিপাটিভাবে করতে পারে না, এবং আমি নিজের চোখে দেখেছি যে নিখুঁত লক্ষ্যে পাথর ছুঁড়তে এরা নিতান্তই অক্ষম।

যেহেতু বানররা 'কোনও-কিছুকে ঠিকমতো আঁকড়ে ধরতে পারে না', অতএব 'আঁকড়ে ধরার জন্য তাদের কোনও নিম্নতর মানের অঙ্গ' থাকলে সেটা তাদের বর্তমান হাতের মতো একই কাজ করতে পারত—এই কথাটা আমরা মোটেই সত্য বলে মনে হয় না। বরং নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, আরও যথাযথভাবে গঠিত হাত তাদের পক্ষে যথেষ্টই সুবিধাজনক হতে পারত, অবশ্য তার ফলে তাদের গাছে চড়ার ক্ষমতা কমে গেলে আলাদা কথা। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, মানুষের মতো এমন নিখুঁত গড়নের হাত গাছে-চড়ার পক্ষে খুব-একটা সুবিধাজনক নয়, কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ বৃক্ষবাসী বানরদের ক্ষেত্রে—যেমন আমেরিকার এটেল্‌স্, আফ্রিকার কলোবাস এবং এশিয়ার হাইলোবেত্‌স্—দেখা যায় যে হয় তাদের বুড়ো আঙুল নেই অথবা আঙুলগুলো এমনভাবে জুড়ে থাকে যে হাত-পাগুলো স্রেফ ঝুলে থাকার আঁকশি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।[২২]

জীবিকানির্বাহের ধারা পরিবর্তনের ফলে বা পারস্পরিক অবস্থার পরিবর্তনের দরুন উচ্চশ্রেণির বনমানুষদের পূর্বপুরুষেরা যেদিন গাছ থেকে নেমে এল, সেদিন থেকেই তাদের বিকাশের স্বাভাবিক ধারাও বদলাতে শুরু করল এবং তার ফলে তারা আরও নির্দিষ্টভাবে চতুষ্পদ বা দ্বিপদ হয়ে উঠল। বেবুনরা সাধারণত পাথুরে ও পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করে, খুব প্রয়োজন না হলে উঁচু গাছে ওঠে না এবং তাদের চলনভঙ্গি প্রায় কুকুরের মতোই। একমাত্র মানুষই দ্বিপদ জীবে উন্নীত হয়েছে এবং আমরা এখন অন্তত খানিকটা বুঝতে পারছি কীভাবে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছিল, যা তার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। হাতের ব্যবহার না শিখলে মানুষ আজকের পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারত না, কারণ মানুষের হাত তার ইচ্ছার সঙ্গে তাল রেখে কাজ করার ব্যাপারে দারুণ উপযোগী হয়ে উঠেছে। স্যর সি. বেল জোর দিয়ে বলেছেন যে, (মানুষের) 'হাত তাকে সমস্ত রকম রসদ জোগান দেয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হাতের নিবিড় সংযোগ মানুষকে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য অর্জনের ক্ষমতা।' কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মানুষের হাত ও বাহু শুধুমাত্র একস্থান থেকে অন্যস্থানে

২২। হাইলোবেত্‌স সসিন্‌ডোকটিলাস বানরদের নাম থেকে বোঝা যায় এদের পায়ের দু'টি আঙুল জুড়ে থাকে এবং লার ও লোসিস্‌কাস বানরদের পায়ের আঙুলের এটা লক্ষ করা যায়—এই বিষয়টি আমাকে জানান মিঃ বিথ-এর তথ্য অনুযায়ী এইচ. এজিলিস। কলোবাস বানররা প্রধানত বৃক্ষবাসী ও অস্বাভাবিক রকমের কর্মঠ (দ্রঃ, ব্রেহ্‌ম্, 'থিয়েরলেবেন', বি. ১ম, পৃঃ ৫০), কিন্তু তারা একই শ্রেণির অন্তর্গত অন্য কোনও প্রজাতির তুলনায় গাছে চড়তে বেশি পারদর্শী কি না আমার জানা নেই। তাছাড়া দেখা গেছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় বৃক্ষবাসী প্রাণী শ্লথের (দক্ষিণ আমেরিকার এক ধরনের বৃক্ষবাসী জন্তু) পায়ের পাতা বিস্ময়করভাবে আঁকশি-সদৃশ।

যাওয়া-আসার জন্য এবং শরীরের পুরো ভার বহন করার জন্য ব্যবহৃত হত অথবা যতদিন পর্যন্ত এগুলো গাছে চড়ার পক্ষে দারুণ উপযোগী ছিল, ততদিন পর্যন্ত মানুষের হাত ও বাহু অস্ত্র বানানো অথবা নিখুঁত লক্ষ্যে পাথর ও বর্শা ছোঁড়ার মতো কাজ করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। গাছে-চড়ার মতো রুক্ষ কাজকর্মের ফলে হাত ও বাহুর স্পর্শানুভূতিও ভোঁতা হয়ে যায়, আর এই অনুভূতির ওপরেই ওগুলোর চমৎকার ব্যবহার বহুলাংশে নির্ভর করে। এইসমস্ত কারণসমূহ নিঃসন্দেহে মানুষকে দ্বিপদ হতে বাড়তি সাহায্য করেছে। কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো করার জন্য বাহু তথা শরীরের ঊর্ধ্বাংশ মুক্ত থাকা একান্তই অপরিহার্য, আর তাই মানুষকে দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখতে হয়েছে। এই বিশাল সুবিধেটা অর্জন করার জন্য তার পায়ের পাতা চ্যাটালো হয়ে উঠল এবং পায়ের বুড়ো আঙুলও দারুণ রকম বদলে গেল। কিন্তু এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তার গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার বিশেষ ক্ষমতাটি প্রায় পুরোপুরিভবে লোপ পেল। জীবজগতের সর্বত্র শারীরবৃত্তীয় শ্রমবিভাজনের যে-নীতি চোখে পড়ে, এই ঘটনা তার সঙ্গে পুরোপুরি সাযুজ্যপূর্ণ। নীতিটি হল—আঁকড়ে ধরার কাজে হাত যতই পোক্ত হয়ে ওঠে, শরীরের ভার বহন করা এবং এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার কাজে পা-ও ততই পরিশীলিত হয়ে ওঠে। অবশ্য কিছু কিছু বন্য মানুষের মধ্যে দেখা যায় তাদের পায়ের আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা এখনও পুরোপুরিভাবে লোপ পায়নি। তাদের গাছে ওঠার ধরন ও আরও অনেক কাজের মধ্যে এটা লক্ষ করা যায়।[২৩]

দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এবং হাত ও বাহু মুক্ত হয়ে যাওয়া যদি মানুষের পক্ষে সুবিধাজনক হয় (এবং জীবনযুদ্ধে তার দারুণ সাফল্যের দিকে তাকালে এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহই থাকে না), তাহলে আমি এমন কোনও কার্যকারণ দেখতে পাই না যে কেন সেকালে মানুষের পূর্বপুরুষদের পক্ষেও ক্রমশ সোজা হয়ে দাঁড়ানো বা দ্বিপদী হয়ে ওঠাটা সুবিধাজনক হবে না। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর জন্যই তারা আরও ভালভাবে সমর্থ হয়েছে পাথর বা লাঠি দিয়ে আত্মরক্ষা করতে, শিকারের জন্তু-জানোয়ারদের আক্রমণ করতে এবং খাদ্য সংগ্রহ করতে। এবং সেই কারণেই সবচেয়ে উন্নত প্রাণীরাই পরবর্তীকালে সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছে এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় টিকে থেকেছে। গরিলা ও তাদের সমগোত্রীয় কিছু প্রাণী যদি

২৩। মানুষ কীভাবে দ্বিপদে উন্নীত হল—সে বিষয়ে অধ্যাপক হ্যাকেল-এর একটি চমৎকার আলোচনা রয়েছে (দ্রঃ, 'Naturliche Scopfungsgeschichte', ১৮৬৮, পৃঃ ৫০৭)। ডঃ বাস্‌নার মানুষের মধ্যে এখনও বর্তমান এ-রকম অঙ্গ হিসেবে পায়ের ব্যবহারের কয়েকটি চমৎকার ঘটনার কথা বলেছেন (দ্রঃ, 'Conferences sur la Theorie Darwinienne',১৮৬৯, পৃঃ ১৩৫)। উচ্চশ্রেণির বানরদের উন্নতির ধারা সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেছেন যা আমি প্রসঙ্গক্রমে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলেছি। শেষোক্ত এই বিষয়টির জন্য দ্রষ্টব্য, অধ্যাপক ওয়েনের 'অ্যানাটমি অফ ভার্টিব্রেটস', ৩য় খন্ড, পৃঃ ৭১।

পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, তাহলে খুব জোরগলায় ও আপাত-সত্যতার সঙ্গে বলা যেত যে, কোনও প্রাণী তার চতুষ্পদ অবস্থা থেকে ক্রমশ দ্বিপদে রূপান্তরিত হতে পারে না, কারণ সেক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের কোনও-একটি মধ্যবর্তী অবস্থায় সেই প্রজাতির সকল প্রাণীই প্রগতির পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু আমরা জানি (এবং এটা সত্যিই ভাববার মতো বিষয়) যে, বনমানুষেরা প্রকৃতপক্ষে এখন একটি মধ্যবর্তী অবস্থাতেই রয়েছে এবং তারা মোটের ওপর জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে বেশ ভালভাবে খাপ খাইয়েও নিয়েছে। যেমন, গরিলারা সামনের দিকে এঁকেবেঁকে টলতে টলতে এগোয়, কিন্তু বেশির ভাগ সময় অগ্রসর হয় তাদের ঝুলে-থাকা হাতের সাহায্যে। আবার দীর্ঘবাহু বানররা মাঝেমাঝে তাদের হাতদুটোকে ক্রাচের মতো ব্যবহার করে, দু'হাতের মাঝখানে শরীরটাকে এদিক-ওদিক দুলিয়ে অগ্রসর হয়। কয়েক ধরনের হাইলোবেত্‌স্‌ বানর আছে যাদেরকে না শেখালেও তারা বেশ জোরে হাঁটতে বা দৌড়তে পারে। অবশ্য তাদের এই হাঁটা বা দৌড়নো খানিকটা এলোমেলো, মানুষের মতো দৃঢ়ভাবে পা ফেলার ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীতে বিদ্যমান বানররা চতুষ্পদ ও দ্বিপদের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় অবস্থান করছে, এবং কুসংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিচার করলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বনমানুষ জাতীয় বানরেরা আকৃতির দিক থেকে চতুষ্পদীর তুলনায় দ্বিপদীর (মানুষের) সঙ্গেই অনেক বেশি সাদৃশ্যযুক্ত।

মানুষের পূর্বপুরুষেরা যত বেশি সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখল, তাদের হাত ও বাহু যত বেশি মুঠো করে ধরা ও অন্যান্য কাজের উপযোগী হয়ে উঠতে লাগল, তাদের পা ও পায়ের পাতা যত বেশি করে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ও হেঁটে চলার উপযুক্ত হয়ে উঠল, ততই তাদের শারীরিক গঠনের আরও অসংখ্য পরিবর্তন জরুরি হয়ে উঠল। কোমরের হাড়, বস্তিদেশ (pelvis) আরও চওড়া হতে লাগল, মেরুদণ্ড অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেল এবং মাথার অবস্থানও পরিবর্তিত হল। এই সমস্ত পরিবর্তনগুলোই মূর্ত হয়ে উঠল মানুষের শরীরে। অধ্যাপক শ্যাফহউসেন লিখেছেন, 'মানব-করোটির শক্তিশালী ম্যাস্টয়েড প্রক্রিয়া (কানের ঠিক পিছনে মধ্যকর্ণের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য স্নায়ুকোষপূর্ণ ছোট ঢিবি) তার সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফলস্বরূপই সৃষ্টি হয়েছে।' এই প্রক্রিয়াটি ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদির মধ্যে অনুপস্থিত, আর গরিলাদের মধ্যে এর দেখা মিললেও মানুষের তুলনায় তা বেশ ছোটই। মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও কিছু গঠনগত পরিবর্তনের কথাও এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এই পরিবর্তনগুলো কতটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল আর কতটা কতকগুলো অঙ্গের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের অথবা একটা অঙ্গের ওপর আর-একটা অঙ্গের ক্রিয়ার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ফলাফল—সেটা বলা মুশকিল। পরিবর্তনের এইসব উপায়গুলি প্রায়শই একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে। তাই যখন হাড়ের অস্ত্যাংশ (crest) ও তার সঙ্গে যুক্ত পেশীসমূহ নিয়মিত ব্যবহারের ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন বোঝা যায় যে নির্দিষ্ট কিছু কাজ

অভ্যাসগতভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং সেগুলি অবশ্যই সুবিধাজনক ছিল। তাই যে-সমস্ত প্রাণীরা এইসব কাজ সবচেয়ে ভালভাবে সম্পাদন করতে পেরেছিল, তারা অনেক বেশি সংখ্যায় টিকে থাকতে পেরেছে।

হাত ও বাহুর স্বাধীন ব্যবহার, যা মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আংশিক কারণ ও আংশিক ফলাফল, তা দৈহিক গঠনের অন্যান্য রূপান্তরগুলিকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। আগেই বলা হয়েছে যে মানুষের আদি পূর্বজদের মধ্যে পুরুষদের সম্ভবত বড় বড় কেনাইন বা ছেদক দাঁত ছিল। কিন্তু শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তাদের মধ্যে পাথর, লাঠি ও অন্যান্য হাতিয়ার ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে ওঠার ফলে তাদের চোয়াল ও দাঁতের ব্যবহার ক্রমশ কমে এল। এক্ষেত্রে দাঁতের সঙ্গে সঙ্গে চোয়ালের আকারও হ্রাস পেল। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা লক্ষ করলে এ-কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা এর সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমরা দেখতে পাব যে রোমন্থক গ্রন্থিগুলি প্রাণীদের (যেমন গরু) মধ্যে পুরুষদের কেনাইন দাঁতের ক্রমহ্রাসপ্রাপ্তি বা সম্পূর্ণ অবলুপ্তি আপাতভাবে তাদের শিঙের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং ঘোড়াদের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে ইনসাইসর বা কৃন্তক-দাঁত ও ক্ষুরের সাহায্যে লড়াই করার অভ্যাসের সঙ্গে তাল মিলিয়েই তাদের কেনাইন দাঁত হ্রাসপ্রাপ্ত বা অবলুপ্ত হয়েছে।

অধ্যাপক রুতিমেয়ার এবং অন্যান্য আরও অনেকে জোর দিয়ে বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-বনমানুষদের চোয়ালের পেশী যখন অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় পৌঁছয়, তখন সেটা করোটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলেই মানুষের সঙ্গে নানান বিষয়ে তাদের অনেক পার্থক্য দেখা দেয়, আর এই প্রজাতির প্রাণীদের 'যথার্থই ভয়ানক মুখমণ্ডল' গড়ে তোলে। মানুষের পূর্বপুরুষদের চোয়াল ও দাঁত আকারে ছোট হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিণত করোটি ক্রমশই আজকের মানুষের করোটির মতো হয়ে উঠল। পরে আমরা এ-ও দেখব যে পুরুষমানুষদের কেনাইন দাতের ক্রমহ্রাসপ্রাপ্তি বংশগতির মাধ্যমে নারীদের দাঁতকেও প্রভাবিত করেছে।

বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের আয়তনও বেড়ে গেল। এ-কথা নিঃসংশয়েই বলা চলে যে গরিলা বা ওরাংওটাং-এর শরীরে মস্তিষ্কের যা আয়তন, তার তুলনায় মানুষের শরীরে মস্তিষ্ক অনুপাতে অনেক বড়, এবং তার উন্নততর মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে এই ব্যাপারটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। পোকামাকড়দের মধ্যেও প্রায় একইরকম ব্যাপার দেখা যায়। পিঁপড়েদের সেরিব্রাল গ্যাংলিয়া (মস্তিষ্কের স্নায়ু) অস্বাভাবিক রকমের বড় হয় এবং সমস্ত হাইমেনোপ্টেরার (পিঁপড়ে, বোলতা, মৌমাছি ইত্যাদি) মধ্যেই এই গ্যাংলিয়া অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের চেয়ে (যেমন গুবরে পোকা) অনেক গুণ বড় হয়ে থাকে।[২৪] অন্যদিকে,

২৪। আমার পুত্র মিঃ এফ. ডারউইন আমাকে ফরমিকা রুফা-র সেরিব্রাল গ্যাংলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখিয়েছে।

দু'টি জন্তুর কিংবা দু'জন মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে তাদের করোটির মোট অন্তর্বস্তুর সাহায্যে নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যায় বলে কেউ মনে করে না। অত্যন্ত ছোট অথচ পূর্ণাঙ্গ স্নায়বিক উপাদানের সাহায্যেও কোনও অস্বাভাবিক মানসিক ক্রিয়াকলাপ চলতেই পারে। তাই দেখা যায় পিঁপড়েদের বিভিন্ন সহজাত প্রকৃতি, মানসিক ক্ষমতা ও সঙ্গীপ্রীতি অত্যন্ত উন্নত ধরনের হয়ে থাকে, যদিও তাদের সেরিব্রাল গ্যাংলিয়া একটি পিনের মাথার এক-চতুর্থাংশের চেয়ে বড় নয়। এই বিচারে পিঁপড়েদের মস্তিষ্ক পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার পরমাণুগুলির অন্যতম, এমনকী হয়তো মানুষের মস্তিষ্কের চেয়েও চমৎকার।

মানুষের মস্তিষ্কের আকার এবং তার ধীশক্তির উন্নতির মধ্যে যে একটি নিকট সম্পর্ক রয়েছে—এই ধারণার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় সভ্য ও অ-সভ্য জাতি, আদিম ও আধুনিক মানুষের করোটির মধ্যে তুলনা করলে এবং অন্য সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের করোটির সঙ্গে মানুষের করোটির তুলনা করলে। ডঃ জে. বার্নার্ড ডেভিস অত্যন্ত সযত্ন পরিমাপের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে ইউরোপীয়দের করোটির গড়পড়তা আভ্যন্তরীণ আয়তন ৯২.৩ ঘন ইঞ্চি, আমেরিকানদের ৮৭.৫ ঘন ইঞ্চি, এশিয়ানদের ৮৭.১ ঘন ইঞ্চি এবং অস্ট্রেলিয়ানদের এই আয়তন মাত্র ৮১.৯ ঘন ইঞ্চি। অধ্যাপক ব্রকা লক্ষ করেছেন, প্যারিসের ঊনবিংশ শতাব্দীর কবরখানা থেকে পাওয়া করোটি দ্বাদশ শতাব্দীর ভল্টগুলি (পারিবারিক কবরখানা) থেকে পাওয়া করোটির তুলনায় আকারে বড় এবং এই দুই ভিন্ন সময়ের করোটির অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১৪৮৬ ও ১৪২৬। ব্রকা আরও বলেছেন যে, পরিমাপ করে দেখা গেছে এই পরিবর্ধনটা ঘটেছে শুধুমাত্র করোটির সম্মুখ অংশেই—অর্থাৎ যে-অঞ্চলটায় মানুষের বুদ্ধিমত্তা সঞ্চিত থাকে। অধ্যাপক প্রিচার্ড অনুসন্ধান করে দেখেছেন, ব্রিটেনের প্রাচীন অধিবাসীদের তুলনায় বর্তমান অধিবাসীদের 'মস্তিষ্কের কোটর অনেক বেশি প্রশস্ত'। তা সত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে বহু প্রাচীনকালের কিছু করোটি, যেমন নিয়ানডারথালদের বিখ্যাত করোটি, যথেষ্ট উন্নত ও প্রশস্তই ছিল। অধ্যাপক এম. ই. লারটেট[২৫] আজ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ বছর আগেকার ও বর্তমানের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের করোটির তুলনা করে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের ব্যাপারে এই উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাম্প্রতিক কালের প্রাণীদের মস্তিষ্কের আয়তন সাধারণত বড় এবং তাদের মস্তিষ্কের ভাঁজ অনেক বেশি জটিল। অন্যদিকে, আমি আগেই দেখিয়েছি যে গৃহপালিত

২৫। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধে অধ্যাপক ব্রকা মন্তব্য করেছেন, সভ্য জাতিগুলির মধ্যে বেশ কিছু মানুষের করোটির গড় ধারণক্ষমতা বেশ কমে যায় যেহেতু সেখানে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল একদল মানুষকে সংরক্ষণ করা হয় যারা বন্য সময়ে অতি সহজেই ধ্বংস হতে বাধ্য। অন্যদিকে, অ-সভ্যদের ক্ষেত্রে গড় ধারণক্ষমতা শুধুমাত্র অত্যন্ত সক্ষম ব্যক্তিদের দিয়েই নির্ধারিত হয় যারা জীবনের চরম কঠিন অবস্থাতেও বেঁচে থাকতে সক্ষম। তাই তিনি বলেছেন—অন্যথায় এটা ব্যাখ্যাতীত হয়ে পড়ে যে, কীভাবে লঞ্জার-এর প্রাচীন ট্রগ্‌লোডাইটদের অনুন্নত মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা আধুনিক ফরাসিদের চেয়ে বেশি হয়।

খরগোশের মস্তিষ্কের আয়তন বন্য খরগোশের তুলনায় যথেষ্ট ছোট। বহু প্রজন্ম ধরে এক জায়গায় আবদ্ধ থাকার ফলেই তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা, সহজাত প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও স্বেচ্ছামতো চলাফেরা করার ক্ষমতাকে প্রায় কাজে লাগাতে পারেনি, আর তার জন্যই হয়তো এমনটা ঘটেছে।

মানুষের করোটি ও মস্তিষ্কের ক্রমবর্ধিত ওজন তার মেরুদণ্ডের বিকাশকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখছিল তখন তো বটেই। অবস্থানের এই পরিবর্তন (সোজা হয়ে দাঁড়ানো) ঘটার দরুন মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ চাপ করোটির আকারকেও পরিবর্তিত করে থাকে। এ-রকম ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ আছে যার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে করোটি কত সহজে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অবশ্য মানব-জাতিতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে শিশুদের ঘুমোনোর দোলনার প্রকার অনুযায়ীই করোটির আকারের এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আবার অভ্যাসগত পেশী-সংকোচন ও আগুনে-পোড়া ক্ষত মুখের হাড়কে চিরদিনের জন্য বদলে দেয়। শিশুদের মাথা কোনও অসুখের জন্য পাশের দিকে বা পিছনের দিকে হেলে গেলে তাদের যে-কোনও একটি চোখ তার নির্দিষ্ট স্থান পরিবর্তন করে এবং মস্তিষ্কের চাপের ফলে করোটির আকার আপাতভাবে পরিবর্তিত হয়।[২৬] আমি দেখিয়েছি দীর্ঘ-কর্ণযুক্ত খরগোশরা যখন একটি কানকে দ্রুত সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়, তখন সেই সামান্য কারণেও সেই পাশের করোটির প্রায় প্রতিটি হাড় সামনর দিকে ঝুঁকে পড়ে, ফলে বিপরীত পাশের হাড়গুলি আর কিছুতেই ওই হাড়গুলির সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ থাকে না। শেষত, যদি মানসিক শক্তির কোনওরকম পরিবর্তন ছাড়াই কোনও প্রাণীর সাধারণ আকার বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় অথবা দৈহিক আকৃতির কোনও বড় রকমের পরিবর্তন ছাড়াই তার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তাহলে তার করোটির আকারও অবশ্যই পরিবর্তিত হবে। গৃহপালিত খরগোশদের পর্যবেক্ষণ করেই এই সিদ্ধান্তে এসেছি আমি। এদের কেউ কেউ বন্য খরগোশদের চেয়েও আকারে বড় হয় আর বাদবাকিরা তাদের স্ব-আকারেই থেকে যায়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শরীরের আকারের তুলনায় মস্তিষ্কের আয়তন যথেষ্ট হ্রাস পায়। ওইসমস্ত খরগোশদের করোটি যে দীর্ঘায়ত বা দীর্ঘ চোয়ালযুক্ত, তা দেখে প্রথমে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। যেমন, প্রায় সমান বিস্তৃতিবিশিষ্ট দু'টি খরগোশের করোটির কথা উল্লেখ করা যায়, যাদের একটি ছিল বন্য ও অপরটি বেশ বড় জাতের গৃহপালিত খরগোশ। এদের করোটির দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৩.১৫ ইঞ্চি ও

২৬। জ্যারোল্ড (দ্রঃ, 'অ্যান্থ্রোপলজিয়া', পৃঃ ১১৫-১৬। অধ্যাপক ক্যাক্তারও তাঁর নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মাথার অস্বাভাবিক অবস্থানের জন্য করোটির আকারগত পরিবর্তন হয়। তিনি মনে করেন কিছু কিছু পেশার ক্ষেত্রে, যেমন জুতো তৈরির সময়, মাথা সবসময় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে, ফলে কপাল আরও বেশি গোল ও প্রক্ষিপ্ত হয়।

৪.৩ ইঞ্চি। বিভিন্ন জাতির মানুষদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় তাদের করোটির আকারে; কারও কারও ক্ষেত্রে তা লম্বাটে ধরনের, কারও কারও ক্ষেত্রে গোল, এবং এখানে খরগোশদের ঘটনাটি দিয়ে এই বিষয়টিকে বেশ ভালভাবে বোঝা যেতে পারে বলে মনে হয়। কারণ, ওয়েল্‌কার লক্ষ করেছেন, 'খাটো লোকেরা অনেক বেশি ছোট চোয়ালযুক্ত (brachycephaly) হয়, আর লম্বা লোকেদের চোয়াল বেশ দীর্ঘ (dolichocephaly) হয়ে থাকে', আর সেইজন্য লম্বা লোকেদের তুলনা করা যেতে পারে চওড়া ও দীর্ঘ শরীরবিশিষ্ট খরগোশদের সঙ্গে, যাদের প্রায় সকলের মধ্যেই লম্বাটে করোটি বা দীর্ঘ চোয়াল দেখা যায়।

এইসমস্ত ঘটনা থেকে আমরা খানিকটা হলেও বুঝতে পারছি কীভাবে মানুষ বৃহদাকার ও খানিকটা গোলাকৃতি করোটি লাভ করেছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টতই তাকে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে আর-একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য হল মানুষের নির্লোম দেহত্বক। তিমিমাছ, শুশুক (সেটাসিয়া), তৃণভোজী সামুদ্রিক-স্তন্যপায়ী প্রাণী (সাইরেনিয়া) ও জলহস্তীর দেহে লোম থাকে না এবং এই লোম না-থাকার ফলে জলের মধ্যে চলাফেরা করতে তাদের সুবিধে হয়। এর জন্য অবশ্য তাদের শারীরিক উষ্ণতার কোনও ব্যাঘাত ঘটে না, কারণ ঠান্ডা অঞ্চলে বসবাসকারী প্রজাতির প্রাণীদের দেহে পুরু চর্বির একটি স্তর থাকে, যা সীলমাছ ও ভোঁদড়ের লোমের মতো একই কাজ করে থাকে। হাতি ও গণ্ডারের দেহ প্রায় লোমশূন্য। আবার কিছু কিছু বিলুপ্ত প্রজাতি, যারা আগে অত্যন্ত ঠান্ডা পরিবেশে বাস করত, তাদের দেহ লম্বা পশম বা লোম দ্বারা আবৃত ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে এই উভয় ধরনের প্রাণীদের বর্তমান প্রজাতিগুলো প্রখর তাপের এলাকায় এসে পড়ার দরুনই নিজেদের লোম-আচ্ছাদন হারিয়েছে। সম্ভাব্যতার এই ভিত্তি আরও দৃঢ় হয় যখন দেখি যে ভারতীয় হাতিদের মধ্যে উচ্চভূমি ও ঠান্ডা অঞ্চলে বসবাসকারী হাতিরা নিম্নভূমির হাতিদের তুলনায় অনেক বেশি লোমাবৃত। তাহলে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আদিম যুগে কোনও উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করার জন্যই মানুষ লোমবর্জিত হয়েছে? লোম বা চুল যে প্রধানত পুরুষদের বুকে ও মুখমণ্ডলে এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে মধ্যশরীর-সহ চারটি প্রত্যঙ্গের (হাত ও পা) সন্ধিস্থলে থাকে, তা এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে, অর্থাৎ অনুমান করা যায় যে মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখার আগে থেকেই তার দেহে চুল বা লোমের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল, কারণ শরীরের যে-সব অংশে এখন সবচেয়ে বেশি চুল দেখা যায় সেগুলি নিঃসন্দেহেই সূর্যের তাপ না লাগতে পারে এমন অঞ্চলেই থাকত। কিন্তু এক্ষেত্রে মাথার চাঁদি একটি অদ্ভুত ব্যতিক্রম, কারণ প্রায় সবসময়ই চাঁদিতে সূর্যের তাপ লেগেছে, অথচ জায়গাটা ঘন চুল দ্বারা আবৃত। আবার, উন্নত শ্রেণির অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীরা (মানুষও যার অন্তর্ভুক্ত) বিভিন্ন গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বসবাস করলেও তাদের শরীরে

যথেষ্ট লোম বা চুল দেখা যায়, এবং তা সাধারণত শরীরের উপরাংশেই বেশি ঘন[২৭] হয়। এই ঘটনা স্বভাবতই মানুষের দেহ প্রায় লোমশূন্য হওয়ার পিছনে সূর্যের ভূমিকা থাকার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। মিঃ বেন্ট[২৮] মনে করেন যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে লোমহীন হতে পারাটা মানুষের একটা বিশেষ সুবিধে করে দিয়েছে। কারণ এর ফলে তারা বেশ কিছু রক্তপায়ী কীট (acari) ও অন্যান্য পরজীবী প্রাণীদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, যারা নালী-ঘা বা পচনের জন্য দায়ী। কিন্তু এই ঘটনা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তার দেহকে যথেষ্ট পরিমাণে নির্লোম করতে কার্যকরী হয়েছে কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কেননা গ্রীষ্মমণ্ডলে বসবাসকারী অসংখ্য চতুষ্পদীদের মধ্যে কেউই উপশমকারী কোনও বিশেষ উপায়ের অধিকারী হতে পারেনি। যে-দৃষ্টিভঙ্গিটি আমার সবথেকে সম্ভব বলে মনে হয় তা হল—পুরুষেরা এবং বিশেষ করে স্ত্রীলোকেরা, লোমবর্জিত হয়েছে দেহের সৌন্দর্যবর্ধক কারণে, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, অন্যান্য উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীর চেয়ে লোমশতার ব্যাপারে মানুষ যে এত আলাদা, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ যৌন নির্বাচনের সাহায্যে চরিত্রের বিভিন্ন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত রূপের মধ্যেও প্রায়শই বিপুল পার্থক্য দেখা যায়।

প্রচলিত একটি ধারণা অনুযায়ী, লেজ না-থাকাটা মানুষের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানুষের সঙ্গে নিকট সম্পর্কযুক্ত কিছু বানরের মধ্যেও এই অঙ্গটির অস্তিত্ব নেই। অতএব এটি মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়। একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রাণীর লেজ দৈর্ঘ্যে কম-বেশি হয়। ম্যাকাকাস জাতের বানরদের কোনও কোনও প্রজাতির লেজ তাদের শরীরের চেয়েও লম্বা এবং ২৪টি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। আবার কারও লেজ প্রায় অদৃশ্য, যা মাত্র তিনটি বা চারটি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। কিছু কিছু বেবুনের লেজে ২৫টি কশেরুকা থাকে, অথচ ম্যান্‌ড্রিলদের বেলায় খুব ছোট ছোট অবৃদ্ধিপ্রাপ্ত ১০টি করে কশেরুকা থাকে, বা কুভিয়ের-এর মতে, কখনও কখনও মাত্র পাঁচটি কশেরুকা দিয়ে গঠিত হয়। ছোটবড় যে-কোনও লেজেরই

২৭। ইসিডোর জিওফ্রে সেন্ট-হিলেয়ার (দ্রঃ, 'Hist. Nat. Generale', ২য় খণ্ড, ১৮৫৯, পৃঃ ২১৫-২১৭) মানুষের মাথায় বড় চুল থাকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে আরও উল্লেখ করেছেন বানর ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের দেহের উপরের অংশ নিম্নাংশের তুলনায় বেশি ঘন চুল বা লোম দ্বারা আবৃত থাকে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরাও সহমত পোষণ করেন। অধ্যাপক পি. গার্ভেস (দ্রঃ, 'Hist. Nat. des Maommi fercs', ১ম খণ্ড, ১৮৫৪, পৃঃ ২৮) বলেছেন যে গরিলাদের পিঠে চুলের পরিমাণ নিম্নাংশের তুলনায় পাতলা, এমনকী দু-এক জায়গায় নেই বললেও চলে।

২৮। দ্রষ্টব্য, 'দ্য ন্যাচরালিস্ট ইন নিকারাগুয়া', পৃঃ ২০৯। মিঃ বেন্টের মতের সমর্থনে আমি এখানে স্যর ডব্লু. ডেনিসনের লেখা থেকে একটি অংশ (দ্রঃ, 'ভ্যারাইটিস অফ ভাইসরিগ্যাল লাইফ', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪০) উদ্ধৃত করছি, 'অস্ট্রেলিয়াবাসীদের অভ্যাস হল এই যে ক্ষতিকারক পোকামাকড়দের উৎপাতে তারা বিরক্ত হয়ে ওঠে।'

প্রান্তভাগ ক্রমশ সরু হয়ে যায়, এবং আমার মনে হয় এর কারণ হল অন্ত্য-পেশীর (terminal muscles) অপুষ্টিজনিত ক্ষয়, এবং এই অঞ্চলের ধমনী ও স্নায়ুতন্ত্রের অব্যহারজনিত ক্ষয়প্রাপ্তি। এ-সবের ফলেই অন্ত্য-অস্থিও ক্ষয়ে যায়। লেজের দৈর্ঘ্যের রকমফের সম্বন্ধে কোনও যথার্থ ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে আমরা মূলত বহিরাংশে লেজের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছি। অধ্যাপক ব্রকা সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণীর লেজ দু'টি অংশে বিভক্ত। এই অংশ দু'টি সাধারণত একে অপরের থেকে আকস্মিকভাবে পৃথক হয়ে পড়ে। উপরের অংশে যে কশেরুকা থাকে সেগুলি কম-বেশি খাঁজকাটা ও সাধারণ কশেরুকার মতো রক্তবাহী নালী, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত, অন্যদিকে অন্তিম অংশের কশেরুকাগুলি খাঁজকাটা নয়, সমস্তটাই প্রায় মসৃণ এবং সত্যিকারের কশেরুকার সঙ্গে মিল প্রায় নেই বললেই চলে। মানুষ ও বনমানুষদের দেহে লেজের কোনও বাহ্য অস্তিত্ব না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা আছে, এবং উভয়ের এই অদৃশ্য লেজ একইভাবে গঠিত। আকারে ও সংখ্যায় অনেক ছোট হয়ে গিয়ে শিরদাঁড়ার অন্তিম অংশের কশেরুকারা গঠন করে অনুত্রিকাস্থি, যা একটি বিকাশরুদ্ধ অঙ্গ। লেজের গোড়ার অংশের কশেরুকাগুলি সংখ্যায় অল্প, পরস্পরের গায়ে এরা শক্তভাবে আটকে থাকে এবং এদের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের লেজের এই ধরনের কশেরুকার তুলনায় এদের কশেরুকাগুলি অনেক চওড়া ও চ্যাপ্টা। ব্রকার মতে, এগুলি অতিরিক্ত সেক্রাল কশেরুকা দ্বারা গঠিত। এগুলি নির্দিষ্ট কিছু আভ্যন্তরীণ অঙ্গকে সহায়তা করে থাকে এবং অন্যান্য নানান উপায়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। দেখা গেছে মানুষ ও বনমানুষদের সোজা বা আংশিক-সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখার সঙ্গে এগুলির পরিবর্তন বা রূপান্তর প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত। এই সিদ্ধান্তটিই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, যদিও আগে ব্রকার অন্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যা তিনি বর্তমানে পরিত্যাগ করেছেন। তাই বলা যায় যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মানুষ ও উচ্চশ্রেণির বানরদের (বনমানুষ) লেজের উপরের অংশের কশেরুকাগুলি (basal caudal vertebrae) পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু অনুত্রিকাস্থি গঠনকারী লেজের অন্তিম অংশের লুপ্তপ্রায় ও পরিবর্তনশীল-কশেরুকা সম্বন্ধে আমরা কী বলব? এ সম্বন্ধে একটি মত চালু আছে যা বরাবর উপহাসের বস্তু হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। মতটি হল—লেজের বহিরাংশ বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে ঘর্ষণের একটা সম্পর্ক আছে। তবে আজ আর এই মতটাকে ঠিক উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ডঃ অ্যান্ডারসন বলেছেন যে ম্যাকাকাস ব্রুনাস নামক বানরদের লেজ অত্যন্ত ছোট, কিন্তু উপরাংশের কশেরুকা-সহ দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত এবং মোট এগারোটি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। লেজের অন্তিম অংশটি পেশীবন্ধ দিয়ে তৈরি, সেখানে কোনও কশেরুকা থাকে না। তারপরে থাকে ক্ষুদ্রাকৃতি পাঁচটি বিকাশরুদ্ধ লুপ্তপ্রায় কশেরুকা। এগুলি এতই ছোট যে পাঁচটি কশেরুকার মোট দৈর্ঘ্য মাত্র $^{৩}/_{৮}$ ইঞ্চি। এই অংশগুলি স্থায়ীভাবে আঁকশির আকারে একদিকে হেলে

থাকে। লেজের মুক্ত অংশটি দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির থেকে সামান্য বড় এবং এটি মাত্র চারটি ক্ষুদ্রাকৃতি কশেরুকা দিয়ে গঠিত। এই সংক্ষিপ্ত লেজটি খাড়া হয়ে থাকে, কিন্তু এর মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বাঁদিকে ভাঁজ হয়ে থাকে। আঁকশির মতো দেখতে অংশটি-সহ এই শেষাংশটি উপরের বাঁকানো অংশের মধ্যবর্তী ব্যবধান কমাতে সাহায্যে করে। ফলে প্রাণীরা ওর ওপর ভর দিয়ে বসতে পারে, আর তাই এটি রুক্ষ ও শক্ত হয়ে ওঠে। ডঃ অ্যান্ডারসন তাঁর পর্যবেক্ষণগুলির সারসংক্ষেপ করেছেন এইভাবে : 'এই ঘটনাগুলির একটিই মাত্র ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ব্যাখ্যাটি হল—লেজের ক্ষুদ্রাকৃতির ফলে বানরদের বসার সময় সেটা এগিয়ে আসে এবং প্রায়শই এই লেজের ওপরেই বানররা বসে থাকে। আর ইস্কিয়াল টিউবারোসিটির (যে দু'টি হাড়ের উপর ভর দিয়ে বসে প্রাণীরা) শেষাংশ পেরিয়ে লেজের পক্ষে বাইরে বেরিয়ে থাকা যে সম্ভব নয়, তা থেকে মনে হয় নিতম্বের আভ্যন্তরীণ স্থানে বানরেরা ইচ্ছামতো তাদের লেজকে গুটিয়ে নিতে পারত, যাতে মাটিতে চাপ না লাগে, এবং এইভাবে বসার ফলে তাদের লেজের বক্রতা ক্রমে ক্রমে স্থায়ী রূপ নিয়েছিল, যার দরুন বসার সময় তাদের আর অসুবিধে হত না।'

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বোঝা যায় বানরদের গোটা লেজটার রুক্ষ ও শক্ত হয়ে যাওয়াটা কোনও আশ্চর্য ব্যাপার নয়। ডঃ মুরি চিড়িয়াখানায় এদের (বানরদের) এবং এদের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত সামান্য বড় লেজবিশিষ্ট আরও তিন ধরনের প্রজাতিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন, 'এই প্রাণীরা বসার সময় তাদের লেজটাকে সুবিধেমতো পশ্চাৎদেশের যে-কোনও একদিকে ঠেলে দেয়। ফলে লেজ লম্বা বা খাটো যাই হোক না কেন, তার গোড়াতে ঘষা লাগে এবং ঘর্ষণজনিত ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অঙ্গহানির বংশগত প্রভাব[২৯] সম্পর্কিত তথ্যগুলি থেকে আমরা বলতে পারি যে খাটো লেজবিশিষ্ট বানরদের লেজের বেরিয়ে থাকা অংশের তেমন কোনও কার্যকরী ভূমিকা না থাকার দরুন ওই অংশটা বেশ কয়েক পুরুষ পরে লুপ্তপ্রায় অংশে পরিণত হওয়া বা অবিরাম ঘর্ষণ ও ক্ষতের ফলে তার ক্রমবিকৃতি ঘটাও মোটেই অসম্ভব নয়। যেমন ম্যাকাকাস ব্রুনাস বানরদের লেজের বেরিয়ে থাকা অংশ এখন এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এবং এম. ইকাউদেতাস ও আরও অনেক উন্নত জাতের বানরদের মধ্যে এই অংশটা পুরোপুরি লুপ্তই হয়ে গেছে। আর শেষত আমরা দেখতে পাই যে মানুষ ও বনমানুষের মধ্যে লেজের আর

২৯। এ প্রসঙ্গে ডঃ ব্রাউন-সেকোয়ার্ড কৃত সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত গিনিপিগের অস্ত্র-চিকিৎসার ফলে পরিবর্তিত প্রভাবের পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখযোগ্য, এবং সেই সঙ্গেই উল্লেখ করা যায় অতি সম্প্রতি তাদের গলার সংবেদনশীল স্নায়ুতন্তু কাটা যাওয়ায় অনুরূপ প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা। পরে আমি সুযোগমতো মিঃ স্যালভিন-এর সাড়া-জাগানো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে মো-মো-রা (mot-mots) তাদের লেজের পালকগুচ্ছে কোনও কাঁটা ফুটলে তা বংশগত প্রভাবের দ্বারা দাঁত দিয়ে তুলে ফেলে। এ-বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য, 'ভ্যারিয়েশনস অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২-২৪।

কোনও অস্তিত্ব নেই, লেজের অন্তিম অংশে দীর্ঘদিন ধরে ঘর্ষণজনিত ক্ষত সৃষ্টি হবার ফলে তা অদৃশ্য হয়েছে। অন্যদিকে, লেজের গোড়ার দিকের দৃঢ় অংশটি আকারে হ্রাস পেয়েছে ও পরিবর্তিত হয়েছে, যাতে তা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পক্ষে উপযোগী হয়ে উঠতে পারে।

আমি দেখাতে চেষ্টা করছি যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষ কীভাবে তার একান্ত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। মনে রাখা দরকার, শরীরের যে-সমস্ত আকারগত বা গঠনগত পরিবর্তন কোনও প্রাণীকে তার জীবনযাত্রার অভ্যাস, প্রয়োজনীয় খাদ্য বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পক্ষে উপযোগী হয়ে উঠতে সাহায্য করে না, সেগুলো কিন্তু এইভাবে অর্জিত হতে পারে না। তবে প্রতিটি প্রাণীর পক্ষে কোন্ কোন্ পরিবর্তন সুবিধাজনক, সে ব্যাপারে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। কারণ শরীরে এমন অনেক অংশ আছে যেগুলির ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও খুবই সীমিত। যেমন আমরা সত্যিই কি খুব ভালভাবে জানি যে রক্ত ও কোষকলার মধ্যে কী কী পরিবর্তন ঘটার ফলে প্রাণীরা কোনও নতুন পরিবেশ বা নতুন ধরনের খাবারের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। আন্তঃসম্পর্কের নীতির কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত। অধ্যাপক ইসিডোর জিওফ্রে দেখিয়েছেন যে মানুষের ক্ষেত্রে গঠনগত অনেক বিচিত্র বিচ্যুতি আসলে এই নীতির দ্বারাই একসূত্রে গ্রথিত। আন্তঃসম্পর্ক ব্যতিরেকেও, কোনও-একটি অংশের পরিবর্তন অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ধরনের আরও কিছু পরিবর্তনের জন্ম দেয় এবং সেটা ঘটে অন্যান্য অংশের বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত ব্যবহারের ফলস্বরূপ। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। যেমন, কোনও পোকামাকড়ের বিষে উদ্ভিদের কাণ্ডে একপ্রকার আশ্চর্য বৃদ্ধি (gall) ঘটে। আবার তোতাপাখি ইত্যাদিকে বিশেষ এক ধরনের মাছ খাওয়ালে বা ব্যাঙ জাতীয় প্রাণীর বিষ তাদের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে তাদের পালকের রঙ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। এগুলি থেকে বোঝা যায় যে বিশেষ উদ্দেশ্যে শরীরের তরল অংশকে পরিবর্তিত করলে তা থেকে অন্যান্য ধরনের পরিবর্তনও ঘটতে শুরু করে। আমাদের বিশেষ করে মনে রাখা উচিত যে, কোনও প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে অতীতে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল, সেগুলি সম্ভবত নির্দিষ্ট বা স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বংশগত হয়ে পড়েছিল।

কাজেই জীবজগতের অসংখ্য ঘটনাকে অনায়াসেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে, গাছপালা সম্পর্কে নাজেলি-র প্রবন্ধ, পশুপাখি সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকের মন্তব্য এবং বিশেষ করে সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক ব্রকা-র প্রবন্ধ পড়ার পর আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আমার 'অরিজিন অফ স্পিসিস' বইটির প্রথম দিককার সংস্করণগুলিতে আমি বোধহয় প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তনের ভূমিকাকে বড় করে দেখেছিলাম। তাই বইটির পঞ্চম সংস্করণে আমি কিছু অদল-বদল করেছি, যাতে শুধুমাত্র গঠন-প্রকৃতির অভিযোজনগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য গত

কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার নিরিখে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে শরীরের অনেকগুলি অংশ যা আমাদের কাছে এখন অকেজো বলে মনে হচ্ছে, সেগুলিও পরে একসময় দরকারি হয়ে উঠবে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতায় এসে পড়বে। তথাপি, ইতিপূর্বে আমি এই সমস্ত গঠন-আকৃতির অস্তিত্বকে যথাযথভাবে বিচার করে দেখিনি, যেগুলি আমাদের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী উপকারীও নয়, অপকারীও নয়, আর এটাকে আমি আমার সমস্ত কাজের মধ্যে একটি সবচেয়ে বড় গাফিলতি বলে মনে করি। অজুহাত হিসেবে অবশ্য বলতে পারি যে, এ-ব্যাপারে আমার মধ্যে দু'টি নির্দিষ্ট চিন্তা কাজ করছিল। প্রথমত, আমি দেখাতে চেয়েছিলাম বিভিন্ন প্রজাতি আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি হয়নি; এবং দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের কাজে প্রাকৃতিক নির্বাচনই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল, যদিও এই কাজে অভ্যাসের বংশগত প্রভাব অনেকখানি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া সামান্য পরিমাণে সাহায্য করেছিল। তবে আমি কিছুতেই আমার এই পূর্বতন বিশ্বাসের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না (যে-বিশ্বাস তখন প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছিল) যে প্রত্যেকটি প্রজাতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্বাস থেকেই আমি এই গোপন অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে লুপ্তাংশ বাদে গঠন-আকৃতির প্রতিটি অংশেরই নিজস্ব কিছু কিছু বিশেষ কাজ রয়েছে, যদিও বেশ কিছু বিষয় আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে। এই ধারণা থেকে যে-কেউই অতীত বা বর্তমানের ঘটনাবলির প্রশ্নে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকাকে স্বাভাবিকভাবেই অনেক বাড়িয়ে দেখতে বাধ্য। যাঁরা বিবর্তনের নীতিকে মেনে নেন অথচ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ মানেন না, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার বইটির সমালোচনা করার সময় বেমালুম ভুলে যান যে উপরোক্ত চিন্তা দু'টি মাথায় রেখেই বইটি লিখেছিলাম আমি। অতএব, যদি আমি প্রাকৃতিক নির্বাচনকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভুল করে থাকি (অবশ্য তা মানতে আমি আদৌ রাজি নই) বা তার ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়ে থাকি (এই ব্যাপারটা অবশ্য হয়ে থাকতে পারে), তাহলেও বলব অন্তত একটি কাজ আমি করতে পেরেছি—আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টির মতবাদকে সমূলে উৎপাটিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছি।

এমনটা হওয়া অসম্ভব নয় যে সমস্ত জীবের, এমনকী মানুষেরও, গঠন-আকৃতির মধ্যে এমন কিছু অংশ আছে যেগুলি আগে বা এখন কোনও সময়েই তাদের কোনও কাজে আসেনি বা আসে না, ফলে এগুলির কোনওরকম শারীরবৃত্তীয় গুরুত্বও প্রত্যেকটি প্রজাতির প্রতিটি জীবের মধ্যে কেন অসংখ্য ছোট ছোট পার্থক্য দেখা যায়, তার সঠিক কারণ আমাদের জানা নেই। পুনরাবৃত্তি বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আকার, স্বভাব ইত্যাদি পাওয়ার আলোয় বিচার করতে গেলে সমস্যাটা প্রায়শই আরও জটিল হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের পিছনে উপযুক্ত কারণ তো থাকতেই হবে। এই কারণগুলি, তা সেগুলি যা-ই হোক না কেন, যদি আরও সম্মিলিতভাবে ও সজীবভাবে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করত (এর বিপরীতে কোনও জোরালো যুক্তি দাঁড় করানো যায়নি), তাহলে তার ফল সম্ভবত শুধুমাত্র জীবে-জীবে সামান্য পার্থক্য না হয়ে একটি সুস্পষ্ট ও নিয়ত পরিবর্তনকেই সূচিত করত, যদিও এই পরিবর্তনের তেমন কোনও

শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব থাকত না। পরিবর্তিত গঠন-আকৃতি, যেটা কোনওভাবেই শরীরের উপকারে লাগে না, সেটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কখনওই একইরকম হতে পারে না, তবে ক্ষতিকারক দিকগুলি এর মাধ্যমে দূরীভূত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি উদ্দীপক কারণের অনুমানসিদ্ধ সমরূপকে অনুসরণ করে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যসমূহ নিজেদের মধ্যে অবাধ যৌনমিলনের ফলেই ঘটে থাকে বলে মনে হয়। উত্তরকালব্যাপী একই প্রজাতির জীবের মধ্যে এইভাবে নানান পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং যতদিন উদ্দীপক কারণগুলি একই থাকে ও অবাধ যৌনমিলন চালু থাকে, ততদিন এই পরিবর্তনগুলি প্রায় সমভাবেই তাদের উত্তরপুরুষদের ওপরে বর্তায়। তথাকথিত স্বতঃস্ফূর্ত বৈচিত্র্যের মতো এই উদ্দীপক কারণগুলি সম্বন্ধেও আমরা শুধুমাত্র এইটুকুই বলতে পারি—যে-অবস্থার মধ্যে কোনও পরিবর্তনশীল জীব প্রতিপালিত হয়, তার পরিবেশগত প্রকৃতির তুলনায় এগুলি তার শারীরিক গঠনাকৃতির সঙ্গে অনেক বেশি নিকট সম্পর্কযুক্ত।

সিদ্ধান্ত

এই পরিচ্ছেদে আমার দেখলাম যে আজকের দিনে অন্যান্য প্রাণীদের মতোই মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে যেমন বহু ধরনের পার্থক্য বা সামান্য বৈসাদৃশ্য থাকতে পারে, তেমনি মানুষের আদি পূর্বপুরুষের মধ্যেও এইসব বৈসাদৃশ্য নিঃসন্দেহেই বর্তমান ছিল। আজকের দিনে এগুলি যে-কারণে ঘটে থাকে তখনও সেই একই কারণেই এগুলি ঘটত এবং একই সাধারণ ও জটিল নিয়ম অনুযায়ীই পরিচালিত হত। আবার সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই যেমন তাদের জীবনধারণের উপায়কে ছাপিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করার প্রবণতা রয়েছে, তেমনি মানুষের পূর্বপুরুষরাও নিশ্চয়ই এই নিয়মের বাইরে ছিল না। আর এ থেকেই শুরু হয়েছিল তাদের বেঁচে থাকার লড়াই এবং দেখা দিয়েছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিকে (প্রাকৃতিক নির্বাচন) দারুণভাবে সাহায্য করেছিল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বর্ধিত ব্যবহারের বংশগত প্রভাব। এবং এই দুই প্রক্রিয়া (বেঁচে থাকার জন্য লড়াই ও প্রাকৃতিক নির্বাচন) একে অপরের ওপর অবিরাম প্রভাব ফেলেছে। তাছাড়াও যৌন নির্বাচনের মাধ্যমেও মানুষের দেহে নানান অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে হয়। সেইসব অজানা কার্যসাধনশক্তির অনুমানসিদ্ধ সমরূপ কার্যকলাপের দরুণ সংঘটিত পরিবর্তনসমূহের কিছু ব্যাখ্যাতীত অবশেষ অবশ্য থেকেই যায়, যেগুলি কখনও কখনও আমাদের গৃহপালিত জন্তুদের জন্তুদের গঠন-আকৃতিতে দারুণ উল্লেখযোগ্য ও আকস্মিক বিচ্যুতির সৃষ্টি করে থাকে।

বন্য জনসমষ্টি ও বিশাল সংখ্যক চতুষ্পদ প্রাণীদের আচার-আচরণ লক্ষ করলে বোঝা যায় যে প্রাচীনকালের মানুষ, এমনকী তাদের বনমানুষ-সদৃশ পূর্বপুরুষরাও, সমাজবদ্ধভাবেই বসবাস করত। এই সমাজবদ্ধ প্রাণীদের কারও কারও ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন কখনও কখনও সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক বৈচিত্র্যগুলিকে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে কার্যকরী হত। তাই দেখা যায় যে-সমাজে বহু গুণে ভূষিত বেশ

কিছু সংখ্যক মানুষ থাকে, সেই সমাজের লোকসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সমাজের ওপর সর্বদাই আধিপত্য করে থাকে। অবশ্য এই ধরনের সমাজভুক্ত কোনও-একজন সদস্য ওই সমাজের অন্যদের তুলনায় কোনও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয় না। সমাজবদ্ধ কীটপতঙ্গেরা এইভাবে বহু উল্লেখযোগ্য গঠন-আকৃতি অর্জন করেছে, যেমন শ্রমিক-মৌমাছিদের ফুলের পরাগ-সংগ্রাহক অঙ্গ বা হুল, অথবা সৈনিক-পিঁপড়েদের শক্ত চোয়াল ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি এককভাবে এইসব কীট-পতঙ্গের কোনও কাজেই লাগে না অথবা খুবই সামান্য কাজে লাগে। সমাজবদ্ধ উন্নতশ্রেণির প্রাণীদের বেলায় এই ধরনের গঠন-আকৃতিগুলি কিছু গৌণ কাজকর্মে সাহায্য করে থাকে—অবশ্য আমার জানা নেই যে শুধু সমাজের মঙ্গলার্থে কাজকর্ম করার জন্য গঠন-আকৃতির কোনও পরিবর্তন কখনও ঘটেছে কি না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পুরুষ-গণ্ডারের শিং ও পুরুষ-বেবুনের কেনাইন-দাঁতকে তাদের যৌন-বিষয়ক দ্বন্দ্বের অস্ত্র বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু এগুলি তাদের গোষ্ঠী বা দলকে রক্ষা করার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু মানসিক ক্ষমতার বিষয়গুলি সম্পূর্ণ অন্যরকম (পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা করব), কারণ এই ক্ষমতাগুলি প্রধানত বা শুধুমাত্র সমাজের মঙ্গলের জন্যই গড়ে উঠেছে এবং সেইসঙ্গেই প্রতিটি পৃথক পৃথক প্রাণী পরোক্ষভাবে কিছু সুবিধাও পেয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে স্বতঃই প্রতিবাদ উঠবে, তবু এটাই সত্যি যে জীব-জগতের মধ্যে মানুষ এমন একটি জীব যে ভীষণ অসহায় ও প্রতিরোধশক্তিহীন। প্রাথমিক ও অপেক্ষাকৃত অল্পোন্নত অবস্থায় সে আরও অসহায় ছিল। এই প্রসঙ্গে আরজিলের ডিউক জোর দিয়ে বলেছেন, 'মানুষের শারীরিক কাঠামো পশুদের থেকে অন্যরকম। শারীরিকভাবে মানুষ অনেক অসহায় ও দুর্বল। অর্থাৎ, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই এইসব পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি।' এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি মানুষের দেহের অনাবৃত ও অরক্ষিত অবস্থার কথা, শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য বড় দাঁত বা থাবার অনুপস্থিতির কথা, জোরে দৌড়নোর অক্ষমতা ও দৈহিক শক্তির ঘাটতির কথা, খাদ্য-অন্বেষণ বা বিপদ এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ঘ্রাণশক্তির অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এইসমস্ত অভাবের সঙ্গে আরও একটি গুরুতর ঘাটতির কথা যোগ করা যায়—মানুষ দ্রুত গাছে উঠতে পারে না, ফলে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতেও পারে না। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে দেহের লোমশূন্যতা এমন কিছু ক্ষতিকারক নয়, কারণ আমরা জানি যে নগ্নদেহী ফুজিয়ানরা কঠিন জলবায়ুতেও দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। মানুষের এই প্রতিরোধহীন অবস্থার সঙ্গে বানরদের অবস্থার তুলনা করার সময় মনে রাখা দরকার যে কেবলমাত্র পুরুষ-বানরদের মধ্যেই বৃহদাকার কেনাইন দাঁতের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়, এবং মুখ্যত যৌন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়। তথাপি লক্ষ করার বিষয় হল—স্ত্রী-বানরদের মধ্যে এই দাঁত অনুপস্থিত থাকলেও তারা কিন্তু দিব্যি বেঁচে থাকে।

দৈহিক আকার বা শক্তির ব্যাপারে বলা যায় যে শিম্পাঞ্জির মতো ছোট আকারের কোনও প্রাণী থেকে অথবা গরিলার মতো শক্তিশালী কোনও প্রজাতি থেকে মানুষ ক্রমবিকশিত হয়েছে কিনা, তা আমাদের জানা নেই। তাই এটাও আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে মানুষ তার পূর্বপুরুষদের থেকে চোহারায় বড় ও বেশি শক্তিশালী হয়েছে, নাকি ছোট ও দুর্বলতর হয়েছে। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে কোনও জন্তু যদি বিপুল আকৃতি, শক্তি ও হিংস্রতার অধিকারী হয় এবং গরিলার মতো নিজেকে সমস্ত শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে সে কখনওই দলবদ্ধ বা সামাজিক জীবে পরিণত হবে না। ফলস্বরূপ তার মধ্যে উন্নত মানসিক গুণাবলি প্রায়শই অনুপস্থিত থাকবে, যেমন সঙ্গীসাথীদের প্রতি সমবেদনা ও ভালবাসার মতো গুণ তার মধ্যে দেখা যাবে না। তাই অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোনও জীব থেকে বিবর্তিত হওয়াটা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক হয়েছে বলেই মনে হয়।

মানুষ তার দৈহিক শক্তির ঘাটতি ও জোরে দৌড়নোর অক্ষমতা এবং প্রকৃতিদত্ত অস্ত্রের অভাব ইত্যাদিকে দারুণভাবেই পূরণ করে নিতে পেরেছে, প্রথমত তার মননশক্তির সাহায্যে, যা দিয়ে সে বর্বর অবস্থায় থাকাকালেই তৈরি করেছে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি, এবং দ্বিতীয়ত তার সমাজলব্ধ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে, যা তার দলের সাথীদের সঙ্গে সুন্দর বোঝাপড়ার রাস্তা প্রশস্ত করে দিয়েছে। আমরা জানি পৃথিবীতে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো এ-রকম হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভরা দেশ আর দু'টি নেই। আবার এ-ও অজানা নয় যে উত্তরমেরুর মতো এমন ভয়ঙ্কর দৈহিক কষ্টের জায়গাও পৃথিবীতে আর নেই। তথাপি দেখা যায় যে বুশম্যান নামক খুবই দুর্বল একটি জাতি দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অত্যন্ত খাটো আকৃতির এস্কিমোরা উত্তরমেরুতে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে। নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে মানুষের পূর্বপুরুষদের মেধা এবং সামাজিক বিন্যাস সম্ভবত আজকের দিনের সবচাইতে বন্যদশায় থাকা মানুষদের চেয়েও হীনতর ছিল। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তারা গাছে চড়া ইত্যাদির মতো পশু-সদৃশ ক্ষমতাগুলি ক্রমশ হারিয়ে ফেলার সময় তাদের মেধাশক্তি উন্নত না হয়ে উঠলে জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকা বা উন্নতি করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। কিন্তু এই পূর্বপুরুষেরা যদি অস্ট্রেলিয়া, নিউ গিনি বা বোর্নিওর মতো (যা বর্তমানে ওরাংওটাংদের বাসভূমি) কোনও গরম মহাদেশ বা বৃহৎ দ্বীপের অধিবাসী হত, তাহলেও আজকের দিনের বন্য মানুষদের থেকে অনেক বেশি অসহায় ও প্রতিরোধহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের তেমন কোনও মারাত্মক বিপদের মোকাবিলা করার দরকার হত না। এই ধরনের কিছু বৃহৎ অঞ্চলের গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে উদ্ভব হয়েছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের, আর তারই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল আচার-আচরণের বিভিন্ন বংশগত প্রতিক্রিয়া, এবং অনুকূল অবস্থায় এই দুয়ের মিলনই মানুষকে সমগ্র জীবজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের সঙ্গে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার তুলনা

সবচেয়ে অ-সভ্য মানুষ ও সবচেয়ে উচ্চশ্রেণির বানরদের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার ব্যাপক পার্থক্য—নির্দিষ্ট কিছু সহজাত প্রবৃত্তি—আবেগ—অনুসন্ধিৎসা—অনুকরণ—মনোনিবেশের ক্ষমতা—স্মৃতিশক্তি—কল্পনাশক্তি—যুক্তি—মস্তিষ্কের ক্রমবর্ধমান উন্নতি—জন্তু-জানোয়ার কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র—বিমূর্তায়ন, আত্মসচেতনতা—ভাবপ্রকাশের ভাষা—সৌন্দর্যবোধ—ঈশ্বরবিশ্বাস, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ, কুসংস্কার।

আগের দু'টি পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি মানুষের দেহে এমন কিছু স্পষ্ট চিহ্ন আছে যা থেকে সহজেই বলা যায় যে সে নিম্নশ্রেণির কোনও জৈবিক আকার থেকে ক্রমবিকশিত হয়েছে। কিন্তু তাহলে মানসিক ক্ষমতার বিচারে মানুষের সঙ্গে বাদবাকি প্রাণীদের এত পার্থক্য কেন? আমাদের সিদ্ধান্তে কোনও ভ্রান্তি হয়নি তো? সন্দেহ নেই তাদের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য বহুবিস্তৃত। এমনকী তুলনার ক্ষেত্র যদি একটি অত্যন্ত উন্নত জাতের বনমানুষ ও সবচেয়ে অনুন্নত মানবজাতির এমন একজন সভ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় যে চারের বেশি কোনও সংখ্যা গুণতে পারে না এবং প্রায় কখনওই কোনও সাধারণ বস্তু বা নিজের আবেগকে কোনও নির্দিষ্ট কথায় ব্যক্ত করতেও পারে না—তাহলে সেখানেও দেখব যে এই দুয়ের ব্যবধান অত্যন্ত ব্যাপক। কুকুর তার আদিরূপ নেকড়ে বা শিয়ালের তুলনায় যতটা উন্নত বা সভ্য হয়ে উঠেছে, উচ্চতর শ্রেণির বানররা যদি ততটাও উন্নত বা সভ্য হয়ে উঠত, তাহলেও এই পার্থক্যের ব্যাপকতায় কোনও হেরফের ঘটত না। আমরা জানি ফুজিয়ানরা সবচেয়ে অ-সভ্য বা অনুন্নত জাতিগুলির অন্যতম। কিন্তু এইচ. এম. এস. বিগ্‌ল্‌ নামক জাহাজে আমাদের সহযাত্রী তিনজন ফুজিয়ানকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। এরা কয়েক বছর ইংল্যান্ডে বসবাস করেছিল এবং অল্প অল্প ইংরেজিও বলতে পারত। আমাদের, অর্থাৎ সভ্য মানুষদের স্বভাব ও মানসিক গুণাবলির সঙ্গে এই তিনজনের প্রচুর সাদৃশ্য ছিল। যদি মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর মধ্যে মানসিক ক্ষমতার ব্যাপারটি আদৌ থাকত কিংবা নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের তুলনায় মানুষের মানসিক ক্ষমতাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হত, তাহলে আমরা কখনও বলতে পারতাম না যে আমাদের উচ্চ পর্যায়ের গুণগুলি ক্রমবিকাশের ফল। কিন্তু এটা প্রমাণিত সত্য মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের তুলনায় মানুষের মানসিক ক্ষমতাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হত, তাহলে আমরা কখনও বলতে পারতাম না যে আমাদের উচ্চ পর্যায়ের গুণগুলি ক্রমবিকাশের ফল। কিন্তু এটা প্রমাণিত সত্য যে মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে এই ধরনের কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই।

আবার এটাও সত্য যে মানুষ ও বানরের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার যতটা তফাত, তার চেয়ে ঢের বেশি তফাত রয়েছে অত্যন্ত নিম্নপ্রজাতির কোনও মাছ, যেমন ল্যাম্প্রে বা ল্যান্সলেট ইত্যাদির সঙ্গে উচ্চজাতের বানরদের। নিম্নশ্রেণির মাছ আর উচ্চশ্রেণির বানরের মাঝামাঝি স্তরে রয়েছে বিভিন্ন মাত্রার মানসিক ক্ষমতাযুক্ত অন্য সমস্ত প্রাণীকুল।

কোনও বর্বর মানুষ (বর্ষীয়ান নাবিক বায়রন যেমন একজন বর্বরের কথা জানিয়েছেন, যে তার শিশুপুত্রকে এক ঝুড়ি সামুদ্রিক শজারু ফেলে দেওয়ার অপরাধে পাথরে আছড়ে মেরে ফেলেছিল) এবং কোনও-একজন হাওয়ার্ড বা ক্লার্কসনের মধ্যেও নৈতিক স্বভাবের পার্থক্য খুব সামান্য নয়, ঠিক যেমন কদাচিৎ কোনও বিমূর্ত শব্দ উচ্চারণ করতে পারা বন্য লোকের সঙ্গে নিউটন বা শেক্স্পিয়ারের মননশীলতার পার্থক্যও সামান্য নয়। স্বভাবতই সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতির সর্বাপেক্ষা উন্নত মানুষদের সঙ্গে নিম্নতম পর্যায়ের বন্য মানুষদের এই ধরনের তফাত কতকগুলি সূক্ষ্মতম ধাপের ভিত্তিতে সম্পর্কযুক্ত। এবং সেইজন্যই এমনটা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে এই পার্থক্যগুলি ক্রমশ দূর হয়ে যাবে এবং তারা পরস্পরকে আরও মেলে ধরবে।

এই পরিচ্ছেদে আমার প্রধান লক্ষ্য হল এটা প্রমাণ করা যে মানুষ ও উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মানসিক কার্যকলাপের মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। এই আলোচনার প্রত্যেকটি বিভাগকে (পরিচ্ছেদের শুরুতে যে-ভাগগুলি করা হয়েছে) নিয়ে আলাদা আলাদা প্রবন্ধ লেখা যায়, কিন্তু তবু আমি এখানে বিষয়গুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব। যেহেতু এখনও পর্যন্ত মানসিক ক্ষমতার বিষয়ে কোনও সর্বজনগ্রাহ্য শ্রেণীবিভাজন করা যায়নি, তাই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায়েই আমার বক্তব্যকে সাজাব এবং সেইসমস্ত ঘটনাগুলিকেই বেছে নেব যেগুলি আমাকে সবথেকে বেশি নাড়া দিয়েছিল। আশা করি আমার পাঠকদের মনেও এগুলি সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে।

একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার তারতম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তার কিছু নমুনাও আমরা পেশ করব। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা অর্থহীন, কারণ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রকম পশু-পাখির সঙ্গে যুক্ত লোকজনের কাছে বারবার খোঁজখবর করে আমি জেনেছি তারা এ-ব্যাপারে সকলেই একমত যে প্রত্যেকটি মানসিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পশুপাখিদের একের সঙ্গে অপরের প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া আমার মনে হয় নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে প্রথম কীভাবে মানসিক ক্ষমতার উদ্ভব হয়েছিল, তা খুঁজতে যাওয়া প্রাণের উৎস খুঁজতে যাওয়ার মতোই অর্থহীন। এ-সব সমস্যা ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক—অবশ্য আগামী দিনের মানুষ আদৌ কোনওদিন এ-সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে কিনা, জানি না।

নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মতো মানুষও একই জ্ঞানেন্দ্রিয় ধারণ করে বলে তাদের মৌলিক স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানও এক হতে বাধ্য। মানুষের মধ্যে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মতো কিছু সহজাত প্রবৃত্তিও দেখা যায়, যেমন আত্মরক্ষা, যৌন আবেদন, সদ্যোজাত সন্তানের জন্য মাতার মাতৃত্ববোধ, শিশুর স্তন্যপানের ইচ্ছা ইত্যাদি। তবে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তার পরের ধাপে থাকা প্রাণীদের থেকে কম। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওরাংওটাং ও আফ্রিকার শিম্পাঞ্জিরা ঘুমোনোর জন্য গাছের ওপর ডালপালা দিয়ে পাটা (platform) তৈরি করে। যেহেতু উভয় প্রজাতি একই অভ্যাসের অনুবর্তী, তাই বলা যেতে পারে এর কারণ হচ্ছে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না এটা তাদের একই চাহিদা ও চিন্তাভাবনা করার একই রকম ক্ষমতার ফল কিনা। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই ধরনের বানররা (ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি) গ্রীষ্মমণ্ডলের বিষাক্ত ফল ছোঁয় না, কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন বোধের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আবার যখন আমাদের গৃহপালিত পশুদের সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনও জায়গায় নিয়ে গিয়ে চরে বেড়ানোর অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়, তখন তারা প্রায়শই ভুল করে বিষাক্ত গাছপালা খেয়ে ফেলে, কিন্তু পরে এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে। এক্ষেত্রেও বোধহয় আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না তারা কোন্ ফল খাবে আর কোন্‌টা খাবে না, সেটা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখা নাকি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করা। তবে, একটু পরেই আমরা দেখব যে এই বানরদের মধ্যে সাপ এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে একটা ভীতির ভাব থাকে, যা তাদের সহজাত। উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তি নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম ও অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির। ক্যুভিয়ের-এর মতে, সহজাত প্রবৃত্তি ও মেধা পরস্পর বিপরীত। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের বুদ্ধিগত উৎকর্ষ তাদের সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই ক্রমবিকশিত হয়েছে। কিন্তু পাউসেট তাঁর একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে এ-ধরনের কোনও বৈপরীত্য আদপেই সম্ভব নয়। কেননা যে-সমস্ত পোকামাকড় সবচেয়ে চমৎকার সহজাত ক্ষমতার অধিকারী, তারা সবচেয়ে বুদ্ধিমানও বটে। অন্যদিকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন মাছ বা উভচর ব্যাঙ ইত্যাদিরা জটিল সহজাত ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে এই ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য দাবিদার বিবর (Beaver) অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আশা করি মিঃ মর্গ্যানের অনবদ্য রচনার সঙ্গে পরিচিত পাঠকরা এ-ব্যাপারে সহমত পোষণ করবেন।

যদিও মিঃ হার্বার্ট স্পেন্সার মনে করেন যে বুদ্ধিমত্তার প্রাথমিক স্তরগুলি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার গুণন ও সংযোজন নীতির দ্বারা বিকশিত এবং যদিও অনেক প্রাথমিক সহজাত প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়েছে যেগুলিকে এখন আর আলাদা করে চেনা যাবে না, যেমন বাচ্চাদের স্তন্যপানের ইচ্ছা, তথাপি মনে হয় আরও জটিল সহজাত ক্রিয়াগুলি বুদ্ধিমত্তার থেকে স্বতন্ত্র কোনও উপায়েই বিকশিত

হয়েছে। তবে এটা আমি মোটেই অস্বীকার করতে চাই না যে সহজাত ক্রিয়াগুলি তাদের নির্দিষ্ট ও অপরিশীলিত চরিত্রকে পরিত্যাগ করতে পারে এবং স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হতে পারে। অন্যদিকে, কিছু বুদ্ধিগত ক্রিয়া বেশ কয়েক পুরুষ ধরে পালন করার ফলে সহজাত ক্ষমতায় উন্নীত হয় এবং বংশগত হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সমুদ্রসংলগ্ন দ্বীপসমূহের পাখিদের মানুষকে এড়িয়ে চলার ব্যাপারটা এভাবেই রপ্ত হয়েছে। সুতরাং এই কাজগুলিকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অবনতি বলা যেতে পারে, কারণ এগুলি আর যুক্তি বা অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। কিন্তু আরও জটিল সহজাত ক্রিয়াগুলির একটি বড় অংশই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপায়ে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সহজ সহজাত ক্রিয়ায় ক্রমপরিবর্তিত হয়। এই ধরনের ক্রমপরিবর্তনগুলি হয়তো একইরকম অজ্ঞাত কোনও কারণে মস্তিষ্কের সেইসব অংশের ক্রিয়াবশত উৎপন্ন হয় যেগুলি শরীরের অন্যান্য অংশে সামান্য বৈসাদৃশ্য বা ভিন্ন ভিন্ন পার্থক্যের জন্য দায়ী। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার দরুন প্রায়শই আমরা বলে দিই যে এই ক্রমপরিবর্তনগুলি আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয় জটিলতর সহজাত প্রবৃত্তির উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা এছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্ত করতে পারি না। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম শ্রমিক-পিঁপড়ে ও মৌমাছিদের চমৎকার সহজাত ক্ষমতার কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যেহেতু তারা সকলেই সন্তান উৎপাদনে অপারগ, তাই তাদের সন্তানদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তিত অভ্যাসের বংশগত প্রভাব পড়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

পূর্বোল্লিখিত পোকামাকড় ও বিবরদের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি—বুদ্ধির উচ্চ মাত্রা নিঃসন্দেহে জটিল সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ (প্রথমে স্বতঃপ্রবৃত্ত শিক্ষাগ্রহণ করলেও) শীঘ্রই প্রতিবর্তী ক্রিয়ার দ্রুত ও নিশ্চিত অভ্যাসের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। তথাপি এমনটা হয়তো অসম্ভব নয় যে সাবলীল বুদ্ধিমত্তা ও সহজাত ক্রিয়ার বিকাশের মধ্যে কিছু প্রতিবন্ধক কাজ করে, যা পরবর্তী সময়ে মস্তিষ্কের কিছু বংশগত উন্নত পরিবর্তনের জন্য দায়ী। মস্তিষ্কের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত হলেও এটা বোঝা যায় যে বুদ্ধিগত ক্ষমতা যথেষ্ট উন্নত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের নানা অংশ অবশ্যই আন্তঃযোগাযোগ রক্ষাকারী কতকগুলি জটিল মাধ্যম দ্বারা সংযুক্ত হয়, এবং তার ফলে সম্ভবত এর প্রতিটি পৃথক পৃথক অংশ কোনও নির্দিষ্ট ও বংশগত রীতি অনুযায়ী, অর্থাৎ সহজাত ক্রিয়া অনুযায়ী, বিশেষ কোনও সংবেদন বা সংস্পর্শে সাড়া দিতে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এমনকী মনে হয় স্বল্পমাত্রার বুদ্ধির সঙ্গে নির্দিষ্ট কিন্তু বংশগত নয় এমন অভ্যাস গঠনে জোরালো প্রবণতার একটা সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক আমাকে জানিয়েছিলেন, সামান্য নির্বোধ ব্যক্তিরা যে-কোনও কাজ নিয়মমাফিক বা অভ্যাসমতো করতে ভালবাসে এবং এ-ব্যাপারে উৎসাহ পেলে তাদের খুশির আর অন্ত থাকে না।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেও আমাদের বর্তমান আলোচনাটা করা এই জন্যে দরকার যে, উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের, বিশেষত মানুষের, মানসিক ক্ষমতাকে আমরা সহজেই কমিয়ে দেখতে পারি, যখন তাদের কাজকর্মগুলিকে পূর্বে-ঘটে-যাওয়া কোনও বিষয়ের স্মৃতি, দূরদৃষ্টি, যুক্তি ও কল্পনার ভিত্তিতে এবং নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের সহজাত ক্ষমতার দ্বারা সম্পাদিত একইরকম কাজের সঙ্গে তুলনা করতে বসি। একইসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের এই কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা একদিনে অর্জিত হয়নি, তা সম্ভব হয়েছে তাদের মস্তিষ্ক ও প্রাকৃতিক নির্বাচনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এবং তার জন্য তাদের ক্রমোত্তর বংশধরদের কোনও সচেতন বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের দরকার হয়নি। মিঃ ওয়ালেসের যুক্তি অনুযায়ী নিঃসন্দেহে বলা যায়—মনুষ্যকৃত বেশিরভাগ বুদ্ধিমত্তার কাজই যুক্তিনির্ভর নয়, সেখানে অনুকরণই প্রধান। কিন্তু মানুষের কাজ আর নিম্নশ্রেণির প্রাণী কর্তৃক সম্পাদিত অনেক কাজের মধ্যে এই পার্থক্য বেশ বড় রকমের। যেমন, মানুষ একবারের চেষ্টাতেই শুধুমাত্র অনুকরণের সাহায্যে পাথরের কুড়ুল বা ডোঙা তৈরি করতে পারে না, অভ্যাস বা অনুশীলনের দ্বারা তাকে নিজের কাজ আয়ত্ত করতে হয়। অন্যদিকে, প্রায় প্রথম চেষ্টাতেই জলের হাত থেকে বাঁচতে, মাটির ঢিপি বা যাতায়াতের জন্য সুড়ঙ্গ তৈরি করতে পারে বিবররা। পাখিদের চমৎকার বাসা তৈরি করা বা মাকড়সার সুন্দর জাল বোনার জন্যও পূর্ব-অভিজ্ঞতা বা অভ্যাসের দরকার হয় না, প্রথম চেষ্টাতেই এগুলি গড়তে পারে তারা।

এবার আমাদের বর্তমান আলোচনায় ফিরে আসা যাক। নিম্নশ্রেণির প্রাণীরা স্পষ্টতই মানুষের মতো সুখ-দুঃখ ও বিষাদ অনুভব করে থাকে। আমাদের শিশুদের মতো কুকুর, বেড়াল বা ভেড়ার বাচ্চারা যখন একসঙ্গে খেলা করে, তখন বোঝা যায় আনন্দের এর চেয়ে চমৎকার বহিঃপ্রকাশ আর কিছুই হতে পারে না। এমনকী পোকামাকড়েরাও এইভাবে খেলার মাধ্যমে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে। এটা আমার কথা নয়, সুদক্ষ পর্যবেক্ষক পি. হুবার-ই তাঁর রচনার মধ্যে এই ব্যাপারটা উল্লেখ করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন পিঁপড়েরা একে অপরকে তাড়া করে এবং কামড়াবার ভান করে, ঠিক যেমনটা আমরা অনেক বাচ্চা কুকুরদের মধ্যে দেখে থাকি।

নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে যে আমাদের মতো একই আবেগের দরুন উত্তেজনা দেখা দেয়, তার অসংখ্য প্রমাণ আছে এবং সেইজন্য এ-বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে পাঠককে আর নাই-বা বিরক্ত করলাম। ভয়ের ব্যাপারটিও এদের মধ্যে আমাদের মতো একইরকমভাবে কাজ করে—মাংসপেশী কাঁপতে থাকে, বুক ধড়ফড় করে, মলদ্বারের পেশী প্রসারিত হয় এবং দেহের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। তাছাড়া অধিকাংশ বন্য প্রাণীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ভয়জনিত সন্দেহপ্রবণতা। স্যর ই. টেনেন্ট কর্তৃক উল্লিখিত পোষা মাদি-হাতি কর্তৃক বন্য হাতিদের প্রবঞ্চনা করে ফাঁদে ফেলার ব্যাপারটা মেনে নেওয়া অসম্ভব, যদি-না আমরা এটা স্বীকার করে নিই যে

হাতিটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই প্রবঞ্চনা অভ্যাস করেছে এবং কী করতে যাচ্ছে সেটা বেশ ভালভাবেই জানা আছে তার। একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে সাহসিকতা বা ভীরুতার সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ঘটে থাকে, যেমনটি সাধারণভাবে আমরা আমাদের কুকুরদের মধ্যে দেখে থাকি। কোনও কোনও কুকুর বা ঘোড়া বেশ খিটখিটে মেজাজের ও স্বভাবতই বিষণ্ণ প্রকৃতির, আবার অন্যদের মেজাজ বেশ চমৎকার। এইসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য বংশগত সূত্রেই অর্জিত হয়। অনেকেই হয়তো লক্ষ করে থাকবেন প্রাণীরা মাঝে মাঝে কেমন সাংঘাতিক রেগে গিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এ-বিষয়ে বিভিন্ন প্রাণীদের দীর্ঘবিলম্বিত ও সুচতুর প্রতিহিংসা সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান প্রকাশিত হয়েছে এবং সম্ভবত এগুলো সত্যিও। রেঙ্গার ও ব্রেহ্‌ম্‌[১] জানিয়েছেন, যে-সমস্ত আমেরিকান ও আফ্রিকান বানরকে তাঁরা পোষ মানাতে সমর্থ হয়েছিলেন সেগুলি একসময় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। প্রাণীতত্ত্ববিদ স্যর অ্যানড্রু স্মিথ, যিনি গবেষণাকর্মের জন্য সুপরিচিত, তিনি আমাকে তাঁর নিজের চোখে দেখা একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এ-রকম : উত্তমাশা অন্তরীপে একজন অফিসার প্রায়শই একটি বেবুনকে নানাভাবে বিরক্ত করত। কোনও-এক রবিবার চমৎকার পোশাক পরে সেই অফিসারটিকে প্যারেডের জন্য আসতে দেখেই বেবুনটি একটি গর্তের মধ্যে জল ঢেলে দ্রুত কিছুটা ঘন কাদা তৈরি করে ফেলে এবং সেখান দিয়ে যাবার সময় সেই কাদা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে অফিসারটির গায়ে ছুঁড়ে মারে যা অনেক পথচারীর কাছেই মজার উপাদান হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে বেবুনটি যখনই ওই অফিসারটিকে দেখতে পেত, তখনই আনন্দে হাত-পা ছুঁড়ে উল্লাস প্রকাশ করত।

কুকুরের প্রভুভক্তি অতুলনীয়। একজন প্রাচীন লেখক বেশ সুন্দর করে বলেছেন, 'পৃথিবীতে কুকুরই একমাত্র জীব যে তার নিজের চেয়েও তোমাকেই (প্রভুকে) বেশি ভালবাসে।'

এমনকী মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও কুকুর তার প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে বিজ্ঞানের কাজে জীবন্ত কুকুরের অঙ্গচ্ছেদ করে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এইরকম একটি পরীক্ষার সময় একটি কুকুর তার প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও সেই পরীক্ষকের হাত চেটে দিতে ভুল করেনি, আর তাই সেই পরীক্ষকের কাজটি আমাদের জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য যতই ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হোক না কেন বা তাঁর হৃদয় যতই পাষাণ হোক না কেন, জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি তাঁর এই কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে বাধ্য।

১। উল্লিখিত সমস্ত বিবৃতি এই দুই প্রাণীতত্ত্ববিদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধৃত। দ্রঃ, রেঙ্গারের 'Naturgesch. der saugethiere von paraguay', পৃঃ ৪১-৫৭, এবং ব্রেহ্‌মের 'Thierleben', বি. ১, পৃঃ ১০-১৭।

হোয়েল একটি চমৎকার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, 'যে ব্যক্তি প্রায় সকল মানবজাতির স্ত্রীলোক ও সমস্ত জীবজগতের স্ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মাতৃস্নেহের হৃদয়স্পর্শী দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি কি সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন যে উভয় ক্ষেত্রে (মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী) এই স্নেহের মূলনীতি এক নয়?' একটু লক্ষ করলেই আমরা দেখতে পাব মাতৃস্নেহের ব্যাপারটা কত সামান্য ঘটনার মধ্যেই মূর্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে রেঙ্গারকে স্মরণ করা যাক। তিনি একবার দেখেছিলেন সেবুস জাতের একটি আমেরিকান মেয়ে-বানর তার বাচ্চার গায়ে এসে বসা মাছিদের ব্যগ্রভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছে। অধ্যাপক ডুভোসেলের একটি অভিজ্ঞতার কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি হাইলোবেত্‌স্ জাতের এক বানর-মাকে নদীর জল দিয়ে তার বাচ্চাদের মুখ ধুইয়ে দিতে দেখেছিলেন। সন্তানবিয়োগে বানর-মায়েদের দুঃখ এত গভীর হয় যে—অধ্যাপক ব্রেহ্‌ম্ উত্তর-আফ্রিকার এই ধরনের কিছু বানরকে আটকে রেখে দেখেছেন—সেই শোকে তারা মারা পর্যন্ত যায়। তাছাড়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার বানরই অনাথ বানর-বাচ্চাদের ভার নেয় এবং বেশ যত্নের সঙ্গেই তাদের দেখাশোনা করে। একটি মেয়ে-বেবুনের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। সে এমনই উদার ছিল যে শুধুমাত্র অন্য প্রজাতির বাচ্চা-বানরদের ভারই নিত না, বরং হামেশাই কুকুর ও বিড়ালছানাও চুরি করত এবং সবসময় তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াত। অবশ্য এই বাচ্চাদের সে তার নিজের খাবারের ভাগ দিত না। বিষয়টি ব্রেহ্‌মের কাছে একটু অস্বাভাবিকই মনে হয়েছিল, কারণ তাঁর পোষা বানররা সবকিছুই (খাবার) তাদের বাচ্চাদের মধ্যে সুন্দরভাবে ভাগ করে দিত। এই বেবুনটি সম্পর্কে আরও জানা যায় যে একবার সংগৃহীত বাচ্চাদের মধ্যে একটি বেড়ালছানা তাকে নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছিল। এ-রকম আঁচড়ের জন্য প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও বেবুনটি ছিল যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। অচিরেই বেড়ালছানাটির পায়ের থাবা পরীক্ষা করে বিষয়টি বোধগম্য হতে সে দাঁত দিয়ে তার নখ কেটে সমস্যার সমাধান করেছিল।[২] চিড়িয়াখানার ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মচারীর কাছ থেকে আমি শুনেছি, একটি বুড়ি বেবুন (সি. চাক্‌মা) রেহ্‌সাস্ জাতের একটি বাচ্চা বানরের দেখাশোনা করত। কিন্তু যখন ড্রিল ও ম্যানড্রিল জাতের দু'টি বাচ্চা বানরকে ওই খাঁচার মধ্যে রাখা হল, ভারী আশ্চর্যজনক যে, সে রেহ্‌সাস্ বাচ্চাটিকে বাদ দিয়ে পরে আসা বাচ্চা দু'টির প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করল। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছিল ওই দু'টি অন্য প্রজাতিভুক্ত হলেও তার প্রায় সমগোত্রীয়। আর সেই বাচ্চা রেহ্‌সাস্‌টি এইভাবে স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে সবসময় মনমরা হয়ে থাকত। শোনা কথা নয়, আমি

২। একজন সমালোচক কোনওরকম যুক্তি ছাড়াই ব্রেহ্‌ম্ কর্তৃক উল্লিখিত এ-রকম কাজের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, আমাকে হেনস্থা করা। সেইজন্য আমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছি, পাঁচ সপ্তাহ বয়সের কোনও বিড়ালছানার পায়ের ধারালো নখগুলি আমার দাঁত দিয়ে কাটা খুব শক্ত কোনও কাজ নয়।

নিজের চোখে দেখে এসেছি সুযোগ পেলেই সে ড্রিল ও ম্যানড্রিল প্রজাতির বাচ্চা দু'টিকে বিরক্ত করত ও আক্রমণ করত এবং এর ফলে বুড়ি বেবুনটি রেহ্‌সাস্‌টির প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করত। তাছাড়া, ব্রেহ্‌মের মতে, বানররাও তাদের প্রভুদের বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। শুধু তা-ই নয়, যে-কুকুরদের সঙ্গে তারা একত্রে থাকে (একই প্রভুর অধীনে), তাদেরকেও রক্ষা করার জন্য অন্য কুকুরদের আক্রমণ প্রতিহত করে তারা। কিন্তু আমরা এখানে সহানুভূতি ও আনুগত্যের বিষয়গুলিকেই খতিয়ে দেখতে চাইছি, তাই সেই প্রসঙ্গেই ফিরে যাওয়া যাক। এখানে ব্রেহ্‌মের ওই পোষা বানরদের কথা আবার বলতে হচ্ছে। তারা তাদের অপছন্দের কোনও বুড়ো কুকুর বা অন্যান্য প্রাণীকে নানান ফন্দিফিকিরের সাহায্যে উত্ত্যক্ত করে তুলত এবং তাতে প্রচুর মজাও পেত।

অধিকাংশ জটিলতর মানসিক আবেগ মানুষ ও উন্নত শ্রেণির জীবজন্তুদের মধ্যে একই রকম। প্রায় সকলেই জানেন একটি কুকুর কতখানি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে যদি সে দেখে তার প্রভু অন্য কোনও প্রাণীকে আদর করছে। বানরদের মধ্যেও এই বিষয়টি লক্ষ করেছি আমি। এ থেকে বোঝা যায় জীবজন্তুরা শুধু যে অপরকে ভালবাসে এমন নয়, অপরের ভালবাসা পেতেও চায়। স্পষ্টতই তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আস্থাশীল। কোনও কাজের জন্য প্রভুর সম্মতি বা প্রশংসা পেতে তারা ভীষণ আগ্রহী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, যখন কোনও কুকুর তার প্রভুর জন্য সামান্য একটি ঝুড়িও বয়ে আনে, তখন তাকে অত্যন্ত আত্মতুষ্ট বা গর্বিত দেখায়। আবার খাবার সম্বন্ধে কুকুরদের লজ্জা পাওয়ার বিষয়টি আমার কাছে ভয়জনিত কোনও কারণ বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় তা এমন-কিছু যার সঙ্গে মানুষের খাবার ভিক্ষা করার লজ্জা জড়িয়ে আছে। আমরা অনেকেই দেখেছি যে ভাল জাতের কুকুররা নেড়ি কুকুরদের বাজে রকমের ডাককে অবজ্ঞা করে। এটাকে মহানুভবতা ছাড়া আর কী বলা যায়! প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বানররা উপহাস একদম পছন্দ করে না। তাই মাঝেমাঝে তাদের শত্রুর উদ্দেশ্যে কাল্পনিক আক্রমণ শানাতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আমার দেখা চিড়িয়াখানার একটি বেবুনের কথা বলা যেতে পারে। তার দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত লোকটি কোনও চিঠি বা বই নিয়ে জোরে জোরে তার সামনে পড়লে সে ভীষণ রেগে যেত এবং তার রাগ এমন সাংঘাতিক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছত যে সে কামড়ে নিজের পা থেকে রক্ত বার করে ফেলত। কুকুররা প্রায়শই চমৎকার রসবোধের পরিচয় দিয়ে থাকে। একে নিছক খেলা হিসেবে দেখলে একটু ভুল হবে। কোনও ছোট দণ্ডাকার বস্তু বা ওই জাতীয় অন্য কিছু এদের একজনের কাছে ছুঁড়ে দিলে সে ওটাকে কিছু দূর অবধি নিয়ে যায়, তারপর জিনিসটা নিজের সামনে রেখে উবু হয়ে বসে। জিনিসটা নেওয়ার জন্য তার প্রভু তার কাছে না-আসা পর্যন্ত ওই অবস্থাতেই বসে থাকে সে এবং প্রভু কাছে এলেই ওটাকে

নিয়ে দৌড়ে দূরে পালিয়ে যায়। কুকুরটি বার বার এই একই কাজ করে চলে। আসলে এতে করে সে দারুণ মজা পায়।

এবার আমরা অধিকতর বুদ্ধিসঞ্জাত আবেগ ও কাজকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব। উন্নত মানসিক ক্ষমতার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বনিয়াদ গঠনে এগুলি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণত জীবজন্তুরা কোনও প্রকার উত্তেজনাকে দারুণ মজার সঙ্গে গ্রহণ করে। ক্লান্তি বা অবসাদের বিষয়টিও তাদের মধ্যে যথেষ্টই চোখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ কুকুর বা অধ্যাপক রেঙ্গারের মতানুযায়ী বানরের নাম করা যায়। আবার প্রায় সমস্ত জীবজন্তুই বিভিন্ন বিষয়ে বিস্ময় বোধ করে থাকে এবং তাদের অনেকের মধ্যে কৌতূহলস্পৃহাও বর্তমান। এই কৌতূহলস্পৃহার জন্য অনেক সময় কঠিন মূল্য দিতে হয় তাদের। যেমন, শিকারিদের নানান ছলাকলায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক জন্তু প্রাণ পর্যন্ত হারায়। কিছু হরিণ, অপেক্ষাকৃত সতর্ক কৃষ্ণসার হরিণ এবং কয়েক প্রকার পাতিহাঁসের মধ্যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি আমি। ব্রেহ্‌ম্ তাঁর পোষা বানরদের সাপ সংক্রান্ত কিছু সহজাত ভীতির তথ্য পেশ করেছেন। কিন্তু তাদের কৌতূহল এত বেশি ছিল যে মাঝেমাঝে তারা প্রায় মানুষের মতোই ভয় ভুলে সাপ-রাখা বাক্সটার ডালা তুলে দেখার চেষ্টা করত—ব্যাপারটা কী। এই ঘটনা আমাকে এতই বিস্মিত করেছিল যে আমি মৃত সাপের একটি গুটোনো চামড়া চিড়িয়াখানায় অবস্থিত বানরদের বাসগৃহে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম এবং তার ফলে সৃষ্ট উত্তেজনার ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এদের মধ্যে সার্কোপিথেকাস প্রজাতির তিনটি বানর সবচাইতে সাবধানি ছিল। তারা বিপদ বুঝে নিজেদের খাঁচা ধরে ধাক্কা দিতে শুরু করল এবং তীক্ষ্ণ চিৎকারে অন্যদের জানিয়ে দিল—বিপদ আসছে। অন্য বানরেরা সহজেই বুঝে নিল ব্যাপারটা। শুধু কয়েকটি বাচ্চা বানর আর আনুবিস প্রজাতির একটি বয়স্ক বেবুন সাপটির প্রতি উদাসীন ছিল। এরপর আমি সেই সর্পাকৃতি চামড়াটি বড় বড় খোপগুলির একটির মেঝেতে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে সব বানরেরা সেটিকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল এবং দেখতে লাগল। বেশ হাস্যকর দৃশ্য। দেখতে দেখতে তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠল। যে কাঠের বলকে তারা খেলার সামগ্রী হিসেবে জানে, ঘটনাক্রমে সেই রকম একটা বল খড়ের মধ্যে নড়ে উঠলে (বলটা খড়ে আংশিক চাপা পড়েছিল) তারা তৎক্ষণাৎ ভয়ে পিছিয়ে গেল। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, মরা মাছ, ইঁদুর, জ্যান্ত ঘুঘুপাখি বা সম্পূর্ণ নতুন কোনও জিনিস এইসব বানরের খাঁচায় রাখলে এরা একেবারেই অন্যরকম আচরণ করে থাকে। হ্যাঁ, প্রথমটায় তারা কিছুটা ঘাবড়ে যেত বটে, কিন্তু অচিরেই কাছে গিয়ে ভাল করে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করত। এবার আমার পরীক্ষার অবশিষ্টাংশটুকু বলা যাক। এবার আর মরা সাপ বা তার চামড়া নয়, একটা জ্যান্ত সাপকে কাগজের ঠোঙায় ভরে, ঠোঙার মুখটা সামান্য মুড়ে, বড় খোপগুলোর একটাতে রেখে দিয়েছিলাম আমি। একটি বানর তৎক্ষণাৎ কাছে এসে ঠোঙার মুখটি

সামান্য খুলে মুখ নামিয়ে দেখল এবং তৎক্ষণাৎ ছিটকে সরে গেল। পরের ঘটনা ব্রেহ্‌মের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে গেল। একটির পর একটি বানর মাথাটা ওপরের দিকে তুলে, কাঁধের একপাশে হেলিয়ে, খাড়া করে রাখা ঠোঙার মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর বস্তুটির দিকে এক পলকের জন্য হলেও এসে দেখতে লাগল, দেখার কৌতূহলকে কিছুতেই দমন করতে পারল না তারা। এ থেকে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে প্রাণীতত্ত্বগত সাদৃশ্যের ব্যাপারে বানরদের কিছু ধারণা আছে। কেননা, ব্রেহ্‌মের পোষা বানরদের মধ্যে অক্ষতিকারক টিকটিকি, গিরগিটি বা ব্যাঙ সম্পর্কে একটি আশ্চর্য সহজাত ভয় (অমূলক হলেও) লক্ষ করা গেছে। এমনকী একটি ওরাং-ওটাংও একবার একটা ঘুঘুকে প্রথমবার দেখে বেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

মানুষ, বিশেষত বন্য বা অ-সভ্য মানুষদের মধ্যে অনুকরণ-প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। মস্তিষ্কের কোনও রোগ দেখা দিলে এই প্রবণতা অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে যায়। দেখা গেছে, হেমিপ্লেজিয়া রোগগ্রস্ত কোনও কোনও ব্যক্তি বা অন্যরা মস্তিষ্কের স্নায়বিক কর্মের অবনতি হেতু প্রবল উত্তেজনার শুরুতে অসচেতনভাবে তাদের সামনে বলা প্রত্যেকটি কথা নকল করে যায়, তাদের মাতৃভাষা বা অজ্ঞাত কোনও ভাষা যে-ভাষাতেই কথা বলা হোক না কেন, অনুকরণ অব্যাহত থাকে। শুধু তা-ই নয়, তাদের সামনে উপস্থিত অন্যদের অঙ্গভঙ্গি বা দৈহিক সঞ্চালন নকল করতেও বাদ দেয় না তারা। ডেজর বলেছেন, কোনও জীবজন্তু স্বেচ্ছায় মানুষের কাজের নকল করে না, একমাত্র বানর ছাড়া—যারা হাস্যোদ্দীপক ব্যঙ্গকার হিসেবে সুবিদিত। জীবজন্তুরা কখনও কখনও একে অপরকে নকল করে থাকে। দেখা গেছে, কুকুরদের মধ্যে লালিত-পালিত হওয়া দু'টি নেকড়ে কুকুরের মতো ডাকতে শুরু করেছিল। কোনও কোনও সময় শিয়ালরাও কুকুরের মতো ডেকে থাকে। তবে এটিকে স্বেচ্ছাকৃত অনুকরণ বলা যাবি কি না, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। আবার পাখিরা তাদের পিতা-মাতার স্বর নকল করে গাইতে শেখে। মাঝেমাঝে অন্য পাখিদেরকেও অবশ্য তারা নকল করে থাকে। তোতাপাখিরা এ-বিষয়ে খুব ওস্তাদ। তারা যে-কোনও শব্দ মাত্র কয়েকবার শুনেই নিজেদের গলায় তুলে নিতে পারে। দ্যিউরো দ্য লা ম্যাল একটি কুকুরের কথা বলেছেন। কুকুরটি এক বিড়াল-মায়ের রক্ষণাবেক্ষণে বড় হওয়ায় তার প্রতিপালিকার মতো পায়ের থাবা চাটতে এবং মুখ ও কান পরিষ্কার করতে শিখেছিল। প্রখ্যাত প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ অডুইন্-ও এই ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি নিজে এটা প্রত্যক্ষ না করলেও অন্য কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য হাতে পেয়েছি। এগুলির একটি এ-রকম : একটি কুকুর এক বিড়াল-মায়ের দুধ না খেলেও তার বাচ্চাদের সঙ্গে একত্রেই বড় হয়েছিল। এই কুকুরটিও পায়ের থাবা চাটতে আর মুখ ও কান পরিষ্কার করতে শিখেছিল এবং তার জীবদ্দশার তেরো বছর ধরে এই অভ্যাস সে চালিয়ে গেছে। দ্যিউরো দ্য লা ম্যালের কুকুরটিও বিড়ালছানাদের কাছ থেকে অনুরূপভাবে শিখেছিল কীভাবে একটি বল সামনের থাবা দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং কীভাবে তার ওপর উঠে দাঁড়াতে হয়। জনৈক পত্রলেখক আমাকে জানিয়েছেন,

তাঁর বাড়িতে একটি মেয়ে-বিড়াল দুধ খাওয়ার সময় তার থাবাটা দুধের পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিত, কারণ তার মাথার তুলনায় মুখটা ছিল খুবই ছোট। এই বিড়ালটির একটি বাচ্চাও অচিরেই কৌশলটি আয়ত্ত করে নিয়েছিল এবং সুযোগ পেলেই অর্জিত বিদ্যাটি প্রয়োগ করত সে।

বিভিন্ন জীবজন্তুর বাচ্চাদের অনুকরণ-প্রবণতা, বিশেষ করে তাদের সহজাত বা বংশগত প্রবণতার কথা মনে রেখে বলা যায় যে তাদের বাপ-মা-ই তাদেরকে এগুলি শেখায়। এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বোঝা যায় যখন দেখি কোনও বিড়াল-মা তার বাচ্চাদের কাছে জ্যান্ত ইঁদুর নিয়ে যাচ্ছে। কিংবা ধরা যাক দ্যিউরো দ্য লা ম্যালের বাজপাখিদের উপর পরীক্ষিত কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যটি। তিনি বলেছেন যে এই বাজপাখিরা তাদের বাচ্চাদের নানান কৌশল শেখাত, দূরত্ব পরিমাপের বিদ্যা শেখাত। প্রথমে তারা শূন্যে মুখ থেকে মরা ইঁদুর ও চড়ুই পাখি ছেড়ে দিয়ে ধরতে শেখাত, যদিও বেশিরভাগ সময় বাচ্চা-বাজপাখিরা সেগুলি ধরতে ব্যর্থ হত, এবং তারপর জ্যান্ত পাখি এনে ছেড়ে দিয়ে শিকার করতে শেখাত।

মানুষের বুদ্ধিগত বিকাশের ক্ষেত্রে 'মনঃসংযোগ' একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তুদের মধ্যেও এই ক্ষমতাটি স্পষ্টতই বর্তমান। ইঁদুরের গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বিড়ালের প্রস্তুতি এই মনঃসংযোগেরই নিদর্শন। আবার কখনও কখনও বন্য জন্তুরা শিকারের অপেক্ষায় এমনই অভিনিবিষ্ট থাকে যে তখন তাদেরকে সহজেই বন্দী করা যায়। মিঃ বার্টলেট আমাকে এই বিষয়ে বানরদের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত একটি চমৎকার তথ্য জানিয়েছেন। এক ভদ্রলোক জুলজিক্যাল সোসাইটির কাছ থেকে সাধারণ মানের বানর কিনতেন নাটকে অভিনয় করার জন্য শিক্ষা দেবেন বলে। প্রত্যেকটি বানরের জন্য পাঁচ পাউন্ড করে দাম দিতেন তিনি। একবার তিনি প্রস্তাব দেন—তিন-চারটি বানরকে কয়েক দিন নিজের কাছে রেখে তাদের মধ্যে থেকে কোনও-একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ তাঁকে দেওয়া হলে প্রতিটি বানরের জন্য দ্বিগুণ দাম দেবেন তিনি। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কীভাবে তাঁর পক্ষে এত তাড়াতাড়ি বোঝা সম্ভব যে কোন্ বানরটি ভাল অভিনেতা হতে পারে, তখন জবাবে তিনি বলেছিলেন—সমস্তটাই নির্ভর করে তাদের (বানরদের) মনঃসংযোগের ক্ষমতার ওপর। ব্যাপারটা একটু খুলে বললে এ-রকম দাঁড়ায় : কোনও বানরের সঙ্গে তাঁর কথা বলা বা কোনও-কিছু ব্যাখ্যা করার সময় বানরটির দৃষ্টি দেওয়ালে বসা কোনও মাছি বা অন্য কোনও বস্তুতে আকৃষ্ট হলে তিনি বুঝতেন—একে দিয়ে কিছু হবে না। এমনকী তিনি তাদের অমনোযোগিতার জন্য শাস্তি দিয়ে শোধরাতেও চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। উৎসাহিত হওয়ার বদলে আরও চুপচাপ হয়ে পড়ত তারা। অন্যদিকে, যে-সব বানর তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে শুনত বা লক্ষ করত, তাদের সবসময়েই নানান জিনিস শেখানো যেত।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জীবজন্তুদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি বা স্থান সম্পর্কে চমৎকার স্মৃতিশক্তি কাজ করে। স্যার অ্যানড্রু স্মিথের কাছ থেকে আমি শুনেছি যে উত্তমাশা অন্তরীপের একটি বেবুন তাঁকে ন' মাস পরে দেখেও চিনতে পেরেছিল এবং আনন্দ প্রকাশ করেছিল। আমার নিজের একটি কুকুর ছিল। তার স্বভাবটা ছিল বুনো, অপরিচিত কাউকে দেখলেই খেঁকিয়ে উঠত। একবার একটানা পাঁচ বছর দু'দিন তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ থাকার পর আমি তার বাসস্থানের কাছে গিয়ে পুরনো অভ্যাসমতো চিৎকার করে তাকে ডাকলাম। তার মধ্যে উৎফুল্ল ভাব দেখা না গেলেও সে আমার পিছু পিছু চলতে শুরু করল এবং এমনভাবে আমার নির্দেশ পালন করতে লাগল যেন মাত্র আধঘণ্টার জন্য আমি তাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম। স্পষ্টতই গত পাঁচ বছর ধরে পুরনো অভ্যাসগুলি তার মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল, এখন মুহূর্তের মধ্যেই তা জেগে উঠেছে। পি. হুবার স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে এমনকী পিঁপড়েরাও চার মাস বিচ্ছেদের পর তাদের একই সম্প্রদায়ভুক্ত সহযোগীদের চিনতে ভুল করে না। জীবজন্তুরা নিশ্চয়ই পুনরাবর্তক ঘটনাগুলির অন্তর্বর্তী সময়-বিরতিকে কোনও-না-কোনওভাবে বুঝে নিতে পারে।

মানুষের অত্যন্ত উন্নত ক্ষমতাগুলির অন্যতম হচ্ছে 'কল্পনাশক্তি'। এর সাহায্যে সে ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবেই তার পূর্ববর্তী কোনও ধারণা ও ভাবনাকে সংযুক্ত করতে পারে আর এভাবেই গড়ে ওঠে উৎকৃষ্ট এবং মহান সৃষ্টিসমূহ। জাঁ পল রিশ্‌টার বলেছেন, 'একজন কবি যখন তাঁর কাব্যের মধ্যে সৃষ্ট কোনও শয়তান চরিত্র কখন হ্যাঁ অথবা না বলবে তা নিয়ে ভাবতে বসেন, তখন তাকে অর্থহীন মৃত চিন্তা চূড়া আর কী-ই বা বলা যায়!' স্বপ্ন দেখার বিষয়টি থেকে মানুষের এই ক্ষমতাটির চমৎকার ধারণা পাওয়া যেতে পারে, কেননা, জাঁ পলের কথাতেই, 'স্বপ্ন হল কবিতার একটি স্বয়ংচালিত ক্রিয়া।' তাই বলা যায়, কল্পনাশক্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতা যেমন আমাদের ধারণার সংখ্যা, যথার্থ ও স্পষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করে, ঠিক তেমনি নির্ভর করে অনৈচ্ছিক যোগাযোগকে গ্রহণ বা বর্জন করার বিচারক্ষমতা ও রুচির ওপর এবং আমাদের স্বেচ্ছাকৃত ক্ষমতা দ্বারা এগুলিকে যুক্ত করার ওপরেও এই উদ্ভাবনী ক্ষমতা খানিকটা নির্ভরশীল। কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া এবং সম্ভবত সমস্ত উন্নত শ্রেণির জীবজন্তুরা, এমনকী পাখিরাও[৩] স্বপ্ন দেখে থাকে, ঘুমোনোর সময় তাদের শারীরিক আন্দোলন ও মুখ থেকে উচ্চারিত আওয়াজই তাদের স্বপ্ন দেখার প্রমাণ দেয়। তাদের যে কিছুটা কল্পনাশক্তি আছে, তা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। আবার রাত্রিবেলা, বিশেষ করে চাঁদনি রাতে, কুকুরের করুণ সুরে চিৎকার করার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও

৩। হাউজো বলেছেন যে তাঁর প্যারোকিট ও ক্যানারি পাখিগুলি স্বপ্ন দেখত। দ্রঃ 'Faculte's Mcstales', tom. ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬।

বিশেষ কারণ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমরা এই চিৎকারকে কুকুরের গম্ভীর ধ্বনি বলে থাকি। তা বলে সমস্ত কুকুরই যে এমন করে, তা নয়। হাউজো-র মতে, কুকুররা চাঁদের দিকে মোটেই তাকায় না, বরং তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে দিগন্তে মেশা আকাশের কোনও-এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে। তাছাড়াও তিনি মনে করেন, চারপাশের নানান অস্পষ্ট ছবি তাদের কল্পনাশক্তির পথ আটকে দাঁড়ায়, ফলে তাদের মনের মধ্যে নানান আজগুবি প্রতিকৃতি ভেসে ওঠে। তাই যদি হয়, তাহলে বলতে হয়, তাদের অনুভূতি অনেকটাই যুক্তিহীন।

বেশি ঝুঁকি নেওয়া হবে? হোক। তবু আমি বলব মানুষের মানসিক ক্ষমতাগুলির মধ্যে 'যুক্তি' বা চিন্তাভাবনার স্থান সর্বাগ্রে। এমনকী জীবজন্তুদের যুক্তিশক্তি সম্পর্কে সন্দিহান লোকজনের সংখ্যাও এখন খুবই নগণ্য। লক্ষ করার বিষয় হল—জীবজন্তুরা চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, যেন কিছু-একটা ভাবে, তারপর মনস্থির করে আবার চলতে শুরু করে। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, কোনও প্রাণীতত্ত্ববিদ যত বেশি সময় ধরে এবং ভালভাবে একটি নির্দিষ্ট প্রাণীর আচার-আচরণ লক্ষ করবেন, তত বেশি করে তিনি তার মধ্যে যুক্তির প্রাচুর্য দেখতে পাবেন, তুলনায় অনেক কম খুঁজে পাবেন সহজাত প্রবৃত্তির চিহ্ন।[৪] পরের পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখব অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির কিছু প্রাণীও দৃশ্যত যুক্তিগ্রাহ্য কিছু কাজ করে থাকে। অবশ্য অস্বীকার করে লাভ নেই যে সহজাত প্রবৃত্তি এবং যুক্তিগ্রাহ্য কাজের মধ্যে ভেদরেখা টানা খুবই কষ্টসাধ্য। যেমন, ডঃ হেস তাঁর 'দ্য ওপেন পোলার সি' রচনাটিতে বার বার বলেছেন, পাতলা বরফের ওপর দিয়ে চলার সময় তাঁর কুকুরগুলি গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে স্লেজগাড়ি টানার বদলে পরস্পর দূরে সরে সরে যেত ও পৃথক হয়ে পড়ত, যাতে তাদের দৈহিক ওজন সমানভাবে বিন্যস্ত হতে পারে। এই ব্যাপারটা বেশির ভাগ সময়েই আরোহীদের কাছে একটা সতর্কীকরণ হিসেবে উপস্থিত হত, যার ফলে তারা বুঝতে পারত এখান থেকে বরফের প্রকৃতি পাতলা ও বিপজ্জনক। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—এই কুকুরগুলি কি তাহলে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা থেকে এরকম কাজ করত, নাকি তা বংশগত অভ্যাসের ফল, অর্থাৎ সহজাত প্রবৃত্তিবিশেষ? সম্ভবত তাদের মধ্যে এই ক্ষমতাটির উৎপত্তি হয়েছিল বহুদিন আগে, যখন এই অঞ্চলের অধিবাসীরা স্লেজগাড়ি টানার কাজে তাদের প্রথম নিযুক্ত করেছিল। অথবা এমনও হতে পারে যে এস্কিমো কুকুরদের পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ উত্তরমেরু অঞ্চলের নেকড়েরা, পাতলা বরফের ওপর বিচরণরত শিকারকে সকলে মিলে পাশাপাশি থেকে আক্রমণ না-করার অভ্যাস থেকেই এটা রপ্ত করেছিল।

৪। মিঃ এল. এইচ. মর্গ্যানের 'দ্য আমেরিকান বিবর', ১৮৬৮, রচনাটিতে এই মন্তব্যের চমৎকার ব্যাখ্যা করা আছে। তবে আমার মনে হয় তিনি সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষমতাকে খুবই কমিয়ে দেখেছেন।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত কাজগুলিকে বিচার করে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে সেগুলি সহজাত প্রবৃত্তির ফল, না যুক্তিসঙ্গত কাজ, নাকি কেবলমাত্র কিছু ধারণার সমষ্টিগত ক্রিয়া। অবশ্য শেষের বিষয়টি (ধারণার সমষ্টি) যুক্তিশক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। অধ্যাপক মোবিয়াস বানমাছ সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানিয়েছেন। একই অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে একটি বানমাছকে চওড়া কাচ দিয়ে অন্যান্য মাছেদের থেকে আলাদা করে রেখেছিলেন তিনি। দেখা গেল যে বানমাছটি অন্য পাশের মাছদের ধরবার জন্যে বারবার কাচটির গায়ে ধাক্কা মারছে এবং এত জোরে মারছে যে মাঝেমাঝে নিজেই অচেতন হয়ে পড়ছে। এইভাবে তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর বানমাছটি ব্যাপারটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কাচের গায়ে ধাক্কা মারা বন্ধ করল। এরপর ওই কাচটিকে সরিয়ে নেওয়া হলেও সে আর আগের মতো অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যেকার মাছগুলিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল না—অবশ্য পরে ছাড়া মাছগুলিকে গোগ্রাসেই গিলেছিল সে। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে আগেকার মাছগুলিকে আক্রমণ করার সঙ্গে যে সাঙ্ঘাতিক আঘাতটা মিশে ছিল, তা তার দুর্বল মস্তিষ্কের মধ্যে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে গেঁথে গিয়েছিল। আবার যে বুনো মানুষটি কখনও সুবৃহৎ কাচের জানলা দেখেনি, সে যদি একবার ওই জানলায় ধাক্কা মারে তাহলে তার মনেও জানলা আর আঘাতের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়ে যাবে—তবে এই রয়ে যাওয়াটা কিন্তু ঠিক বানমাছের ঘটনাটার সঙ্গে মিলবে না। সে ওই জানলার সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা করবে এবং ভবিষ্যতে একইরকম অবস্থার সম্মুখীন হলে সাবধানতা অবলম্বন করবে। আবার আমরা যদি বানরদের লক্ষ করি তাহলে দেখব, কখনও কখনও মাত্র একবার অনুষ্ঠিত কাজ থেকে প্রাপ্ত বাধা বা বিরক্তির ধারণাই তাদের দ্বিতীয়বার ওই কাজ করা থেকে বিরত রাখার পক্ষে যথেষ্ট। এখন যদি ধরা যায় বানর ও বানমাছের মধ্যে এই পার্থক্যের একমাত্র কারণ একজনের তুলনায় অন্যজনের মধ্যে ধারণার সংযুক্তি অনেক বেশি জোরালো ও দৃঢ়মূল (যদিও বানমাছটি প্রায়শই অনেক বেশি মারাত্মক আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে), তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ওই একইরকম পার্থক্য থাকলে তাদের মানসিক গঠনও মূলগতভাবে পৃথক হবে?

হাউজো জানিয়েছেন, যখন তিনি টেক্সাসের বিস্তীর্ণ শুকনো সমতলভূমি হেঁটে পার হচ্ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে থাকা কুকুর দুটি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে কম করে তিরিশ থেকে চল্লিশবার কোনও খাত দেখলেই জলের আশায় ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু খাতগুলিতে কোনও জল ছিল না, কোনও সবুজের চিহ্ন বা আর্দ্র মাটির গন্ধ পর্যন্ত ছিল না। তাহলে কুকুরগুলির এরকম আচরণের কারণ কী? নিশ্চয়ই তারা জানত গর্তের মধ্যেই জলের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য জীবজন্তুদের মধ্যেও

এ-রকম আচরণ লক্ষ করেছেন হাউজো। আমার নিজের চোখে দেখা এবং সম্ভবত অনেকেই চিড়িয়াখানায় দেখে থাকবেন, কোনও হাতির নাগালের বাইরে মাটিতে একটি ছোট বস্তু ছুঁড়ে দিলে প্রথমেই সে তার শুঁড় দিয়ে মাটিতে হাওয়া দিতে থাকে, যাতে করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়া বায়ুর চাপে বস্তুটি সহজেই তার নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। প্রখ্যাত নৃকুলতত্ত্ববিদ (ethnologist) মিঃ ওয়েস্ট্রোপ ভিয়েনায় দেখা তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা আমাকে জানিয়েছেন। অভিজ্ঞতাটি এ-রকম : একটি ভালুক তার খাঁচার দরজার কাছে অবস্থিত জলের ওপরে ভাসমান এক টুকরো রুটিকে নিজের কাছে টেনে আনার জন্য পায়ের থাবা দিয়ে জল টানছে। সুতরাং হাতি ও ভালুকের এই ধরনের কাজগুলিকে সহজাত প্রবৃত্তি বা বংশগত অভ্যাস বললে ভুল হবে, কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে তাদের এই ধরনের কাজ করার কোনও দরকারই হয় না। কিন্তু একজন অ-সভ্য মানুষ ও উচ্চশ্রেণির একটি জন্তুর দ্বারা সম্পাদিত এইরকম কাজের মধ্যে তফাত কী? ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা যাক। অ-সভ্য মানুষ ও কুকুর, উভয়েই প্রায়শ কোনও নিচু জায়গায় জলের সন্ধান পেয়েছে এবং তাদের মনে জল আর নিচু জায়গা একটা অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। একজন সুসভ্য মানুষ এ-বিষয়ে কিছু সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে, কিন্তু অ-সভ্য লোকদের সম্পর্কে জানা সমস্ত তথ্যকে বিচার করে দেখলে মনে হয় যে তাদের পক্ষে এ-রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়, আর কুকুরদের পক্ষে তো আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু একজন বুনো লোক ও একটি কুকুর একইভাবে তাদের অনুসন্ধান চালায়, যদিও বার বার তাদের আশাহত হতে হয় এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই কাজটার পিছনে কিছু যুক্তি কাজ করে, তা সে বিষয়টি সম্বন্ধে কোনও সাধারণ সিদ্ধান্ত তাদের সামনে থাক আর না-ই থাক।[৫] সুতরাং হাতি ও ভালুকের দ্বারা বাতাস বা জলের মধ্যে প্রবাহ সৃষ্টি করাও একই নিয়মের বশবর্তী। আবার একজন বুনো লোকের পক্ষে জানা বা খেয়াল করা সম্ভব নয় কোন্ নিয়মের দ্বারা তার আকাঙ্ক্ষিত কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে। তথাপি তার কাজকর্ম কিছুটা স্থূল যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন নিশ্চিতভাবে একজন দার্শনিক তাঁর অবরোহমূলক সিদ্ধান্তের দীর্ঘতম বিন্যাস করে থাকেন। এটাই হল একজন বুনো মানুষের সঙ্গে একটি জন্তুর তফাত। কারণ মানুষ পরিবেশ ও অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে এবং অনেক অল্প অভিজ্ঞতা থেকেই সেগুলির মধ্যেকার যোগসূত্রটি অনুধাবন করতে পারে। এবং এই ব্যাপারটার গুরুত্ব অপরিসীম। একসময় আমি আমার ছোট বাচ্চাটির সারাদিনে করা কাজগুলি লিখে রাখতাম। তার এগারো মাস বয়সের সময় (তখনও সে কথা বলতে শেখেনি)

৫। অধ্যাপক হাক্সলি অত্যন্ত স্পষ্ট করে সেইসব মানসিক স্তরের ব্যাখ্যা করেছেন, যেগুলির সাহায্যে কোনও মানুষ বা কুকুর আমার গ্রন্থে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সমতুল কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখতাম কত তাড়াতাড়ি তার মনের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু ও শব্দের একটা পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমার জানা সব থেকে বুদ্ধিমান কুকুরের মধ্যেও এই সম্পর্ক এত দ্রুত গড়ে ওঠে না। অবশ্য উচ্চশ্রেণির জীবজন্তুর মধ্যেও এই ক্ষমতা নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের, যেমন বানমাছ, থেকে পৃথক হয়। তাছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।

নিম্নশ্রেণির আমেরিকান বানরদের নিম্নোক্ত কিছু কাজের সাহায্যে বেশ স্পষ্ট করেই দেখানো যেতে পারে কীভাবে সামান্য অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যুক্তি বা চিন্তাভাবনার তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত মনোযোগী পর্যবেক্ষক রেঙ্গার জানিয়েছেন যে প্যারাগুয়েতে থাকার সময় তিনি যখন প্রথমবার তাঁর পোষা বানরদের ডিম খেতে দিয়েছিলেন, তখন তারা মাটিতে আছড়ে সেগুলি ভেঙে ফেলেছিল। ফলে বেশিরভাগ ডিমেরই কুসুম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা ডিমের একটা প্রান্ত শক্ত কোনও-কিছুতে ঠুকে তারপর আঙুল দিয়ে তার খোলা ছাড়িয়ে ফেলতে শিখেছিল। আবার ধারালো কোনও যন্ত্রে যদি একবার তাদের হাত কেটে যেত, তাহলে তারা দ্বিতীয়বার আর সেটা স্পর্শ করত না, কিংবা করলেও খুব সতর্কভাবে করত। আবার এ-ও শুনেছি যে এই বানরদের জন্যে কাগজে মোড়া চিনির ডেলা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু রেঙ্গার মাঝেমাঝে কাগজের মোড়কের মধ্যে জ্যান্ত বোলতা রেখে দিতেন, যাতে মোড়কটা তাড়াহুড়ো করে খুললেই তাদের হুলের কামড় খেতে হয়। কিন্তু এ-রকম ঘটনা একবার ঘটে যাওয়ার পর বানরগুলি সবসময় প্রথমে কানের কাছে কাগজের মোড়কটা ধরে বুঝতে চেষ্টা করত ভিতরে কিছু নড়ছে কিনা।[৬] এখন কুকুরদের সম্বন্ধে কিছু উদাহরণ পেশ করা যাক। মিঃ কলকিউহান একবার দুটো বুনো হাঁসকে ডানা-বিদ্ধ করায় তারা নদীর অপর পাড়ে গিয়ে পড়ল। তাঁর শিকারি কুকুরটি তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে সে দুটোকে একসঙ্গে নিয়ে আসতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। যদিও সে আগে কখনও পাখির ডানা মুড়িয়ে ধরতে শেখেনি, তবুও সে বুদ্ধি করে একটিকে মেরে ফেলে অন্য হাঁসটিকে নিয়ে আসার পর আবার গিয়ে মরা পাখিটিকে নিয়ে এল। কর্নেল হাচিনসন জানিয়েছেন, একবার তিনি দুটো তিতির পাখিকে গুলিবিদ্ধ করার পর একটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় এবং দ্বিতীয়টি জখম হয়। জখম পাখিটি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত শিকারি কুকুরের কাছে হার মানে এবং পাখিটিকে নিয়ে ফেরার সময় কুকুরটি মৃত পাখিটির সামনে এসে দাঁড়ায় : 'সে থামল, স্পষ্টতই হতবুদ্ধি, তারপর বার দুয়েক চেষ্টা করে বুঝতে পারল এখন মরা পাখিটিকে তুলে নিলে জখম পাখিটি পালাবার

৬। মিঃ বেন্ট তাঁর অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বইটিতে (দ্রঃ, 'দ্য ন্যাচরালিস্ট ইন নিকারাগুয়া', ১৮৭৪, পৃঃ ১১৮) একইভাবে সেবুস জাতের একটি পোষা বানরের বিভিন্ন কাজের কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে ওই বানরটির মধ্যে কিছুটা চিন্তাশক্তি ছিল।

সুযোগ পেয়ে যাবে। একটু ভাবল সে, তারপর মারাত্মক কামড়ে জখম পাখিটিকে হত্যা করে দুটি পাখিকেই একসঙ্গে নিয়ে ফিরল। জীবনে এই একবারই কুকুরটি স্বেচ্ছাকৃতভাবে শিকারকে আঘাত করেছিল।' এখানে আমরা সঠিক যুক্তি-বুদ্ধির অভাব দেখতে পাচ্ছি, কারণ শিকারি কুকুরটি বুনো হাঁসের ঘটনাটির মতো প্রথমে আহত পাখিটিকে নিয়ে আসতে পারত, পরে মৃতটিকে। দুজন আলাদা আলাদা প্রত্যক্ষদর্শীর দেখা এই ঘটনা দুটিকে আমি এখানে রাখলাম, কারণ দুটি ঘটনাতেই শিকারি কুকুররা কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার পর তাদের বংশগত অভ্যাস বা আচরণকে (শিকারের সময় শিকারকে হত্যা না করা) লঙঘন করেছে এবং প্রমাণ করেছে তাদের যুক্তি বা চিন্তাশক্তি কোনও নির্দিষ্ট অভ্যাসকে অতিক্রম করার পক্ষে যথেষ্টই শক্তিশালী।

হাম্‌বোল্ডের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিতে ছেদ টানব আমি : 'দক্ষিণ আমেরিকার খচ্চর-চালকরা বলে থাকে, 'আমি আপনাকে চলতে-ফিরতে সবচেয়ে পারদর্শী খচ্চরটি দিচ্ছি না, কিন্তু যাকে দিচ্ছি সে চিন্তাভাবনায় সবচেয়ে তুখোড়।' এরপর হাম্‌বোল্ড লিখছেন, 'দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপুষ্ট, বহুল-প্রচলিত এই উক্তিটি সম্ভবত দূরকল্পী দর্শনের যাবতীয় যুক্তিপ্রণালীর তুলনায় অনেক বেশি করে সজীব যান্ত্রিক-পদ্ধতির বিরোধিতা করে।' তথাপি কোনও কোনও লেখক এখনও পর্যন্ত উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে যুক্তিবুদ্ধির বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং তাঁরা উপরোল্লিখিত এইসমস্ত ঘটনার এমন সব ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন যা নিছকই কথার কথা মাত্র।[৭]

দেখা যাচ্ছে মানুষ ও উচ্চশ্রেণির জন্তুদের মধ্যে, বিশেষ করে বানরদের মতো উন্নত প্রাণীদের মধ্যে, সাধারণ কিছু সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করে। তাদের সকলের মধ্যে একই ইন্দ্রিয়ানুভূতি, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান ও সংবেদন, একই ভাবাবেগ, অনুরাগ ও আবেগ লক্ষ করা যায়, এমনকী ঈর্ষা, সন্দেহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কৃতজ্ঞতা, মহানুভবতা ইত্যাদির মতো অত্যন্ত জটিল বিষয়ও তাদের মধ্যে বর্তমান থাকে। তারা প্রতারণা করতে শেখে ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। কখনও-বা বিদ্রূপ করার ইচ্ছা জাগে তাদের, এমনকী চমৎকার রসবোধও থাকে, যেমন থাকে বিস্ময় বা কৌতূহলবোধ। তাছাড়া অনুকরণ, মনঃসংযোগ, কৌশল অবলম্বন, পছন্দ, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, ধারণার সংযুক্তি ও যুক্তি-বুদ্ধির একইরকম কাজগুলি করতে পারে তারা, অবশ্য তার মধ্যে

৭। আমি দেখে খুশি হয়েছি যে মিঃ লেস্‌লি স্টিফেনের মতো অত্যন্ত যুক্তিবাদী একজন ব্যক্তিও মানুষের মন ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মনের মধ্যে কল্পিত সেই অনতিক্রম্য বাধাটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন (দ্রঃ, 'ডারউইনিজম অ্যান্ড ডিভাইনিটি, এসেজ অন ফ্রি থিঙ্কিং', ১৮৭৩, পৃঃ ৮০), 'বস্তুতপক্ষে, যে-ভেদরেখাটি টানা হয়েছে, অধিবিদ্যা বিষয়ক অসংখ্য ভেদরেখার থেকে আমরা সেটিকে উন্নত কিছু বলে মনে করতে পারি না। অর্থাৎ, ধরে নেওয়া হচ্ছে যে দুটি জিনিসকে দুটি পৃথক পৃথক নাম দিলেই তাদের প্রকৃতিও হবে পৃথক পৃথক। কোনও ব্যক্তি যদি কখনও কুকুর পুষে থাকেন বা হাতির আচার আচরণ সম্পর্কে পূর্ব-পরিচিত হন, তাহলে কীভাবে তিনি জন্তু-জানোয়ারদের চিন্তাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন, তা বোঝা মুশকিল।'

কম-বেশি প্রভেদ থাকতেই পারে। একই প্রজাতির মধ্যে কেউ যেমন চূড়ান্ত নির্বোধ হয়, তেমনি অন্য একজন আবার হয়ে ওঠে প্রচণ্ড বুদ্ধিমান। আবার মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়ার ঘটনাও চোখে পড়ে, কিন্তু মানুষের মতো এত বেশি করে আর কারুর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও অনেক লেখক জোরের সঙ্গে বলে থাকেন মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে একটি অনতিক্রম্য ব্যবধান রয়েছে। একসময় আমি এ-ধরনের কিছু উক্তি সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলাম, কিন্তু সেগুলির মধ্যে পার্থক্য এতই বেশি আর সংখ্যাও এত সুপ্রচুর যে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। এ-কথাটা জোর দিয়েই বলা হয় যে একমাত্র মানুষই ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম, অর্থাৎ কেবলমাত্র মানুষই যন্ত্রপাতি বা আগুন ব্যবহার করতে পারে, পশুদের পোষ মানাতে বা সম্পত্তি অধিকার করতে পারে। অন্য কোনও প্রাণীর বিমূর্ত বা বস্তুনিরপেক্ষ জ্ঞান নেই, সাধারণ ধারণা গঠনে তারা অক্ষম, কেবল নিজেতেই বিভোর এবং ভাবপ্রকাশের জন্য কোনও ভাষা তাদের জানা নেই। আর একমাত্র মানুষেরই আছে সৌন্দর্যবোধ, যেমন আছে খামখেয়ালিপনা, কৃতজ্ঞতাবোধ, নানান রহস্যময়তা ইত্যাদি। সর্বোপরি, মানুষ ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং বিবেকবোধসম্পন্ন। এখানে আমি এগুলির মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়গুলি নিয়ে দু-চার কথা না বলে পারছি না।

আর্চবিশপ সুম্নার অনেক আগে বলেছিলেন যে একমাত্র মানুষই ক্রমান্বয় অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম, অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের উন্নতি অনেক বেশি ও দ্রুত এবং তার কারণও মুখ্যত এই যে সে কথা বলতে পারে এবং অর্জিত জ্ঞান হস্তান্তর করতে পারে। ফাঁদ-পাতা সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন বয়স্ক পশুদের তুলনায় তাদের শাবকদের ধরা অনেক সহজ, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা শত্রুর বশীভূত হয়। অন্যদিকে, বেশ কিছু বয়স্ক পশুকে একই জায়গায় একই রকম ফাঁদ পেতে ধরা সম্ভব নয় বা একই রকম বিষ প্রয়োগে হত্যা করাও অসম্ভব। তা'বলে সকলেই যে বিষ খাবে বা ফাঁদে ধরা পড়বে, এমন ভাবাটাও অস্বাভাবিক। তাদের ভাই-বন্ধুদের ধরা পড়তে দেখে বা বিষের শিকার হতে দেখে তারা সতর্ক হতে শিখে যায়। উত্তর আমেরিকায় বেশ কিছুদিন ধরে লোমযুক্ত প্রাণীদের ধরার চেষ্টা চলছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সর্বসম্মত সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, এই প্রাণীদের অধিকাংশই অসম্ভব রকমের বিচক্ষণ, সতর্ক ও ধূর্ত। অবশ্য এত দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে ফাঁদ-পাতার কাজটি চলে আসছে যে এইসব গুণ তাদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। আমার কাছে আরও কিছু নজির আছে। প্রথম যখন কোনও অঞ্চলে টেলিগ্রাফের তার টাঙানো হত, তখন অনেক পাখিই তারে ধাক্কা খেয়ে মারা যেত, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তারা এই বিপদকে এড়িয়ে চলতে শিখেছিল। সম্ভবত সাথীদের মৃত্যু দেখতে দেখতেই এই শিক্ষাটা পেয়েছিল তারা।

যদি আমরা বংশপরম্পরাক্রমে পশু-পাখিদের লক্ষ করি, তাহলে এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহই থাকে না যে প্রথমে তারা মানুষ বা অন্যান্য শত্রুদের সম্পর্কে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করছিল, তাতে ধীরে ধীরে আলগা দিতে শেখে। এই সতর্কতার অধিকাংশই বংশগত বা সহজাত অভ্যাসপ্রসূত হলেও, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এর আংশিক দাবিদার। অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক লেরয় জানিয়েছেন, যে-সমস্ত অঞ্চলে বেশি মাত্রায় শিয়াল শিকার করা হয়, সেখানে শিয়ালছানারা প্রথমবার তাদের বাসস্থানের গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় থেকেই অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে। যে-সব অঞ্চলে শিয়াল-শিকারিদের প্রাদুর্ভাব কম, সে-সব অঞ্চলের বড় শিয়ালরাও এদের মতো এতটা সতর্ক হয় না। গৃহপালিত কুকুররা নেকড়ে বা শিয়াল থেকেই ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। এই কুকুররা তাদের পূর্বপুরুষদের মতো ধূর্ত, সতর্ক বা সন্দেহপ্রবণ না হলেও তাদের মধ্যে কিছু নৈতিক গুণের ক্রমোন্নতি লক্ষণীয়, যেমন, অনুরাগ, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য এবং হয়তো-বা সাধারণ বুদ্ধিমত্তাও। জানা গেছে, সারা ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার কিছু অংশ, নিউজিল্যান্ড এবং সম্প্রতি হংকং ও চীনেও সাধারণ জাতের ইঁদুররা অন্যান্য প্রজাতির ইঁদুরদের ওপর আক্রমণ করছে এবং তাদের হঠিয়ে দিচ্ছে। শেষের এই দুটি দৃষ্টান্তের বিবরণদাতা মিঃ সুইন্‌হো দেখিয়েছেন যে সাধারণ জাতের এই ইঁদুরদের দ্বারা বড় আকারের ইঁদুরদের (Mus coninga) হঠে যাওয়ার কারণ হচ্ছে সাধারণ ইঁদুরদের অপেক্ষাকৃত বেশি ধূর্ততা। শেষোক্ত এই বৈশিষ্ট্যটি মানুষের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনার অভ্যাসজাত অনুশীলনের ফল বলে অনুমান করা যেতে পারে, কেননা কম-চতুর বা স্বল্পবুদ্ধির প্রায় সমস্ত ইঁদুরই মানুষের হাতে অবিরত ধ্বংস হয়ে থাকে। তবে এটাও হতে পারে যে সাধারণ জাতের ইঁদুরদের এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে মানুষের সংস্পর্শে আসার আগেই প্রতিবেশী অন্যান্য ইঁদুরদের তুলনায় তাদের অনেক বেশি ধূর্ততার দরুনই। কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই যদি এই ধারণা পোষণ করতে হয় যে যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনও জীবজন্তুরই বুদ্ধিমত্তা বা অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটেনি, তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের প্রজাতির বিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বেরই শরণ নিতে হবে। কেননা, লার্টেট-এর মতে, বিভিন্ন শ্রেণিতে অবস্থিত বর্তমান স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মস্তিষ্কের আকার তাদের পূর্বপুরুষদের ত্রিস্তরবিশিষ্ট মস্তিষ্কের থেকে অনেক বড়।

হামেশাই বলা হয়ে থাকে যে মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে না, অথচ শিম্পাঞ্জিরা অবস্থাবিশেষে দিব্যি এক ধরনের বুনো ফল (দেখতে অনেকটা আখরোট ফলের মতো) পাথর দিয়ে ভেঙে খায়। রেঙ্গার এভাবেই একটি আমেরিকান বানরকে শক্ত তালের আঁটি ভাঙতে শিখিয়েছিলেন এবং তার পর থেকে সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নানারকম বাদামের খোসা ছাড়ানো এবং বাক্স খোলার জন্য পাথরের সাহায্য নিত। এমনকী তৃপ্তিদায়ক গন্ধ না পেলে সে এইভাবে ফলের

নরম খোসাও ছাড়িয়ে ফেলত। আবার অন্য একটি বানরকে শেখানো হয়েছিল কীভাবে একটিমাত্র লাঠির সাহায্যে একটি বড় বাক্সের ডালা খুলতে হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল তারপর থেকে সে এই লাঠিটাকে কোনও ভারী জিনিস সরানোর জন্য ঠিক লিভারের মতো ব্যবহার করত। তাছাড়া আমি একটি বাচ্চা ওরাং-ওটাংকে একটা ফাটলের মধ্যে লাঠির একপ্রান্ত ঢুকিয়ে অন্যপ্রান্তে চাড় দিয়ে লাঠিটাকে লিভার-দণ্ডের মতো ব্যবহার করতে দেখেছি। আবার ভারতবর্ষের পোষমানা হাতিরা যে গাছের ডাল ভেঙে মাছি তাড়াতে পারে, সে কথাও আমাদের অজানা নয়। এমনকী একটা বুনো হাতিকেও এভাবে মাছি তাড়াতে দেখা গেছে। এবারের উদাহরণটি একটি বাচ্চা মেয়ে ওরাং-ওটাং সম্পর্কে। সে যখনই বুঝতে পারত তাকে এবার চাবুক মারা হবে, তখন তাড়াতড়ি হাতের সামনে কম্বল বা খড় পেতে তাই দিয়েই নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করত। এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে পাথর বা লাঠিকে জন্তু-জানোয়ারেরা যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এমন অনেক উদাহরণও আছে যেখানে পাথর বা লাঠিকে আক্রমণ বা প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করেছে তারা। সুবিখ্যাত পর্যটক শিম্পার বিবরণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ব্রেহ্‌ম্ বলেছেন যে আবিসিনিয়াতে সি. জেলাডা প্রজাতির বেবুনরা দলে দলে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসে শস্যক্ষেতগুলিকে লুঠ করবার জন্য। কখনও কখনও সি. হামাড্রিয়া নামে অন্য এক প্রজাতির বেবুনদের সঙ্গে তাদের সংঘাত বাধে, যার নিশ্চিত ফল হল দু'পক্ষের মধ্যে জোর লড়াইয়ের সময় জেলাডা প্রজাতির বেবুনরা ওপর থেকে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে বড় বড় পাথর গড়িয়ে দেয়, প্রতিপক্ষ হামাড্রিয়া বেবুনরা তা এড়াতে চেষ্টা করে এবং শেষমেশ দু'পক্ষই হুঙ্কার দিয়ে একে অপরের দিকে ধেয়ে যায়। কোবার্গ-গোথার ডিউকের সঙ্গে আবিসিনিয়ার মেন্‌সা গিরিপথের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আক্রমণকারী একদল বেবুনের বিরুদ্ধে ব্রেহ্‌ম্ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে তারা মানুষের মাথার মতো বড় বড় এত পাথর ফেলতে শুরু করেছিল যে আক্রমণকারীদের দ্রুত পিছু হঠতে হয়েছিল এবং বেশ কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লক্ষণীয় যে উল্লিখিত বেবুনরা সম্মিলিতভাবে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিল। মিঃ ওয়ালেস তিনটি ভিন্ন ঘটনায় দেখেছিলেন যে স্ত্রী ওরাং-ওটাং ও তাদের বাচ্চারা 'প্রচণ্ড ক্রোধে ডুরিয়ান গাছের ডাল ও তার ভীষণ কণ্টকময় ফল ছুঁড়ে দিচ্ছে। এই প্রচণ্ড আক্রমণের দরুন আমরা ওই গাছের খুব কাছে যেতে পারিনি।' তাছাড়া আমি অনেকবারই দেখেছি যদি কেউ কোনও শিম্পাঞ্জিকে বিরক্ত করে, তাহলে সে হাতের সামনে যা পায় তা-ই তার শত্রুর দিকে ছুঁড়ে মারে। এ প্রসঙ্গে উত্তমাশা অন্তরীপের সেই পূর্বোক্ত বেবুনটির কথা আর-একবার মনে করা যেতে পারে, যে তার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য জল দিয়ে কাদা তৈরি করেছিল।

চিড়িয়াখানার একটি বানর তার দুর্বল দাঁতের জন্য এক টুকরো পাথর দিয়ে বাদাম

ভেঙে ভেঙে খেত। সেখানকার সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা আমাকে জানিয়েছেন যে বাদাম ভাঙার পর সে পাথরটি খড়ের নীচে লুকিয়ে রাখত যাতে অন্য কোনও বানর সেটির খোঁজ না পায়। এখানে আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য কুকুরদের মধ্যে এই ধারণাটি হামেশাই দেখা যায়। সংগ্রহ করা মাংসের হাড় তারা সবসময় নিজের দখলে রাখতে চায়। আবার পাখিরা তাদের বাসাটিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেই মনে করে থাকে।

ডিউক অফ আরজিল বলেছেন—কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য যন্ত্র বানানোটা মানুষের একান্তই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং তিনি মনে করেন এই ব্যাপারটা মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জন্তুদের এক দুস্তর ব্যবধান রচনা করেছে। পার্থক্যটা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু স্যর জে. লুবকের কথার মধ্যেই আমি অধিকতর সত্য খুঁজে পাই। তাঁর মতে, আদিম মানুষ কোনও বিশেষ প্রয়োজনে চক্‌মকি পাথরের ব্যবহার করতে গিয়ে আকস্মিকভাবেই তা ভাঙতে সক্ষম হয়েছিল এবং সেই ধারালো পাথরের টুকরোগুলি ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। এই ঘটনার পর কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে পাথর ভেঙে নেওয়াটা তো স্রেফ এক কদম বাড়ানোর ওয়াস্তা। আর বিশেষ উদ্দেশ্যে পাথর ভাঙা শুরু হওয়ার পর, সেই ভাঙা পাথরকে ঘষে-মেজে কোনও হাতিয়ার বা যন্ত্র বানানোটাও বেশ সহজই হয়ে পড়ে। তবে নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের পাথর ঘষে-মেজে যন্ত্র তৈরি করার আগেকার সুদীর্ঘ সময়ের কথা বিচার করলে মনে হয় যে এই শেষোক্ত ঘটনাটা ঘটাতে (অর্থাৎ ভাঙা পাথরকে ঘষে-মেজে কিছু বানাতে) বহুকাল সময় লেগেছিল মানুষের। তাছাড়া স্যর জে. লুবক মনে করেন, চক্‌মকি পাথর ভাঙার সময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হত এবং সেগুলিকে ঘষে ঘষে মসৃণ করার সময় সৃষ্টি হত প্রভূত তাপ। আর এইভাবেই হয়তো 'আগুন জ্বালানোর দু'টি চালু পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছিল।' অধিকন্তু আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে আগুনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ অবহিত ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায়, কেননা গরম লাভাস্রোত মাঝেমধ্যেই ছুটে যেত সবুজ বনের মধ্য দিয়ে। আবার বনমানুষেরা সম্ভবত সহজাত প্রবৃত্তির বশেই নিজেদের থাকার জন্যে অস্থায়ী মাচা তৈরি করে থাকে। কিন্তু যেহেতু বহু প্রবৃত্তিই যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত, তাই মাচা তৈরির মতো সরল প্রবৃত্তিগুলি স্বেচ্ছাকৃত ও সচেতন ক্রিয়ায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। আমরা অনেকেই জানি ওরাং-ওটাংরা রাত্রিবেলা প্যান্ডানাস গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢেকে রাখে। এ সম্বন্ধে ব্রেহ্‌মের তথ্যটি আরও চিত্তাকর্ষক। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পোষমানা একটি বেবুন সূর্যের তাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মাথার ওপর একটা খড়ের চাটাই চাপিয়ে দিত! জন্তু-জানোয়ারদের এইসব আচরণ আসলে স্থূল স্থাপত্য ও পোশাকের মতো কিছু সাধারণ কৃৎকৌশলের প্রাথমিক ধাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, ভুললে চলবে না, মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের মধ্যে থেকেই উত্থিত হয়েছে তারা।

বিমূর্ত বা বস্তুনিরপেক্ষ ধারণা, সাধারণ ধ্যানধারণা, আত্ম-সচেতনতাবোধ, মানসিক স্বকীয়তা

আমার পক্ষে কিংবা আমার চেয়েও জ্ঞানসম্পন্ন কোনও ব্যক্তির পক্ষে বলা শক্ত যে জন্তু-জানোয়াররা ঠিক কতখানি এইসমস্ত উন্নত মানসিক ক্ষমতার অধিকারী। প্রাণীদের মনের মধ্যে কী ঘটছে তা ঠিকমতো জানা সম্ভব নয় বলেই এই সমস্যার উৎপত্তি। আবার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত থাকায় অসুবিধা বাড়ে বই কমে না। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে যদি কেউ বিচার করতে বসেন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন এগুলি মুখ্যত এই ধারণার ভিত্তিতেই লিখিত হয়েছে যে জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে কোনও-কিছুর বিমূর্তায়ন করা বা সাধারণ ধারণা গঠনের ক্ষমতা বলতে আদৌ কিছু নেই। কিন্তু যখন কোনও কুকুর অন্য একটি কুকুরকে দূর থেকে দেখতে পায়, তখন সে তাকে একটি কুকুর বলেই মনে করে। কারণ, দূরের কুকুরটি কাছে আসার পর সে তাকে বন্ধু বলে বুঝতে পারলে তার আচার-ব্যবহারে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অবশ্য সাম্প্রতিককালের একজন লেখক মন্তব্য করেছেন, এইসমস্ত ক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতা মূলত একই প্রকৃতির নয় বলে দাবি করাটা স্রেফ একটা অনুমান মাত্র। মানুষ তার ইন্দ্রিয়ানুভূত উপলব্ধিকে মানসিক ধারণার স্তরে উন্নীত করতে পারে এবং জন্তু-জানোয়াররাও তা করতে সক্ষম। আমি যখন আমার টেরিয়ার কুকুরটিকে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করি (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমি বহুবার এমনটি করে দেখেছি), 'আরে, ওটা গেল কোথায়?' তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারে তাকে কিছু একটা খুঁজতে হবে। প্রথমে সে চারপাশে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর সবচেয়ে কাছের ঝোপটির মধ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ শিকারের সন্ধান করে। কিন্তু কিছুই না পেয়ে অবশেষে সামনের গাছটির দিকে তাকিয়ে লক্ষ করে সেখানে কোনও কাঠবিড়ালী আছে কিনা। তাহলে এই কাজগুলি থেকে কি স্পষ্ট হচ্ছে না যে তার মনের মধ্যে এ-রকম একটি সাধারণ ধারণা বা কল্পনা ক্রিয়াশীল রয়েছে যে কোনও জীবজন্তুকে খুঁজে বার করতে বা শিকার করতে হবে? অবশ্য, আমি কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব, জীবন কী, মৃত্যু কাকে বলে এই জাতীয় চিন্তাভাবনার অর্থে ধরলে কোনও পশুই আত্মসচেতন নয়। কিন্তু চমৎকার স্মৃতিশক্তি ও কিছু পরিমাণ কল্পনাশক্তির অধিকারী কোনও বুড়ো কুকুর (তার স্বপ্নের মধ্যে যে-ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়) যে তার অতীত জীবনের বিভিন্ন শিকারের আনন্দ ও যন্ত্রণার কথা কখনও ভাবে না—সে ব্যাপারে কি নিশ্চিত হওয়া যায়? আর এটা হচ্ছে আত্মসচেতনতারই একটি রূপ। অন্যদিকে, বুখ্‌নার যেমন বলেছেন, কোনও অ-সভ্য অস্ট্রেলিয়াবাসীর স্ত্রী (খুবই কম কথা জানা বা চারের বেশি সংখ্যা গুণতে না পারা ও কঠিন পরিশ্রমী) কতটুকু আত্ম-সচেতনতা দেখাতে পারে বা নিজের অস্তিত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতটুকুই বা চিন্তা-ভাবনা

করতে পারে? তাছাড়া এটা সাধারণভাবেই স্বীকৃত যে উন্নতশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে স্মৃতিশক্তি, মনঃসংযোগ, ভাবনার সংযুক্তি, এমনকী কিছু পরিমাণে কল্পনাশক্তি ও যুক্তিবোধও কাজ করে। ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় থাকা উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি যদি বিকাশযোগ্য হয়, তাহলে জোর দিয়েই বলা যায় যে ওইসব সরল ধরনের ক্ষমতা ক্রমোন্নতি ও সংযুক্তির সাহায্যে গড়ে-ওঠা জটিলতর ক্ষমতাসমূহ, যেমন কোনও বিষয়ের সারার্থ উপলব্ধি বা আত্মসচেতনতার উচ্চতর রূপ ইত্যাদির মতো ক্ষমতাগুলিও তাদের মধ্যে থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলা হয় যে জীবজগতের ক্রমবিকাশের ধারার ঠিক কোন্ সময়ে জীবজন্তুরা সারার্থ উপলব্ধি ইত্যাদি ক্ষমতার যোগ্যতা অর্জন করল? তাহলে পালটা প্রশ্ন করতে হচ্ছে, আমরা কি জানি ঠিক কত বছর বয়সের সময় আমাদের শিশুরা এই ক্ষমতার অধিকারী হয়? আমরা শুধু দেখতে পাই আমাদের শিশুদের মধ্যে এইসব ক্ষমতা দারুণভাবে বেড়ে চলে।

জন্তু-জানোয়ারদের মানসিক স্বকীয়তা নিয়ে আশা করি কোনও দ্বিমত নেই। আগেই বলেছি কেবলমাত্র গলার আওয়াজ শুনে আমার কুকুরটি তার পুরনো ঘটনার অনুষঙ্গগুলি ফিরে পেত। অর্থাৎ তার মধ্যে একটি মানসিক স্বকীয়তা কাজ করত—যদিও দীর্ঘ পাঁচ বছর সময়-বিরতিতে তার মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষের একাধিকবার পরিবর্তিত হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। কুকুরটি বোধহয় তার এই আচরণের সাহায্যে বিবর্তনতত্ত্ববিদদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি উপস্থাপিত বিচিত্র যুক্তিটিকেই খাড়া করে বলতে চেয়েছিল, 'যাবতীয় মানসিক ভাব ও যাবতীয় বস্তুগত পরিবর্তনের মধ্যেও আমি টিকে আছি।...একগুচ্ছ কোষের পরিত্যক্ত শূন্য জায়গা পূরণ করতে উপস্থিত অন্য একগুচ্ছ কোষের ওপর প্রথম কোষগুচ্ছের প্রভাব থেকে যায়—এই যুক্তি সচেতনতার বিরোধী, অতএব মিথ্যাও বটে। কিন্তু বিবর্তনবাদই এই যুক্তির উদ্‌গাতা, কাজেই ওই মতবাদটিও ভ্রান্ত।'

ভাবপ্রকাশের ভাষা

সঙ্গতভাবেই এই বিষয়টি মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলির অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি আর্চবিশপ হোয়েট্‌লির মতে, 'মানুষই একমাত্র প্রাণী নয় যে তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার আশ্রয় নিতে পারে বা অপরের ভাষা কম-বেশি বুঝতে পারে।' প্যারাগুয়েতে দেখা যায়, সেবুস্ এজারে জাতের বানররা উত্তেজিত অবস্থায় অন্তত ছ'টি ভিন্ন ভিন্ন স্বরের আওয়াজ করে থাকে, যা অন্যান্য বানরদের মধ্যে একই অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। রেঙ্গার এবং আরও অনেকেই মনে করেন, আমরা যেমন বানরদের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির অর্থ বুঝতে পারি, তারাও তেমনি আমাদেরটা আংশিক বুঝতে পারে। এ-বিষয়ে কুকুরের ডাক একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গৃহপালিত কুকুররা কম

করে চার-পাঁচ রকম ভিন্ন ভিন্ন স্বরে ডাকতে পারে। কুকুরদের এইভাবে ডাকার রেওয়াজটা নতুন একটি কৌশল হলেও, তাদের পূর্বপুরুষরাও (নেকড়ে ও শিয়াল) নানারকম চিৎকার করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারত। শিকারের সময় গৃহপালিত কুকুরদের গলার আওয়াজে ব্যগ্রভাব ফুটে ওঠে, শোনা যায় ক্রুদ্ধ চিৎকার, গর্‌গর্‌ আওয়াজ। আটকে রাখলে হতাশায় কেঁউ-কেঁউ করে, রাতে গম্ভীর স্বরে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকে, আবার প্রভুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোনোর সময় তাদের গলার স্বরে প্রকাশ পায় উল্লাস। কিন্তু কোনও দরজা বা জানলা খোলানোর মতো কোনও দাবি বা আর্জি জানানোর সময় তারা একেবারেই অন্য গলায় ডাকে। এছাড়া পশুপাখিদের ভাষা সংক্রান্ত এই বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হাউজো-র মতে, গৃহপালিত মোরগরা কম করে বারোটি বিশেষ স্বরে ডাকতে পারে।

তবে, ভাবকে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করার নিয়মিত অভ্যাস একমাত্র মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মতো মানুষও অঙ্গভঙ্গি ও মুখের পেশী সঞ্চালন সহযোগে শব্দের সাহায্যে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। সরলতম ও সুস্পষ্ট অনুভূতিগুলির ক্ষেত্রেই এই ঘটনা বেশি করে দেখা যায়, যেগুলির সঙ্গে আমাদের উন্নততর বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক খুবই কম। ব্যথা, ভয়, ক্রোধ, বিস্ময় ইত্যাদির জন্য আমরা যে শব্দ এবং তার উপযোগী অঙ্গভঙ্গি করে থাকি, আদরের শিশুটির উদ্দেশ্যে জননী যে অস্পষ্ট বিড়বিড় ধ্বনির উচ্চারণ করেন, তা যে-কোনও কথার চেয়ে অনেক বেশি অর্থবহ। কিন্তু নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের থেকে মানুষের স্বতন্ত্র হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে উচ্চারিত কথার বোধগম্যতার ওপর নির্ভরশীল নয়, কেননা কুকুররাও অনেক কথা ও শব্দ বুঝতে পারে। এ-ব্যাপারে তারা ঠিক দশ-বারো মাস বয়সী কোনও মানবশিশুর মতোই। দশ-বারো মাসের শিশুরা অনেক শব্দ ও ছোট ছোট কথা বুঝতে পারে, কিন্তু একটি কথাও বলতে পারে না। আবার শুধুমাত্র স্পষ্ট করে কথা বলার ক্ষমতাটাই আমাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ তোতা বা আরও কিছু পাখি এ-বিষয়ে আমাদের চমৎকার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। এমনকী নির্দিষ্ট কোনও ধারণার সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনও শব্দকে সংযুক্ত করার ক্ষমতার মধ্যেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য নিহিত নেই, কারণ কথা বলতে শেখা কোনও কোনও তোতাপাখিও বস্তুর সঙ্গে শব্দকে এবং ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনাকে নির্ভুলভাবে মেলাতে পারে।[৮] তাহলে কি নিম্নশ্রেণির প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে কোনও প্রভেদই নেই? নিশ্চয়ই আছে।

৮। এই বিষয়টার ওপর বেশ কিছু বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করেছি আমি। এখানে যাঁর কথা আগে বলা দরকার তিনি হলেন নৌ-সেনাধ্যক্ষ স্যর বি. জে. সুলিভান—একজন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পিতৃগৃহে দীর্ঘদিনের একটি পোষা তোতাপাখি ছিল। পাখিটি বাড়ির কয়েকজনকে এবং তাঁদের পরিবারে আসা-যাওয়া আছে এ-রকম কয়েকজন ব্যক্তিকে অবিকল তাদের নাম ধরে ডাকত। প্রাতরাশের সময় সে প্রত্যেককে 'সুপ্রভাত' বলত এবং রাতে

প্রভেদটা হল—মানুষ বহু ধরনের শব্দ ও ধারণাকে একসঙ্গে মেলাবার অসীম ক্ষমতা অর্জন করেছে, যা স্পষ্টতই তার উচ্চপর্যায়ের মানসিক বিকাশের ফলেই সম্ভবপর হয়েছে।

ভাষাতত্ত্বের অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক হর্ন টুক্-এর মতে, চা বা কেক তৈরির মতো কথা বলাও একটি শিল্পকর্ম। অবশ্য আরও প্রকৃষ্ট শিল্পকর্ম হচ্ছে লিখনশৈলী। কথা বলার ভাষা কিন্তু মোটেই কোনও সহজাত ক্ষমতা নয়, কেননা প্রত্যেকটি ভাষাই শিখতে হয়। তবে অন্যান্য সাধারণ বিদ্যের সঙ্গে এর বিপুল পার্থক্য আছে, কারণ মানুষের মধ্যে কথা বলার এক সহজাত প্রবণতা কাজ করে। যেমন, আমাদের শিশুদের মুখে শোনা যায় অস্ফুট শব্দের গুঞ্জন, যদিও তাদের কারোর মধ্যেই চা বা কেক তৈরি করা অথবা লেখার সহজাত প্রবণতা থাকে না। অধিকন্তু, কোনও ভাষাতত্ত্ববিদই এখন আর মনে করেন না যে কোনও ভাষা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সৃষ্ট হয়েছে; ধীরে ধীরে ও অসচেতনভাবে অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করেই বিকশিত হয়েছে ভাষা।[৯] পাখিদের নানারকম কিচিরমিচিরের সঙ্গে আমাদের বলা ভাষার সাদৃশ্য খুবই বেশি, কেননা একই প্রজাতির সকল পাখি তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য একইরকম আওয়াজ করতে অভ্যস্ত হয়। আবার সমস্ত জাতের গায়ক-পাখিদের মধ্যে গান গাওয়ার ক্ষমতাটা সহজাত হলেও, সত্যিকারের গান গাওয়া বা শিস্ দিয়ে ডাকার ব্যাপারটা তারা তাদের মা-বাবা বা প্রতিপালকের কাছ থেকেই শিখে থাকে। ডেইন্স্ ব্যারিংটন প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে এই শব্দগুলি ঠিক 'মানুষের ভাষার মতোই, অর্থাৎ পুরোপুরি সহজাত নয়।' গান গাওয়ার প্রাথমিক চেষ্টাকে

শুতে যাবার সময় প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে 'শুভরাত্রি' উচ্চারণ করত। কখনওই তার এই অভ্যাসের ওলটপালট ঘটেনি। সুলিভানের বাবাকে 'সুপ্রভাত' জানানোর সময় সে আরও কয়েকটি কথা যোগ করে দিত, যা তাঁর বাবার মৃত্যুর পর আর কখনও শোনা যায়নি। একবার একটা বাইরের কুকুর খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়াতে পাখিটা তাকে খুব বকাবকি করেছিল। আর একবার অন্য একটি তোতা তার খাঁচা থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের টেবিলে রাখা রসাল আপেল খাচ্ছিল বলে সে তাকে জোর ভর্ৎসনা করেছিল, যার কথাগুলি এ-রকম, 'তুমি একটা পাজি তোতা।' তোতাপাখি সম্বন্ধে হাউজোর রচনাটিও উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ, 'ফ্যাকাল্‌তে মেঁতাল', Tom. ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯। ডঃ এ. মশ্‌কো জানিয়েছেন, তিনি একটি স্টারলিং পাখিকে (বেগুনি বা সবুজ রঙের পালকের ওপর কালো ও বাদামি ছোপ ছোপ রঙবিশিষ্ট এক ধরনের হরবোলা পাখি) জানতেন। যখন কেউ আসত তখন সে তাকে 'সুপ্রভাত' বলত এবং যাবার সময় সে শুনতে পেত 'বিদায় বন্ধু'। জার্মান ভাষায় শেখা এই অভিবাদনটি জানাতে কখনওই ভুল করত না সে।

৯। অধ্যাপক হুইট্‌নি লক্ষ করেছেন (দ্রঃ, 'ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড লিঙ্গুইস্‌টিক স্টাডিজ', পৃঃ ৩৫৭) মানুষের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের ইচ্ছা জীবন্ত আকারে রয়েছে এবং তা ভাষার উন্নতিতে 'সচেতন ও অসচেতন দুভাবেই কাজ করে থাকে। আশু লক্ষ্যে পৌঁছনোর ব্যাপারে কাজ করে সচেতনভাবে, আর তার পরবর্তী ফলাফলের ক্ষেত্রে কাজ করে অসচেতনভাবে।'

'একটি শিশু কর্তৃক অস্ফুট শব্দ করার চেষ্টার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।' বাচ্চা পুরুষ-পাখিরা দশ-এগারো মাস ধরে নিয়মিত গানের অনুশীলন করে চলে, বা, পাখি-ধরা ব্যাধেদের ভাষায়, 'শব্দচয়ন' করে। তাদের প্রাথমিক চেষ্টা থাকে পরবর্তী সময়ের গান সম্বন্ধে কোনও ধারণা পাওয়া মুশকিল, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আসল লক্ষ্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অবশেষে 'ঘুরে-ফিরে গান শোনায়'। উড়তে না-পারা পাখিরা অন্য প্রজাতির পাখিদের গান শেখে, যেমন টাইরোলের ক্যানারি পাখিরা এবং এইসব নতুন নতুন গান বাচ্চাদের শেখায়। ব্যারিংটনের মতে, একই প্রজাতির পাখিরা বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করার ফলে তাদের গান বা শিসের মধ্যে যে সামান্য স্বরগত পার্থক্য দেখা যায়, তাকে সহজেই 'আঞ্চলিক উপভাষার' সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের গলার স্বর বিভিন্ন জাতির মানুষদের বলা ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। এখানে এত কিছু বিশদভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে, কোনও বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করার সহজাত প্রবণতা মানুষের একচেটিয়া নয়।

স্পষ্ট করে কথা বলতে পারা কোনও-একটি ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে একদিকে মিঃ হেন্‌স্‌ল ওয়েজ্‌উড, রেভারেন্ড এফ. ফ্যারার ও অধ্যাপক শ্লিশারের অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধগুলি, এবং অন্যদিকে অধ্যাপক ম্যাক্স মুলারের বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি পড়ার পর আমি নিঃসন্দেহ যে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বিভিন্ন শব্দ ও অন্যান্য প্রাণীদের গলার স্বরকে নকল করে এবং সংকেত ও অঙ্গভঙ্গি-সহ মানুষের সহজাত চিৎকার থেকে। হয়তো মানুষের কোনও পূর্বপুরুষ বা আদিম অবস্থার মানুষের গলা দিয়ে প্রথম সুরযুক্ত ধ্বনি অর্থাৎ গান বেরিয়ে এসেছিল, যেমন এখন আমরা দেখতে পাই গিবন জাতের বানরদের মধ্যে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কথা বলার ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়েছিল স্ত্রী ও পুরুষের পূর্বরাগের সময়, যেখানে কথার সাহায্যে তাদের মনের নানান আবেগ, ভালবাসা, ঈর্ষা, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীদের চ্যালেঞ্জ জানানো ইত্যাদি প্রকাশ পেত। আর সেইজন্য বোধহয় স্পষ্ট করে শব্দ উচ্চারণ করার সাহায্যে গীতিময় ধ্বনির অনুকরণই মনের বিভিন্ন জটিল আবেগকে প্রকাশ করার মতো শব্দ সৃষ্টি করেছিল। আবার আমাদের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত বানর, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধ ও অ-সভ্য বুনো জাতের লোকদের একটি জোরালো প্রবণতা হল নকল করা। তারা যা দেখে বা শোনে, তা-ই নকল করে। অনুকরণ সম্বন্ধে ভাবতে গেলে এদিকটায় নজর দেওয়া দরকার। বানররা তো আমরা যা বলি তার অনেক কথাই বুঝতে পারে এবং বনের মধ্যে কোনও বিপদ দেখা দিলে তারা তাদের প্রতিবেশীদের চিৎকার করে সংকেত দেয় সাবধান হয়ে যাওয়ার জন্যে। মোরগরাও আকাশে বা মাটিতে বাজপাখি দেখলেই গলায় এক ধরনের আওয়াজ তুলে বিপদসংকেত জানাতে ভুল করে না (বানর ও মোরগের এই

চিৎকার এবং তাদের অন্যান্য চিৎকারের অর্থ কুকুররাও বুঝতে পারে)।[১০] তাহলে এমনটা কি হতে পারে না যে বানরদের মতো কোনও বুদ্ধিমান প্রাণী ভীতিউদ্রেককারী শিকারি জন্তুদের গোঁ-গোঁ আওয়াজ নকল করে তাদের প্রতিবেশী বানরদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করত? এই অনুকরণই হয়তো ভাষা সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ।

গলার স্বর যত বেশি ব্যবহার হতে লাগল, ব্যবহারের বংশগত প্রভাবের দরুন স্বরযন্ত্রও ততই বেশি শক্তিশালী ও ত্রুটিমুক্ত হয়ে উঠল। এই বিষয়টি কথা বলার ক্ষমতার উপরেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভাষার ক্রমাগত ব্যবহার ও মস্তিষ্কের বিকাশের মধ্যেকার সম্পর্কটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের কিছু পূর্বপুরুষের মানসিক ক্ষমতা সেই সময়ের যে-কোনও বানরের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল। এমনকী সেই পূর্বপুরুষরা যখন সামান্যতম কথাও বলতে শেখেনি, তখনও এই ব্যবধান কার্যকরী ছিল। কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে এই ক্ষমতার ক্রমাগত ব্যবহার ও প্রাগ্রসরতা মানুষের মনের ওপর দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, সুশৃঙ্খল চিন্তা করতে সক্ষম করে তুলেছে তার মনকে। শব্দের সাহায্য ছাড়া চিন্তার জটিল স্রোত কখনওই এগোতে পারে না, তা সেই শব্দ উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত যা-ই হোক না কেন—ঠিক যেমন সংখ্যা বা বীজগণিতের সাহায্য ছাড়া কোনও দীর্ঘ হিসেব মেলানো সম্ভব নয়। এমনকী সাধারণ চিন্তা-প্রক্রিয়ার জন্যেও কিছু-না-কিছু শব্দের প্রয়োজন হয়। উদাহরণ হিসেবে লরা ব্রিজম্যান নামে এক দৃষ্টিহীন, মূক ও বধির মেয়ের কথা বলা যায়। ঘুমের মধ্যে সে যখন কোনও স্বপ্ন দেখত, তখন তার আঙুলগুলি স্বপ্নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নড়াচড়া করত। অবশ্য কোনওরকম শব্দ বা ভাষা ছাড়াই স্পষ্ট ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারণার দীর্ঘ পরম্পরা মনের মধ্যে বয়ে যেতে পারে, যেমনটা দেখা যায় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা কুকুরদের শারীরিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে আমরা এটাও জেনেছি যে জন্তু-জানোয়াররা কোনও ভাষার সাহায্য ছাড়াই কিছুটা চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম। আবার আমাদের এই উন্নত মস্তিষ্কের সঙ্গে কথা বলার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কটিকে চমৎকারভাবে দেখানো যেতে পারে মস্তিষ্কঘটিত সেইসব রোগের উদাহরণ টেনে, যেগুলির ফলে কথা বলার ক্ষমতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, অন্যান্য কথা মনে পড়লেও আসল কথাটির ক্ষেত্রে স্মৃতিবিভ্রম, বা নির্দিষ্ট কিছু কথা ভুলে যাওয়া, অথবা শব্দের প্রথম অক্ষর বাদে বাকিটুকুর বিস্মরণ এবং কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর নামের বিস্মৃতি।[১১]

---

১০ অধ্যাপক হাউজো এ বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিয়েছেন। দ্রঃ, 'ফ্যাকাল্‌তে মেঁতাল দ্য অ্যানিমো', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮।

১১। এ বিষয়ে অনেকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, ডঃ বেট্‌মান-এর রচনা, 'অন অ্যাফাসিয়া', পৃঃ ২৭, ৩১, ৫৩, ১০০ ইত্যাদি।

মস্তিষ্ক ও স্বরযন্ত্রের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এগুলির আকৃতি ও কাজে বংশগত পরিবর্তন ঘটেছে, ঠিক যেমনটা ঘটে থাকে হাতের লেখার ক্ষেত্রে। হাতের লেখা নির্ভর করে অংশত হাতের গঠনের ওপর এবং অংশত মানসিক বিন্যাসের ওপর। বলা যেতে পারে হাতের লেখা নিশ্চিতভাবেই একটি বংশগত গুণ।

কিছু কিছু লেখক, বিশেষত অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার, সম্প্রতি জোরের সঙ্গে বলেছেন, ভাষা-ব্যবহার বা কথা বলতে পারার ফলস্বরূপই নানান সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে, এবং যেহেতু জন্তু-জানোয়াররা এই ক্ষমতার অধিকারী নয়, সেহেতু মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে একটি অনতিক্রম্য দূরত্ব থেকেই যায়।[১২] কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, পশু-পাখিদের মধ্যে, অগোছালো বা প্রাথমিকভাবে হলেও, ক্ষমতাটি থাকে। আমি বুঝতে পারি না কীভাবে দশ-এগারো মাসের বাচ্চারা এবং মূক-বধিররা নির্দিষ্ট কিছু শব্দের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু সাধারণ ধারণাকে মেলাতে পারে। কিন্তু ওই ধারণাগুলি তাদের মাথার মধ্যে আগে থাকতেই গড়ে না উঠে থাকলে এ ব্যাপারটা অসম্ভব হয়ে উঠত। আরও বুদ্ধিমান প্রাণীদের সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য। মিঃ লেস্‌লি স্টিফেন বলেছেন, 'কুকুরদের মধ্যে বিড়াল বা ভেড়া সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে এবং একজন দার্শনিকের মতোই তারা এ-ব্যাপারের প্রয়োজনীয় শব্দগুলি বুঝতে পারে। আর এই বুঝতে পারার ক্ষমতাটা কথা বলার ক্ষমতার মতোই তাদের স্বরযন্ত্রের উন্নত অবস্থার সাক্ষ্য দেয়—যদিও এই প্রমাণটা অনেক অস্পষ্ট বা নিকৃষ্ট মানের।'

এটা বুঝতে খুব-একটা অসুবিধে হবার কথা নয় যে কেন অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় আমাদের স্বরযন্ত্র প্রথম থেকেই এত নিখুঁত। পিঁপড়েদের ভাষা সম্বন্ধে গোটা একটি পরিচ্ছেদ জুড়ে আলোচনা করেছেন হুবার এবং সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, পিঁপড়েরা শুঁড়ের সাহায্যে খবর আদান-প্রদান করতে খুবই পারদর্শী। চেষ্টা করলে

১২। এ বিষয়ে অধ্যাপক হুইট্‌নের মতো বিশিষ্ট একজন ভাষাতত্ত্ববিদের রায় আমার চেয়ে অনেক জোরালো। অধ্যাপক ব্লিকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন (দ্রঃ, 'ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড লিঙ্গুইস্‌টিক স্টাডিজ', পৃঃ ২৯৭), 'যেহেতু ভাষা হল চিন্তা-ভাবনার একান্ত জরুরি সহায়ক, চিন্তাশক্তির বিকাশে যেহেতু ভাষা অপরিহার্য, তাই তিনি সোৎসাহে বলেছেন যে ভাষা ছাড়া চিন্তা একেবারেই অসম্ভব—অর্থাৎ, মূল ক্ষমতাটিকে তার কার্যসাধনের উপায়ের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। একইভাবে তিনি এ-ও বলতে পারতেন যে মানুষের হাত কোনও যন্ত্র ছাড়া কাজ করতে পারে না। এ-রকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু করলে অনিবার্যভাবেই তিনি অধ্যাপক মুলারের সেই ন্যক্কারজনক কূটাভাসেই গিয়ে পৌঁছতেন, অর্থাৎ, শিশুরা, মানে যারা এখনও কথা বলতে শেখেনি, তারা মনুষ্যপদবাচ্য নয়, বা মূক-বধিররা উচ্চারিত কথায় তাদের আঙুল ব্যবহার করতে না শেখা পর্যন্ত চিন্তাশক্তির অধিকারী হতে পারে না।' অধ্যাপক মুলার তাঁর মূল সূত্রটিকে বাঁকানো হরফ দিয়ে এভাবে প্রকাশ করেছেন, 'শব্দ ছাড়া কোনও চিন্তা হতে পারে না, আবার চিন্তা ছাড়া কোনও শব্দও থাকতে পারে না।' (দ্রঃ, 'লেকচারস অন মিঃ ডারউন্‌স ফিলজফি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ', তিন নম্বর বক্তৃতা)। 'চিন্তা' শব্দটির কী অদ্ভুত সংজ্ঞাই না দিয়েছেন অধ্যাপক!

হয়তো আমাদের আঙুলকে ভাবপ্রকাশের জোরালো মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেত। কারণ দেখা গেছে, কোনও জনসমাবেশের দ্রুত বক্তৃতার প্রতিটি কথাই একজন বধির ব্যক্তিকে আঙুল নেড়ে নেড়ে বোঝানো যেতে পারে, যদি একটু অভ্যাস করা যায়। কিন্তু হাতকে এভাবে ব্যবহার করতে হলে অন্য কাজের ক্ষেত্রে আমাদের দারুণ অসুবিধেয় পড়তে হত। আবার যেহেতু উচ্চশ্রেণির সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আমাদের মতো একইরকমভাবে গঠিত স্বরযন্ত্র আছে এবং যেহেতু তা মনের ভাব আদান-প্রদানের কাজেই ব্যবহৃত হয়, সেহেতু ধরেই নেওয়া যায় যে যদি তাদের ভাব আদান-প্রদান সম্পর্কটি আরও উন্নত হত তাহলে স্বরযন্ত্রের ক্ষেত্রেও আরও উন্নতি চোখে পড়ত এবং তা নিশ্চয়ই স্বরযন্ত্রের সংলগ্ন জিভ ও ঠোঁটের সাহায্যেই ঘটত।[১৩] উচ্চশ্রেণির বানররা যে কথা বলার কাজে তাদের স্বরযন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে না, তার মূল কারণ তাদের বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারেনি। হয়তো ক্রমাগত দীর্ঘ অনুশীলনের সাহায্যে তারা এই যন্ত্রটিকে কথা বলার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারত, যদিও বাস্তবে তা হয়নি, যেমন হয়নি কিছু পাখির ক্ষেত্রে, গান করার অনুকূল স্বরযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও যারা কখনও গান করতে পারে না। নাইটিঙ্গেল (ইউরোপে বুলবুল পাখির মতো রাত্রে গান করা এক ধরনের পাখি) ও কাক, উভয়ের স্বরযন্ত্র একইভাবে গঠিত। কিন্তু নাইটিঙ্গেলের গলা দিয়ে সুরযুক্ত স্বরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর কাকের গলায় ধ্বনিত হয় শুধুই কর্কশ কা-কা রব।[১৪] যদি জিজ্ঞেস করা হয় কেন বানররা বুদ্ধিতে মানুষের মতো উন্নত হতে পারল না তাহলে তার উত্তরে সাধারণ কিছু যুক্তিই শুধু খাড়া করা যায়। অবশ্য এর থেকে নির্দিষ্টতর কোনও উত্তর চাওয়াটাই অযৌক্তিক। কেননা প্রত্যেকটি প্রাণী কীভাবে বিকাশের ধারাবাহিক স্তরগুলি অতিক্রম করেছে, সে ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতা অনস্বীকার্য।

বিভিন্ন ভাষা ও প্রজাতির উদ্ভব এবং সেইসঙ্গে উভয়েরই (ভাষা ও প্রজাতির) ক্রমান্বয় উন্নতির তথ্যাদির মধ্যে আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য দেখা যায়।[১৫] কিন্তু খুঁজলে এ-রকম অনেক কথা বা শব্দই পাওয়া যেতে পারে, যেগুলি প্রজাতির উদ্ভবের অনেক

১৩। এ প্রসঙ্গে ডঃ মডস্লে-র কিছু মন্তব্য উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ, 'দ্য ফিজিওলজি অ্যান্ড প্যাথোলজি অফ মাইন্ড', পৃঃ ১৯৯)।

১৪। চমৎকার পর্যবেক্ষক মিঃ ব্ল্যাক্‌ওয়াল জানিয়েছেন, ম্যাগ্‌পাই পাখিরা (লম্বা লেজ যুক্ত ও সাদা-কালো পালকবিশিষ্ট এক ধরনের কাক) ব্রিটেনের অধিকাংশ পাখিদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এক-একটি শব্দ, এমনকী ছোট ছোট বাক্যও বলতে শেখে। তথাপি, এদের অভ্যাস সম্বন্ধে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালানোর পর তিনি বলেছেন, প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে থাকার সময় অনুকরণ করবার কোনওরকম অস্বাভাবিক ক্ষমতারই পরিচয় দেয় না এরা (দ্রঃ, 'রিসার্চেস ইন জুলজি', পৃঃ ১৫৮)।

১৫। স্যর সি. লাইয়েল কৃত প্রজাতি ও ভাষার উন্নতির মধ্যে সরস তুলনাটি এখানে উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ, 'দ্য জিওলজিক্যাল এভিডেন্সেস অফ দ্য অ্যান্টিকুইটি অফ ম্যান', পরিচ্ছেদ ২৩)।

আগে সৃষ্টি হয়েছে; কারণ, আমরা বুঝতে পারি ঠিক কীভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এগুলি। আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকার কারণ হল একই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া এবং এইসব ভাষার গঠনগত সাদৃশ্যের পিছনেও একই কারণ কাজ করেছে। অন্যান্য জিনিসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মধ্যেও কিছু হরফ বা ধ্বনির পরিবর্তন হয়, ব্যাপারটা ঠিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিছু বিষয়ের পরিবর্তনের মতোই। ভাষা ও প্রজাতি, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা পুনরাবৃত্ত অংশ, একনাগাড়ে দীর্ঘ অভ্যাসের ফল প্রভৃতি বিষয়ের আধিক্য দেখতে পাই। আবার উভয়ের মধ্যেই বহু লুপ্তপ্রায় অংশের উপস্থিতিও বেশি চোখে পড়ে। 'am' শব্দের মধ্যে 'm' অক্ষরটির অর্থ হল 'I' বা আমি। তাই 'I am' বা আমি হই বলার সময় আমরা একটা অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় শব্দ উচ্চারণ করে থাকি। শব্দের বানানেও অনেকসময় দেখা যায় কোনও কোনও অক্ষর প্রাচীন উচ্চারণের লুপ্তাংশ হিসেবে কাজ করছে। তাছাড়া সজীব প্রাণীদের মতোই ভাষাকেও নানান শ্রেণি, উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ভাষাকে সাধারণভাবে ক্রমবিবর্তনের মতানুযায়ী অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেও ভাগ করা যায়। আবার এ-ও তো সত্যি যে প্রধান প্রধান ভাষা ও উপ-ভাষাগুলি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য ভাষার ক্রমাগত বিলোপ ঘটে। স্যর সি. লাইয়েল বলেছেন, কোনও প্রজাতি যেমন একবার বিলুপ্ত হয়ে গেলে আর পুনরাবির্ভূত হতে পারে না, ঠিক তেমনি কোনও ভাষাও একবার বিলুপ্ত হয়ে গেলে আর তার পুনরাবির্ভাব ঘটে না। আবার একটি ভাষা কখনও দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মধ্যে পরস্পর সংযুক্তি বা মিশ্রণ ঘটতেই পারে।[১৬] প্রত্যেকটি ভাষার মধ্যেই বৈচিত্র্য রয়েছে এবং অবিরাম নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আমাদের স্মরণশক্তির ক্ষমতা সীমিত বলে এক-একটি শব্দ এক-একটি ভাষার মতোই ধীরে ধীরে লোপ পায়। এ ব্যাপারে ম্যাক্স মুলার খুব সুন্দর মন্তব্য করেছেন : 'প্রত্যেকটি ভাষার শব্দ ও ব্যাকরণগত রূপের অভ্যন্তরে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এক নিরন্তর সংগ্রাম চলে। ফলে সবচেয়ে সেরা, সংক্ষিপ্ত ও সহজ রূপগুলিই ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এবং তারা এই সাফল্য লাভ করে তাদের অন্তর্নিহিত গুণের দ্বারাই।' অবশ্য কিছু শব্দের টিকে থাকার জন্য এইসব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া, নতুনত্ব ও হাল্-চলতি কেতার কথাও বলা যেতে পারে। কারণ মানুষের একটি বিশেষ প্রবণতাই হচ্ছে সব জিনিসকে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন করে নেওয়া। সুতরাং অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে ভাললাগা কিছু শব্দের টিকে থাকা বা সংরক্ষণকে প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়া আর কী-ই বলা যায়!

১৬। এ প্রসঙ্গে রেভারেন্ড এফ. ডব্লু. ফ্যারার-এর চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ 'ফিলোলজি অ্যান্ড ডারউইনিজম' উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ, 'নেচার', ২৪ মার্চ, ১৮৭০, পৃঃ ৫২৮)।

অ-সভ্য জাতিগুলির মধ্যে অত্যন্ত নিয়মিত ও বিস্ময়কর রকমের জটিল ভাষাকৃতি প্রায়শই দেখা যায়। এই ব্যাপারটাকে প্রমাণ হিসেবে খাড়া করে অনেকেই বলে থাকেন যে এই ভাষাগুলি হয় দৈব সূত্রে প্রাপ্ত, নতুবা তাদের পূর্বপুরুষদের উন্নত কলাকৌশল ও সভ্যতার ফসল। এফ. ফন শ্লেগেল লিখেছেন : 'বুদ্ধিগত উৎকর্ষতার একেবারে নিম্ন স্তরে থাকা ভাষাগুলিতে আমরা হামেশাই দেখে থাকি যে সেগুলির ব্যাকরণগত কাঠামোর কলাকৌশল অত্যন্ত উন্নত ও বিস্তারিত। বিশেষ করে বাস্কে, ল্যাপ্পোনিয়ান ও অনেক আমেরিকান ভাষা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।' কিন্তু কেবলমাত্র বিস্তার ও সু-বিন্যাসের ভিত্তিতে কোনও ভাষা সম্বন্ধে ধারণা করা ভুল। ভাষাতত্ত্ববিদরা এখন স্বীকার করেন যে একত্রে মিশে যাওয়ার আগে ধাতুরূপ, শব্দরূপ ইত্যাদি পৃথক পৃথক শব্দ হিসেবেই চালু ছিল। এবং যেহেতু এ-রকম শব্দগুলি ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট সম্পর্ক প্রকাশ করে থাকে, তাই একেবারে প্রথম যুগে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই যে এগুলিকে ব্যবহার করত, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। নিখুঁত সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যা থেকে ভালভাবে বোঝা যাবে কত সহজে ভুলের শিকার হয়ে থাকি আমরা। কোনও কোনও ক্রিনয়েডের (crinoid—sea-lily) দেহে প্রায় ১৫০০০০ খোলা দেখা যায়, যে-খোলাগুলি একেবারে নিখুঁত সামঞ্জস্যে সাজানো থাকে। কিন্তু কোনও প্রাণীতত্ত্ববিদই মনে করেন না যে এই ধরনের প্রাণী, তুলনামূলকভাবে কিছু কম শারীরিক অংশবিশিষ্ট (এবং সেই অংশগুলিও শরীরের দুটি পাশ ব্যতীত আর কোথাও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়) দ্বিপার্শ্বিক প্রাণীদের চেয়ে বেশি নিখুঁত। বিভিন্ন শারীরিক অংশের পার্থক্য ও বিশেষত্বকে তিনি সঠিকভাবেই নিখুঁত সামঞ্জস্যের একটা পরীক্ষা হিসেবেই বিচার করেন। ভাষার বেলাতেও দেখা যায়, সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও জটিল ভাষাটিও কোনও অসম, সংক্ষিপ্ত ও বহু-উপাদান-মিশ্রিত ভাষাকে টপকে যেতে পারে না। এমনকী সেই ভাষাগুলিকেও নয়, যারা বিভিন্ন বিজিত, বিজয়ী বা দেশান্তরী জাতিগুলির থেকে বহু ব্যঞ্জনাময় শব্দ বা বাক্য-গঠনের রীতি ধার করে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে।

এইসব সামান্য ও অসম্পূর্ণ মন্তব্য থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, অ-সভ্য জাতিসমূহের ভাষাগুলির অত্যন্ত জটিল ও সুষম গঠনপ্রণালী এমন কোনও প্রমাণ দাখিল করে না যে কোনও বিশেষ সৃজন-প্রক্রিয়ার ফলেই এগুলির উদ্ভব ঘটেছে। আবার, আমরা আগেই দেখেছি, স্পষ্ট করে কথা বলার বিষয়টিও নিজে থেকে এমন কোনও প্রমাণ হাজির করে না যা দিয়ে নিম্নশ্রেণির কোনও জৈবিক আকার থেকে মানুষের উদ্ভবের তত্ত্বকে অস্বীকার করা যেতে পারে।

সৌন্দর্যবোধ

বলা হয়ে থাকে যে সৌন্দর্যবোধ ব্যাপারটা মানুষের একান্তই নিজস্ব। মূল প্রসঙ্গে আসার আগে বলে নেওয়া ভাল, আমি এখানে সৌন্দর্যবোধ বলতে শুধু কিছু রঙ, রূপ

বা শব্দ থেকে প্রাপ্ত আনন্দের কথাই বলতে চাইছি, তবে সুসভ্য লোকদের মনে এই অনুভূতিগুলি নানান জটিল ধারণা ও ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে। কোনও কোনও পুরুষ-পাখি তাদের উজ্জ্বল পেখম মেলে বা রঙের চমক লাগিয়ে তাদের সঙ্গিনীদের মনোরঞ্জন করে। আবার অন্য অনেক পাখি এই গুণে বঞ্চিত, ফলে তারা ওইসব কাজ করতে পারে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মেয়ে-পাখিটি তার পুরুষসঙ্গীর সৌন্দর্যকে প্রশংসার চোখে দেখে না। তবে সব জায়গায় মেয়েরাই এইসব পালক দিয়ে নিজেদের সাজাতে ভালবাসে, কাজেই এগুলির সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা যায় না। হামিং পাখির বাসা আর নিকুঞ্জ পাখির খেলার জায়গা রঙবাহারি নানান জিনিস দিয়ে রুচিসম্মতভাবে সাজানো থাকে এবং এ থেকে বোঝা যায় যে তারা এই ধরনের জিনিস দেখে কিছু-না-কিছু আনন্দ লাভ করে। বেশিরভাগ জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যবোধ ব্যাপারটা বিপরীত লিঙ্গের দৃষ্টি-আকর্ষণ করার স্তরেই রয়ে গেছে। জোড়-বাঁধার ঋতুতে পুরুষ-পাখির মিষ্টি গান তাদের সঙ্গিনীদের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। মেয়ে-পাখিরা যদি তাদের পুরুষ-সঙ্গীদের সুন্দর রঙ, শরীরের নানান চমৎকার আভরণ, গলার স্বরের মূল্য বুঝতে না পারত, তাহলে মেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্যে পুরুষ-পাখিদের এত কষ্ট একেবারেই জলে যেত। কিন্তু মেয়ে-পাখিরা ও-সব বোঝে না, এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কেন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু উজ্জ্বল রঙেই তাদের দারুণ আনন্দ প্রকাশ পায় তা বলা সম্ভব নয়, যেমন বলা সম্ভব নয় কেন বিশেষ কিছু স্বাদ ও গন্ধ আমাদের আকৃষ্ট করে। তবু মনে হয় এর অন্যতম কারণ হচ্ছে অভ্যাস। কেননা প্রথমে যা আমাদের ঠিক ভাল লাগে না, পরে তা-ই বেশ ভাল লাগতে শুরু করে, এবং সেই অভ্যাসটা বংশগতভাবে সঞ্চারিত হয়। হেলমহোল্‌জ্‌ শব্দ বা আওয়াজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে (শারীরবৃত্তীয় নীতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি) সুরলালিত্য ও নির্দিষ্ট কিছু স্বরের ওঠা-নামা কেন আমাদের ভাল লাগে, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু কোনও শব্দ বেখাপ্পাভাবে থেকে-থেকে ঝঙ্কৃত হলে আমাদের মোটেই ভাল লাগে না—রাতে জাহাজের পাটাতনে যাঁরা দড়ি ঝাপটানোর অনিয়মিত আওয়াজ শুনেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এ-কথাটা স্বীকার করবেন। দেখার ব্যাপারেও এই একই নীতি প্রযোজ্য, কেননা চোখ সর্বদাই সামঞ্জস্যপূর্ণ বা নিয়মিত-ঘটা বস্তু-আকৃতি দেখতে ভালবাসে। এমনকী অত্যন্ত নিকৃষ্ট বুনো লোকেরাও ব্যবহার করার সময় চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক গড়নই পছন্দ করে এবং কিছু পুরুষ-জন্তুর ক্ষেত্রেও এগুলি যৌন নির্বাচনের সাহায্যে অলংকারের পদে উন্নতি হয়েছে। কোনও-কিছু দেখে বা শুনে কেন আমরা আনন্দ লাভ করি, তার কোনও কারণ দেখাতে পারি বা না-পারি, এটা কিন্তু ঠিক যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা একইরকম রঙ, মনোরম বর্ণবৈচিত্র্য, রূপ আর শব্দ দেখে বা শুনে যথেষ্ট আনন্দ পায়।

সৌন্দর্যপ্রীতি, অন্ততপক্ষে মেয়েদের সৌন্দর্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রীতি—এটা মানুষের কোনও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ ভিন্ন ভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে এ-ব্যাপারে

ব্যাপক রুচিগত পার্থক্য রয়েছে। এমনকী একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতির মানুষদের মধ্যেও এর বোধ সম্পূর্ণ একরকম নয়। বুনো লোকদের নানারকম বিকটদর্শন অলংকার ব্যবহার ও অদ্ভুত গানের সুর পছন্দ করা থেকে বলা যেতে পারে, তাদের নান্দনিক বোধ পাখি ইত্যাদি কিছু প্রাণীর মতো ততটা উন্নত হয়নি। স্পষ্টতই কোনও জীবজন্তু রাতের তারা-ভরা আকাশে, সুন্দর নিসর্গ-দৃশ্যে কিংবা রুচিসম্পন্ন সংগীতের সুরে আগ্রহ প্রকাশ করে না। কারণ এই ধরনের উন্নত রুচির জন্যে প্রয়োজন কৃষ্টি ও জটিল চিন্তা-ভাবনার সংযুক্তি, অ-সভ্য বা অশিক্ষিত লোকেদের পক্ষেও তাই এগুলির স্বাদ নেওয়া সম্ভব নয়।

বেশ কিছু জিনিস মানুষের অগ্রগতিতে অত্যন্ত সাহায্য করেছে, যেমন কল্পনাশক্তি, বিস্ময়বোধ, কৌতূহল, সৌন্দর্যবোধ, অনুকরণ-প্রবণতা, উত্তেজনা বা নতুনত্বের প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি। সেইসঙ্গেই দেশাচার ও প্রচলিত রীতিকে খেয়ালখুশি মতো পরিবর্তিত করতেও এগুলি সক্ষম। আমি এই বিষয়টিতে (খেয়ালখুশি মাফিক পরিবর্তন) জোর দিলাম, কারণ হালের একজন প্রবন্ধকার অদ্ভুতভাবে বলেছেন যে খামখেয়াল হচ্ছে 'জন্তুজানোয়ার ও বুনো লোকেদের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট একটি পার্থক্য।' কিন্তু কেন নানারকম পরস্পরবিরোধী প্রভাবের ফলে মানুষ খামখেয়ালি হয়ে ওঠে তার কারণ যেমন আমরা আংশিকভাবে বুঝতে পারি, তেমনি নিম্নশ্রেণির জীবজন্তুরাও তাদের ভালবাসা, পছন্দ-অপছন্দ ও সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে খামখেয়ালিপনার পরিচয় দেয় কেন, তা-ও বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাছাড়াও তারা বোধহয় নতুনত্ব ভালবাসে—ভালবাসে ব্যাপারটা নতুন বলেই।

ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস

এমন কোনও প্রমাণ জানা নেই যা থেকে বলা যায় মানুষ একেবারে আদিম অবস্থা থেকেই কোনও সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করত। বরং, শুধুমাত্র দ্রুত গমনকারী পর্যটকদের কাছ থেকে জানা নয়, বুনো বা অ-সভ্য লোকদের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাসকারী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য থেকেও জানা গেছে যে এমন অসংখ্য জাতি ছিল বা এখনও আছে, যাদের এক বা একাধিক ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই এবং তাদের ভাষাতেও ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণাকে প্রকাশ করার মতো কোনও শব্দ নেই। অবশ্য পৃথিবীর একজন 'সৃষ্টিকর্তা ও শাসনকর্তা' আছেন কি না, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন। চিরস্মরণীয় অনেক গুণীজনই এই 'সৃষ্টিকর্তা ও শাসনকর্তা' থাকার স্বপক্ষে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবার আমরা যদি 'ধর্ম' অভিধাটির মধ্যে অদৃশ্য বা অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাসকে যোগ করি, তাহলে বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে বাধ্য। কারণ প্রায় সব জায়গার অনুন্নত জাতির লোকজনদের মধ্যেই এই বিশ্বাসটি বহুল প্রচলিত। কী করে তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্ম নেয়, তা বুঝতেও খুব-একটা বেগ পেতে হয় না। কল্পনাশক্তি,

বিস্ময়বোধ, কৌতূহল এবং চিন্তাভাবনার ক্ষমতা কিছুটা উন্নত হওয়ার পর মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার চারপাশের ঘটনাকে বুঝতে চাইল এবং নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবে চিন্তা করতেও শুরু করল। মিঃ ম্যালেনাম বলেছেন, 'জীবনের ঘটনাবলি সংক্রান্ত একটা ব্যাখ্যা খাড়া করতেই হয়েছে মানুষকে। জীবন সর্বব্যাপী—এটাই ছিল সরলতম ভাবনা। এই ভাবনা অনুযায়ী এগোতে গিয়ে মানুষ প্রথমে সম্ভবত এটাই ভেবেছিল যে জীবজন্তু, গাছপালা, বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি (ঝড়, বৃষ্টি, খরা, বন্যা ইত্যাদি), এবং মানুষের নিজের মধ্যেকার যে-সব শক্তি তাকে কার্যে প্রণোদিত করে—সেগুলির মধ্যে একটা বিশেষ কিছু ক্ষমতা আছে।' মিঃ টাইলর বলেছেন, স্বপ্ন দেখা থেকেও মানুষের মধ্যে এইসব ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ বন্য লোকেরা কোন্‌টি কল্পিত এবং কোন্‌টি বস্তুগত, এই দুই ধারণার মধ্যে তৎক্ষণাৎ তফাৎ করতে পারে না। স্বপ্ন দেখার সময় যখন বস্তু-আকৃতি তাদের সামনে প্রতীয়মান হয়, তখন তারা মনে করে ওগুলি কোনও দূরবর্তী স্থান থেকে এসে তাদের ওপর ভর করছে, বা, 'স্বপ্নদ্রষ্টার আত্মা বাইরে বেড়াতে যায়, তারপর আবার ফিরে আসে। তখন তার সঙ্গে থাকে এতক্ষণ সে যা দেখেছে, তার স্মৃতি।'[১৭] কিন্তু যতক্ষণ না মানুষের মনের মধ্যে কল্পনাশক্তি, কৌতূহলস্পৃহা, যুক্তি সাজানোর ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়গুলি যথেষ্ট ভালভাবে বিকশিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল স্বপ্ন দেখা থেকে সে কোনও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কোনও ধারণা করতে পারে না, যেমন পারে না কুকুররাও। প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিগুলি অপার্থিব বা পার্থিব উপাদানের দ্বারা জীবন্ত হয়ে ওঠে—বুনো লোকেদের এই কল্পনা-প্রবণতাকে হয়তো

১৭। টাইলরের গ্রন্থ ('আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড', পৃঃ ৬) দ্রষ্টব্য। এছাড়াও লুবকের 'দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ রিলিজিয়ন' বিষয়ে তিনটি অসাধারণ পরিচ্ছেদ উল্লেখযোগ্য (মূল গ্রন্থ : 'অরিজিন অফ সিভিলাইজেশন', ১৮৭০)। একইভাবে মিঃ হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর চমৎকার প্রবন্ধে দেখিয়েছেন (দ্রঃ, 'ফর্টনাইটলি রিভিউ', ১লা মে, ১৮৭০, পৃঃ ৫৩৫), পৃথিবীতে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের একেবারে গোড়ার কথা হল স্বপ্ন দেখা বা ছায়ামূর্তি দেখা এবং অন্যান্য কিছু কারণ। সে নিজেকে শরীরগত ও আত্মাগত, এই দুই উপাদানের সমন্বয় হিসেবে ভাবতে শিখেছিল। আবার যেহেতু ধরে নেওয়া হল যে আত্মা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে ও দারুণ শক্তিশালী, অতএব তাকে খুশি করার জন্য প্রয়োজন হল নানারকম আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপহার প্রদান এবং সেইসঙ্গে তার সাহায্য প্রার্থনাও জরুরি হয়ে উঠল। মিঃ স্পেন্সার আরও দেখিয়েছেন যে পশুপাখি বা কোনও জিনিসের নামে কোনও গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা বা আদিপুরুষের মূল নাম বা ডাক নাম প্রদানের রীতি থেকে বহুদিন পরে গোষ্ঠীগুলির প্রকৃত আদিপুরুষদের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাবতই তখন এইরকম পশুপাখি বা জিনিসকে জীবিত-আত্মা হিসেবে বিশ্বাস করা হয়, মনে করা হয় তারা পবিত্র এবং দেবতা কল্পনায় পুজোও করা হয় তাদের। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আমার মনে হয় যে এর আগেও একটি প্রাথমিক ও কঠিন ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে মানুষকে, যখন শক্তিমান বা গতিময় যে-কোনও জিনিসকেই কোনও-না-কোনওভাবে সজীব বলে মনে করা হত এবং সেইসঙ্গেই মনে করা হত যে আমাদের মতো সেগুলিরও চিন্তাশক্তি আছে।

আমার দেখা একটি ছোট ঘটনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমার কুকুরটি গায়ে-গতরে যেমন বড়, তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। একদিন সে বাগানের ঘাসের ওপর চুপচাপ শুয়ে ছিল। দিনটা বেশ গরম। হাওয়ার দেখা নেই। হঠাৎই সামান্য দূরে একটু হাওয়া বইতে একটা খোলা ছাতা নড়ে উঠল। কেউ সেটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কুকুরটি হয়তো আদৌ সেদিকে নজর দিত না। কিন্তু যখনই সামান্য হাওয়ায় ছাতাটা নড়ছিল, তখনই কুকুরটি সাংঘাতিক রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। আমার মনে হয় সে খুব দ্রুত আর অসচেতনভাবে ভেবে নিয়েছিল—যেহেতু ছাতাটা কেন নড়ছে বোঝা যাচ্ছে না, অতএব ওখানে নিশ্চয়ই তার অপরিচিত কিছু-একটা রয়েছে, এবং কোনও অপরিচিত ব্যক্তিরই তার সীমানায় প্রবেশ করার অধিকার নেই।

অপার্থিব শক্তির ওপর বিশ্বাস থেকে সহজেই এক বা একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসের জন্ম হতে পারে। কারণ বুনো জাতের লোকেরা তাদের নিজেদের অনুভূত আবেগ, প্রতিশোধস্পৃহা বা বিচারের সহজতম পদ্ধতি ও অনুরাগকে স্বাভাবিকভাবে আরোপ করত অপার্থিব শক্তির ওপর। এ-ব্যাপারে ফুজিয়ানরা একটি মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে। 'বিগ্‌ল্' জাহাজের চিকিৎসক মিঃ বাইনো একবার নমুনা হিসেবে পরীক্ষা করার জন্য কয়েকটি হংসশাবককে গুলি করে নামিয়েছিলেন। তা দেখে ইয়র্কমিনস্টর নামে একজন ফুজিয়ান গম্ভীর স্বরে বলেছিল, 'কী করলেন, মিঃ বাইনো? এক্ষুনি তুমুল বৃষ্টি শুরু হবে, সাংঘাতিক বরফ পড়বে, ঝড় উঠবে দুরন্ত।' আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে—মানুষের খাবার যে নষ্ট করবে, তাকে শাস্তি পেতে হবে। তারপর একটা ঘটনার কথা বলেছিল সে : তার ভাই যখন একজন 'বন্য প্রকৃতির লোককে' খুন করেছিল তখন ভয়ঙ্কর ঝড় হয়েছিল, সেইসঙ্গে ছিল মুষলধারে বৃষ্টি আর অবিরাম তুষারপাত। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আমরা ফুজিয়ান সমাজে এমন কোনও প্রমাণ খুঁজে পাই না, যা থেকে বলা যায় তারা আমাদের ঈশ্বরের মতো কোনও-কিছুতে বিশ্বাস করে। এমনকী তাদের মধ্যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতিও চোখে পড়ে না। তাই জিমি বাটন নামে একজন ফুজিয়ান গর্বভরে বলতে পেরেছিল—তার দেশে কোনও শয়তানের (ভূত-প্রেত) অস্তিত্ব নেই। কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কেননা অ-সভ্য বুনো লোকদের মধ্যে মঙ্গলময় কিছুর তুলনায় অশুভ আত্মার প্রতি বিশ্বাস অনেক বেশি মাত্রায় চোখে পড়ে। ধর্মীয় অনুরাগ খুবই জটিল একটি অনুভূতি। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ভালবাসা, মর্যাদাপূর্ণ এক মহান সত্ত্বার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, নির্ভরশীলতা, ভয়, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, ভবিষ্যতের আশা এবং আরও নানান বিষয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিগত ও নৈতিক চেতনা মোটামুটি একটি উন্নত স্তরে উন্নীত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে এ-রকম জটিল একটি অনুভূতিতে পৌঁছনো সম্ভব নয়। তথাপি, কুকুরের মধ্যে যেন এই অনুভূতিরই খানিকটা লক্ষণ প্রকাশ পায়, যখন সে তার প্রভুর প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ করে, যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পূর্ণ আনুগত্য, কিছুটা ভয় এবং

অন্যান্য আরও অনেক অনুভূতি। কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার পর কোনও কুকুর যখন আবার তার প্রভুর কাছে ফিরে আসে, তখন সে যেমন আচরণ করে বা ওই একই অবস্থায় একটি বানর যেমন আচরণ করে, তেমন আচরণ কিন্তু তারা নিজেদের স্বজাতির প্রতি করে না। স্বজাতির ক্ষেত্রে তাদের উচ্ছ্বাস কিছুটা কম থাকে এবং তাদের প্রতিটি কাজেই ফুটে ওঠে যে তারা নিজেদেরকে অন্যদের সমান বলেই মনে করছে। অধ্যাপক ব্রবাখ্ এমনকী এ-ও বলেছেন যে একটি কুকুরের কাছে তার প্রভু হচ্ছে দেবতার সমান।[১৮]

যে-সব উন্নত মানসিক গুণ প্রথমে মানুষকে অদৃশ্য ও অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল এবং তারপর ভক্তিবস্তুবাদ, বহু-ঈশ্বরবাদ এবং অবশেষে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল, সেই গুণগুলিই চিন্তাভাবনার ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে নানারকম কুসংস্কার ও কু-রীতির জন্ম দিয়েছে। এদের মধ্যে কতকগুলি তো রীতিমতো ভয়ঙ্কর—রক্তপিপাসু দেবতাকে খুশি করতে নরবলি, বিষপ্রয়োগ করে বা আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নির্দোষ ব্যক্তিদের বিচার করা, ডাইনিবিদ্যা ইত্যাদি। তবু এইসব কু-সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করা দরকার, কারণ তার ফলে বোঝা যায় চিন্তাভাবনা, বিজ্ঞান ও সঞ্চিত জ্ঞানের উন্নতির কাছে মানুষের ঋণ কী অপরিসীম। স্যর জে. লুবক তাঁর অভিজ্ঞতার নিরিখে বলেছেন, যথেষ্ট কমই বলা হবে যদি বলা হয় যে অজানা শয়তানের বিশ্রী ভয় অ-সভ্য জীবনের ওপর ঘন মেঘের মতো ছড়িয়ে থাকে এবং তাদের যে-কোনও সুখের মুহূর্তকে দুর্বিষহ করে তোলে।' আমাদের উন্নত মানসিক গুণাবলির এইসব দুঃখজনক ও পরোক্ষ ফলাফলকে তুলনা করা যায় নিম্নতর প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তির বিভিন্ন আকস্মিক ও কদাচিৎ সংঘটিত ভুল-ভ্রান্তির সঙ্গে।

১৮। বলা হয় যে বহুদিন আগেই বেকন এবং আঠারো শতকে কবি বার্নস এ বিষয়ে একই ধারণা পোষণ করতেন (দ্রঃ, ডঃ ডব্লিউ. ল্যাণ্ডার লিণ্ডসের লেখা, 'জার্নাল অফ মেণ্টাল সায়েন্স', ১৮৭১, পৃঃ ৪৩)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার তুলনা, পূর্বের আলোচনার পরবর্তী অংশ

নৈতিক বোধ—মৌলিক প্রতিপাদ্য—সামাজিক প্রাণীর বৈশিষ্ট্য—সামাজিকতার উৎস—পরস্পরবিরোধী সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব—মানুষ একটি সামাজিক জীব—দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি স্বল্পস্থায়ী প্রবৃত্তিগুলির ওপর আধিপত্য করে—কেবলমাত্র অ-সভ্য বন্যদের চোখে মূল্যবান সামাজিক গুণসমূহ—আত্মসম্মানবোধ—বিকাশের উন্নততর অবস্থায় অর্জিত গুণ—আচার-আচরণ সম্পর্কে একই সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য—নৈতিক প্রবণতার পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা—সারসংকলন।

যে-সমস্ত লেখক বলে থাকেন যে মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মধ্যেকার যাবতীয় তফাতের মধ্যে নৈতিক বোধ বা বিবেকবোধই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। ম্যাকিন্‌টশ বলেছেন, এই বোধ 'মানুষের অন্য যে-কোনও কাজের নীতির ওপর ন্যায্যতই আধিপত্য করে।' এই বোধের মর্মার্থটা প্রকাশ করা যায় সেই ছোট্ট অথচ জোরালো শব্দটি দিয়ে—'উচিত' (অর্থাৎ কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়)। ব্যাপারটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের সমস্ত গুণগুলির মধ্যে এটি মহত্তম, এই গুণের প্রভাবেই মানুষ তার প্রতিবেশীর জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে এতটুকুও ইতস্তত করে না, কিংবা অধিকার বা কর্তব্যের কোনও গভীর উপলব্ধির প্রেরণায় যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করার পর মহান উদ্দেশ্যে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকে। ইমান্যুয়েল কান্ট বলেছেন, 'কর্তব্য! চমৎকার একটি ভাবনা। সে ভাল-মন্দর বিচার করে না, তোষামোদের ধার ধারে না বা চোখরাঙানিকে ভয় পায় না। কেবলমাত্র হৃদয়ের বাস্তবনীতি দ্বারা চালিত হয়, আর তাই সবসময় বাধ্যতামূলক না হলেও, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ই। তার সামনে আর সব ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে মাথা নত করতে হয়—মনের গোপনে তা যতই দানা বাঁধুক না কেন। কোথায় এর উৎস?'

মূল্যবান এই বিষয়টি নিয়ে অনেক সুযোগ্য লেখকই আলোচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও আমার পক্ষে এটি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে মাপ চেয়ে নিচ্ছি, আর যতদূর জানি, কেউই এই গুণটিকে প্রাকৃতিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশদভাবে আলোচনা করেননি। আমার এই অনুসন্ধানের অন্য একটি দিকও আছে। এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের আচার-ব্যবহার মানুষের উন্নততম মানসিক গুণ অর্থাৎ নৈতিকবোধের ওপর কতখানি আলোকপাত করতে সক্ষম।

নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্যটিকে আমি যথেষ্ট সম্ভবপর বলেই মনে করি। প্রতিপাদ্যটি হল—সুস্পষ্ট সামাজিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট (বাবা-মা ও সন্তানের প্রতি ভালবাসাও এর অন্তর্ভুক্ত) যে-কোনও জীবজন্তুই[১] নৈতিকবোধ বা বিবেকবুদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম, আর তার জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত উন্নত বা প্রায় মানুষের সমান বিকশিত বুদ্ধিমত্তা। কারণ, প্রথমত, সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি একটি প্রাণীকে তার প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখের কথা ভাবতে শেখায়, তাদের জন্য কিছুটা সহমর্মিতা অনুভব করতে ও নানারকম সাহায্য করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। এই কাজগুলি স্পষ্টতই সুনির্দিষ্ট প্রবৃত্তিগত চরিত্রসম্পন্ন হতে পারে, অথবা এগুলির সাহায্যে প্রাণীদের ইচ্ছা ও তৎপরতাও প্রকাশ পেতে পারে, যেমন দেখা যায় অধিকাংশ উন্নত শ্রেণির দলবদ্ধ প্রাণীদের মধ্যে। তারা তাদের প্রতিবেশীদের নির্দিষ্ট কিছু উপায়ে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু তা'বলে এইসব অনুভূতি ও কাজ একই প্রজাতিভুক্ত সকলের জন্যে প্রকাশ করে না। কোনও প্রাণী কেবলমাত্র তখনই আগ্রহ দেখায়, যখন অন্য প্রাণীটি তার গোষ্ঠীভুক্ত বা সমগোত্রীয় হয়। দ্বিতীয়ত, কোনও জীবের মানসিক গুণগুলি অত্যন্ত উন্নত হয়ে উঠলে অতীতের যাবতীয় কাজ ও উদ্দেশ্যের ভাবনাগুলি তার মস্তিষ্কের মধ্যে অবিরাম চলাচল করতে শুরু করে। আর অতৃপ্তি বা দুঃখের অনুভূতি কোনও-না-কোনও অতৃপ্ত প্রবৃত্তি থেকেই জন্ম নেয়। অতৃপ্তি বা দুঃখের অনুভূতি জাগার ফলে প্রায়শই মনে হতে পারে যে স্থায়ী ও সর্বদা বিদ্যমান সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি বুঝি সেই মুহূর্তে

১। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব—এই সত্যে উপনীত হবার পর স্যর বি. ব্রডি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, 'তাহলে কি নৈতিক বোধের অস্তিত্বের বিতর্কিত প্রশ্নটিকে মিটিয়ে ফেলা উচিত নয়?' (দ্রঃ, 'সাইকোলজিক্যাল ইন্‌কোয়ারিস', পৃঃ ১৯২)। সম্ভবত আরও অনেকের মনেই এইরকম ধারণার উদয় হয়েছিল, যেমন হয়েছিল বহু আগে মার্কাস অরেলিয়াসের মনে। মিঃ জে. এস. মিল তাঁর প্রসিদ্ধ বই 'ইউটিলিটারিয়্যানিজ্‌ম্' পৃঃ ৪৫-৪৬-এ সামাজিক অনুভূতিকে একটি 'শক্তিশালী প্রাকৃতিক ভাব' ও 'উপযোগবাদী নৈতিকতার জন্য আবশ্যক ভাবের প্রাকৃতিক বনিয়াদ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'উপরোক্ত অন্যান্য অর্জিত ক্ষমতাগুলির মতো নৈতিকতার বিষয়টিও আমাদের স্বভাবের অঙ্গ না হলেও স্বভাবেরই স্বাভাবিক বিকাশের ফল তো বটেই। অন্যান্য ক্ষমতাগুলির মতো এটিও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উদিত হয়, তবে কিছুটা কম মাত্রায়।' কিন্তু এ-সবের বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি আবার বলছেন, 'আমার বিশ্বাস অনুযায়ী, নৈতিক বোধ যদি সহজাত না হয়ে অর্জিতও হয়, তাহলেও তার স্বাভাবিকত্ব হারানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।' বেশ কিছুটা ইতস্তত করে আমি মিঃ মিলের মতো সুখ্যাত একজন চিন্তাবিদের বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের সামাজিক অনুভূতিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত বা সহজাত, এবং মানুষের বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? মিঃ বেইন (দ্রঃ, 'দ্য ইমোশন্‌স অ্যান্ড দ্য উইল', পৃঃ ৪৮১) ও আরও অনেকে মনে করেন, প্রতিটি প্রাণীই তার জীবদ্দশায় নৈতিক বোধ অর্জন করে থাকে। কিন্তু বিবর্তনবাদের সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে তা একেবারেই অসম্ভব। মানবিক গুণগুলি যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, তা স্বীকার না করাই মিঃ মিলের রচনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি বলে মনে হয়।

শক্তিশালী অন্য কোনও প্রবৃত্তির কাছে পরাভূত হচ্ছে। এগুলি মোটেই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না বা গভীর কোনও ছাপ ফেলতেও সক্ষম নয়। স্পষ্টতই অনেক সহজাত প্রবৃত্তি, যেমন খিদে পাওয়া, অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী চরিত্রের হয়ে থাকে। পরিতৃপ্তি আসার পর এগুলিকে তৎক্ষণাৎ বা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে করা যায় না। তৃতীয়ত, কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করার পর যখন সকলের কাছে মতামত জানানোর রাস্তা খুলে গেল, তখন সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের কীভাবে কাজ করা উচিত—সে সম্বন্ধে সকলকার মতটাই হয়ে উঠল কার্যকলাপের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশিকা। কিন্তু মনে রাখা দরকার, জনমতের ওপর আমরা যতই গুরুত্ব দিই না কেন, প্রতিবেশীদের সম্মতি বা অসম্মতি সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধার উৎস হচ্ছে সহানুভূতি। পরে আমরা এ-ও দেখব যে এই সহানুভূতি আসলে সামাজিক প্রবৃত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বাস্তবিক পক্ষে তার ভিত্তিমূল। শেষত, প্রতিটি প্রাণীর অভ্যাস সমাজের প্রত্যেকের আচরণকে পথ দেখানোর কাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কারণ সহানুভূতিও সামাজিক প্রবৃত্তি, যে-কোনও প্রবৃত্তির মতোই অভ্যাসের দ্বারা দারুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে প্রতিটি ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সার্বজনীন ইচ্ছা ও বিচারধারার প্রতি অনুগত হতে শেখে। আমরা এখন এইসব অপ্রধান বিষয়গুলিকেই খতিয়ে দেখব। গুরুত্ব অনুযায়ী অবশ্য কোনও কোনও বিষয় একটু বেশি জায়গা দখল করবে।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল আমার প্রতিপাদ্য বিষয় এই নয় যে, কোনও সত্যিকারের সমাজবদ্ধ প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা মানুষের মতো এত কর্মঠ ও উন্নত হয়ে উঠলেই সে মানুষের সমান নৈতিক বোধ অর্জন করত। বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে যেমন সৌন্দর্যবোধ আছে (যদিও বিভিন্ন পশু বিভিন্ন জিনিসে আকর্ষণ বোধ করে), ঠিক তেমনি ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাও তাদের আছে। অবশ্য এই ভাল-মন্দ বিচার করার পদ্ধতিটা বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। এ-বিষয়ে একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্তই দেওয়া যাক। ধরা যাক, মানুষ যদি মৌমাছিদের মতো একই অবস্থায় লালিত-পালিত হত, তাহলে আমাদের অবিবাহিত মেয়েরা, ঠিক শ্রমিক-মৌমাছিদের মতোই, তাদের ভাইদের মেরে ফেলাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করত বা মায়েরা তাদের ঋতুমতী মেয়েদের মেরে ফেলার চেষ্টা করত। কেউ তাতে কোনও আপত্তি করত না।[২]

২। মিঃ এইচ. সিজ্‌উইক এ বিষয়টির ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমাদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান কোনও মৌমাছির কাছ থেকে বহুল প্রচলিত সমস্যাটির ধীর-স্থির সমাধান আশা করা যেতেই পারে।' অধিকাংশ বন্য মানুষদের অভ্যাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, মানুষ এই সমস্যাটির সমাধান করেছে স্ত্রী-শিশু হত্যা, স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রথা এবং অবাধ যৌনসম্পর্কের সাহায্যে। কাজেই, একে আদৌ কোনও ধীর-স্থির পদ্ধতি বলব কিনা, সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মিস্ কোবে এ-ব্যাপারে তাঁর মতামত দিতে গিয়ে বলেছেন, সামাজিক কর্তব্যের 'নীতিগুলি' এভাবে উল্টে যেতে পারে। বোধহয় তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন

তথাপি অনুমাননির্ভর এই উদাহরণটি থেকে আমার মনে হয়, মৌমাছি বা দলবদ্ধভাবে বসবাসকারী যে-কোনও প্রাণীই এই অবস্থায় ন্যায়-অন্যায় বোধ বা বিবেকবোধ অর্জন করে থাকে। কারণ প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যেই একটি নিজস্ব বোধ কাজ করে। সে যেমন কিছু শক্তিশালী বা অধিকক্ষণ স্থায়ী সহজাত প্রবৃত্তি ধারণ করে, ঠিক তেমনি কিছু অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী বা স্বল্পস্থায়ী প্রবৃত্তিকেও ধারণ করে। আর তার ফলে কোন্ প্রবৃত্তিটিকে মানা হবে, তা নিয়ে এই দু'য়ের মধ্যে বেধে যায় জোর লড়াই। সেই সঙ্গে তৃপ্তি অতৃপ্তি, এমনকী দুঃখকষ্টের স্মৃতিও জাগরিত হয়, কারণ অতীত ঘটনাগুলি নিরন্তর মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করে। এ-রকম সময়ে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই জীবের অন্তরাত্মা তাকে নির্দেশ দেয়—এটা না করে ওটা করলেই তোমার ভাল হবে। ফলে দুয়ের মধ্যে যে-কোনও একটি ঝোঁক তাকে মেনে নিতে হবেই, সরিয়ে রাখতে হবে অন্যটিকে। অর্থাৎ একটি যদি সঠিক হয়, অপরটি ভুল হতে বাধ্য। কিন্তু এখন আর নয়। পরে সুযোগমতো এগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

সামাজিক বোধ

অনেক জীবজন্তুই একসঙ্গে থাকতে ভালবাসে। এমনকী ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদেরও একসঙ্গে থাকার উদাহরণ আছে। যেমন, কয়েক প্রকার আমেরিকান বানর মিলেমিশে থাকে, আবার কিছু দাঁড়কাক, পাতিকাক ও স্টারলিং পাখিও একত্রে থাকতে পছন্দ করে। মানুষ ও কুকুর একে অপরের দারুণ ভক্ত। অনেকেই হয়তো লক্ষ করে থাকবেন যে ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীরা যখন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন কী বিষণ্ণই না দেখায় তাদের। আবার পুনর্মিলিত হওয়ার সময় প্রচণ্ড পারস্পরিক ভালবাসার প্রকাশ দেখা যায় এদের মধ্যে, বিশেষত ঘোড়া আর কুকুরদের মধ্যে। যে-কোনও কুকুরের কথা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তার প্রভুর ঘরে বা ওই পরিবারের কোনও-একজনের কাছে চুপচাপ বসে থাকে। কেউ তার দিকে নজর না দিলেও সে উচ্চবাচ্য করে না। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে হলে রাগে-দুঃখে ঘেউ-ঘেউ কুঁই-কুঁই জুড়ে দেয় সে। আমরা শুধু উচ্চশ্রেণির সামাজিক প্রাণীদের নিয়েই আলোচনা করব, পোকামাকড়ের কথা বাদ দিয়ে যাব। তবু বলে রাখা ভাল যে পোকামাকড়দের মধ্যেও কেউ কেউ

যে-কোনও একটি সামাজিক কর্তব্য পালন করা হলে তা অন্যদের ক্ষতিগ্রস্ত না করে পারে না। কিন্তু তিনি একটি বিষয় খেয়াল করেননি (যা তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন)। বিষয়টি হচ্ছে—মৌমাছিদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি তাদের সমাজের মঙ্গলের জন্যই অর্জিত হয়ে থাকে। এমনকী তিনি এ-ও বলেছেন যে, এই পরিচ্ছেদে আলোচিত নীতিজ্ঞানের তত্ত্বটিকে সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হলে 'আমি মনে করি তাদের বিজয়-উৎসবের মধ্যেই বেজে উঠবে মানবীয় গুণাবলির মৃত্যু-ঘণ্টা।' অবশ্য আশার কথা, পৃথিবীতে মানবীয় গুণাবলির স্থায়িত্বকে এত দুর্বল, এত ক্ষণস্থায়ী বলে অনেকেই মনে করেন না।

মিলেমিশে থাকতে ভালবাসে এবং নানাভাবে একে অপরকে সাহায্য করে। উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের পারস্পরিক সহায়তার সবথেকে চালু দৃষ্টান্ত হল একে অপরকে বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া। নিঃসন্দেহে সকলের সম্মিলিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যেই এই সাবধানবাণী দেওয়া হয়। ডঃ জ্যারগার-এর মতে, শিকারি মাত্রেই জানে পশুপাখিরা যখন একসঙ্গে বা দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন তাদের কাছে যাওয়া কতটা শক্ত। বুনো ঘোড়া বা গবাদি পশুরা বিপদকালীন বার্তা জানাতে পারে না বলেই আমার ধারণা। কিন্তু এদের মধ্যে প্রথম যে শত্রুকে দেখতে পায়, তার হাবভাবই অন্যদের সতর্ক হয়ে যেতে সাহায্য করে। বিপদের গন্ধ পেলে খরগোশরা তাদের পিছনের পা মাটিতে জোরে জোরে আঁচড়াতে থাকে। ভেড়া ও কৃষ্ণসার হরিণরা একইভাবে তাদের সামনের পা মাটিতে আঁচড়ায়, সেইসঙ্গে শিস্ দেওয়ার মতো জোরে একটা শব্দ করা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আবার অনেক পাখি ও কিছু স্তন্যপায়ী জীব বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করে। সীলমাছের ক্ষেত্রে সাধারণত এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় মেয়েরাই। বানরদের দলপতিই প্রহরী হিসেবে কাজ করে থাকে। বিপদ এলে এবং তা দূর হয়ে গেলে সে চিৎকার করে সকলকে জানান্ দেয়।[৪] তাছাড়া দলবদ্ধ প্রাণীরা নানারকম ছোটখাটো কাজের দ্বারা একে অপরকে সাহায্য করে। শরীরের কোনও অংশ চুলকোলে ঘোড়া বা গরুরা পরস্পরকে জিভ দিয়ে চেটে দেয়। বানররা তো একে অপরের শরীর থেকে উকুন বেছে দেওয়ার কাজে সিদ্ধহস্ত। ব্রেহ্ম্ জানিয়েছেন, সার্কোপিথেকাস গ্রিসিও-ভাইরিডিস নামে এক জাতের বানররা কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে দৌড়ানোর পর গাছের ডালের ওপর সটান শুয়ে পড়ে এবং অন্য একটি বানর 'বিবেকবুদ্ধি-মতো' তার দেহত্বক পরীক্ষা করতে করতে একে একে সবকটি কাঁটা বা কণ্টকময় বীজকোষ বার করে দেয়।

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজেও জীবজন্তুরা একে অপরকে সাহায্য করে থাকে। নেকড়ে ও কিছু শিকারি পশু দলবদ্ধভাবে শিকার করে এবং শিকারকে আক্রমণ করার সময় একে অপরকে সাহায্য করে। পেলিক্যান পাখিদের মাছ ধরার চেষ্টাও একটি যৌথ প্রয়াস। হামাড্রিয়াস নামক একপ্রকার বেবুন পোকামাকড় ইত্যাদি ধরার জন্য পাথর উলটে দেখে। সংখ্যায় ভারী হওয়ার পর তারা পাথরটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ায়, সবাই মিলে পাথরটাকে উলটে ফেলে, এবং অবশেষে লুঠের সামগ্রী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। দলবদ্ধ প্রাণীরা একে অপরের জীবনরক্ষার জন্যও তৈরি থাকে। উত্তর আমেরিকার পুরুষ-বাইসনরা বিপদের

৪। দ্রঃ, ব্রেহ্ম্, 'দেয়ার লেবেন', খণ্ড ১, পৃঃ ৫২, ৭৯। বানরদের একে অপরের দেহ থেকে কাঁটা বের করে দেওয়া (দ্রঃ, পৃষ্ঠা ৫৪) বা হামাড্রিয়াস বানর কর্তৃক পাথর উলটে দেওয়ার ঘটনাটি (দ্রঃ, পৃঃ ৭৬) অ্যালভারেজের থেকে নেওয়া হয়েছে, যাঁর বক্তব্যকে ব্রেহ্ম্ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে করেন। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বেবুন কর্তৃক কুকুরদের আক্রমণ করার ঘটনাটির জন্য দ্রঃ, পৃঃ ৭৯, এবং ঈগল পাখির ঘটনাটি সম্পর্কে দ্রঃ, পৃঃ ৫৬।

আঁচ পেলেই মেয়েদের আর বাচ্চাদের দলের মাঝখানে রেখে নিজেরা বাইরের দিকটা পাহারা দেয়। চিলিংহামে একবার দুটো জোয়ান বুনো ষাঁড় একসঙ্গে অন্য একটি বুড়ো ষাঁড়কে আক্রমণ করেছিল। আবার দুটো ঘোড়া তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য একটি ঘোড়াকে মাদি-ঘোড়াদের দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে—এ-ঘটনাও সমান সত্যি। আবিসিনিয়াতে ব্রেহ্‌ম্‌ সংখ্যায় যথেষ্ট ভারী একদল বেবুন দেখেছিলেন। তারা একটি উপত্যকা পার হচ্ছিল। অবস্থাটা ছিল এ-রকম যে, তাদের একটি অংশ বিপরীত দিকের পাহাড়ে উঠে গেছে, আর-একটি অংশ তখনও উঠতে পারেনি, উপত্যকাতেই রয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় একদল কুকুর নীচের দিকের এই বেবুনদের আক্রমণ করল। তাতে কী! ওপর থেকে শক্ত-সমর্থ পুরুষেরা তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে। তারপর হাঁ করে এমন ভয়ঙ্করভাবে চেঁচাতে শুরু করল যে অচিরেই কুকুরগুলো দৌড়ে পালাল। একটু পরে আবার নতুন উদ্যমে আক্রমণ শানাতে ফিরে এল তারা। কিন্তু ইতোমধ্যে একটি বাচ্চা-বেবুন ছাড়া আর সকলেই ওপরে পৌঁছে গেছে। বাচ্চাটি ছিল মাত্র মাস ছয়েকের। একটি পাথরের ওপর শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে সাহায্যের জন্য অনবরত চিৎকার করছিল সে। কোনও উপায় না দেখে একটা ষণ্ডা-মার্কা পুরুষ-বেবুন, এক সত্যিকারের বীর, পাহাড় থেকে আবার নীচে নেমে এসে ধীরে ধীরে বাচ্চাটির কাছে গেল, তাকে অভয় দিল এবং অবশেষে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে গেল। এই ঘটনায় কুকুরগুলো এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে আক্রমণ করতে পর্যন্ত ভুলে গেল তারা। এখানে আরও একটা ঘটনার কথা না বলে পারছি না। এক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষদর্শী স্বয়ং ব্রেহ্‌ম্‌। একটা ঈগল সার্কোপিথেকাস জাতের একটা বাচ্চা বানরকে ধরে ফেলেছিল। কিন্তু বাচ্চাটা গাছের ডাল এত শক্ত করে ধরে রেখেছিল যে ঈগলটার পক্ষে তৎক্ষণাৎ শিকার নিয়ে পালানো সম্ভব ছিল না। ইতোমধ্যে সাহায্যের জন্য চিৎকার জুড়ে দিয়েছে বাচ্চাটা। তাই শুনে দলের অন্যান্যরা বিকট চিৎকার করতে করতে তাকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে এল। ঈগলটিকে ঘিরে ফেলল তারা। তারপর শুরু হল পালক ওপড়ানোর পালা। ঈগলটির তখন আর শিকারের দিকে মন ছিল না, সে তখন শুধু ভাবছিল কীভাবে নিস্তার পাওয়া যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বেহ্‌মের অভিমত হল, ঈগলটি ভবিষ্যতে আর কখনও কোনও বানর-দলের একটা বানরকে একলা পেলেও আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।[৪]

৪। মিঃ বেল্ট নিকারাগুয়ার একটি অ্যাটেল্‌স্‌ জাতের বানরের (চলাফেরার অনেকটা মাকড়সার মতো) কথা বলেছেন। বানরটিকে তিনি বনের মধ্যে প্রায় দু'ঘণ্টা তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচাতে শুনেছিলেন। কারণ তার খুব কাছে একটি ঈগলপাখি বসে ছিল। কার্যত পাখিটা তাকে আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। মিঃ বেল্ট বানরদের আচরণ সম্পর্কে মনে করেন যে দরকার হলে তারা দু-তিনজন দল বেঁধেও ঈগলের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে (দ্রঃ, 'দ্য ন্যাচরালিস্ট ইন নিকারাগুয়া', পৃঃ ১১৮)।

নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে সঙঘবদ্ধ প্রাণীদের মধ্যে একটা পারস্পরিক ভালবাসা গড়ে ওঠে। পূর্ণবয়স্ক অ-সঙঘবদ্ধ প্রাণীদের মধ্যে কিন্তু এই ব্যাপারটা দেখা যায় না। অবশ্য একটি প্রাণী আর-একটি প্রাণীর সুখে বা দুঃখে সত্যিসত্যি কতখানি সহমর্মিতা বোধ করে, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে—বিশেষত যখন কোনও প্রাণী আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। তবে সুখ্যাত পর্যবেক্ষক মিঃ বাক্সটন বলেছেন, তাঁর কাকাতুয়াগুলি (যারা আগে নরফোকে প্রকৃতির মধ্যে খোলামেলা অবস্থায় থাকত) প্রতিটি জোড়ের (একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে-কাকাতুয়ার) বাসা-বাঁধার কাজে 'দারুণ আগ্রহ' প্রকাশ করত। মেয়ে-কাকাতুয়াটির যখন উড়ে চলে যাওয়ার সময় হত, তখন তারা তাকে ঘিরে 'তার সৌজন্যার্থে তারস্বরে জয়ধ্বনি করত'। আবার বেশিরভাগ প্রাণী তাদের স্ব-জাতির দুঃখ-কষ্টে সাড়া দেয় কিনা, তা বিচার করা বেশ শক্ত। গরুরা যখন তাদের মৃতপ্রায় বা মৃত সঙ্গীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তখন কারও পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয় তারা কী অনুভব করছে। হাউজা তো স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে আপাতভাবে তারা (গরুরা) কোনও বেদনাই অনুভব করে না। কখনও-কখনও জীবজন্তুদের মধ্যে সহমর্মিতার কোনও ছাপই থাকে না। দেখা গেছে কোনও একটি জন্তু অসুস্থ বা জখম হলে পুরো দলটি তাকে ফেলে রেখে চলে যায়, কিংবা তাকে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে বা কামড়ে আরও দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। জীবজগতের ইতিহাসে এটাই বোধহয় সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা। অবশ্য এর পিছনে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অন্য কথা। ব্যাখ্যাটা হল, জীবজন্তুরা সহজাত প্রবৃত্তির বশে বা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করার পরই তাদের আহত সঙ্গীকে পরিত্যাগ করে, যাতে অন্য কোনও শিকারি-জন্তু বা মানুষ তাদের অনুসরণ করতে না পারে। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানরাও অনেকটা এ-রকম আচরণই করে থাকে। তারা তাদের দুর্বল সাথীদের সমতলে ফেলে আসে। ফলে তারা দ্রুত মারা যায়। ফিজিয়ানরা তো মা-বাবা বৃদ্ধ বা অসুস্থ হলে তাদের জ্যান্ত কবর দিয়ে স্বস্তি পায়!

কোনও-একটি প্রাণী অসুবিধেয় পড়েছে বা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে আর তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে অন্য একটি প্রাণী—জীবজগতে এ রকম উদাহরণ নেহাত কম নয়। এমনকী পাখিদের মধ্যেও এ-রকম ঘটনা দেখা যায়। ক্যাপ্টেন স্ট্যান্‌স্‌বারি উটা-র একটি লবণ-হ্রদে বৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ অন্ধ কিন্তু বেশ নাদুসনুদুস একটা পেলিক্যান পাখি (এক ধরনের জলচর পাখি) দেখেছিলেন। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে পাখিটাকে নিশ্চয়ই তার সঙ্গী-সাথীরা দীর্ঘদিন ধরে আহার জুগিয়ে চলেছিল।[৫] মিঃ ব্লাইথ আমাকে জানিয়েছেন, কিছু ভারতীয় কাক তাদের দু-তিনটি

৫। ক্যাপ্টেন স্যটান্‌স্‌বারি-ও একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কথা বলেছেন। নেহাত বাচ্চা একটি পেলিক্যান-শাবক খরস্রোতা একটি নদীতে ভেসে যাচ্ছিল। সেই সময় গোটা ছয়েক বৃদ্ধ পেলিক্যান তাকে তীরে ফিরে আসার জন্য নানারকম নির্দেশ ও উৎসাহ দিচ্ছিল।

অন্ধ সাথীকে খাইয়ে দিচ্ছে—এ ঘটনা তিনি দেখেছেন। গৃহপালিত মুরগিদের মধ্যে অনুরূপ একটি ঘটনার কথাও সম্প্রতি আমার কানে এসেছে। ইচ্ছে করলে এই কাজগুলিকে আমরা সহজাত প্রবৃত্তিপ্রসূত বলে ধরে নিতে পারি। কিন্তু লক্ষণীয় যে, কোনও বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশের ক্ষেত্রে এ-রকম ঘটনা প্রায় বিরল।[৬] আর-একটা ঘটনার কথা বলি। এবার প্রত্যক্ষদর্শী অন্য কেউ নয়, আমি নিজেই। একটা কুকুর আর একটা বিড়ালের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব ছিল। একবার বিড়ালটি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। একটা ঝুড়ির মধ্যে সবসময় শুয়ে থাকত সে। যখন কুকুরটি বিড়ালটির পাশ দিয়ে যেত, তখনই দু-একবার তার শরীরে জিভ বুলিয়ে দিত। আমি নিশ্চিত যে তার মধ্যে একটা দয়ালু মনোভাব কাজ করছিল।

প্রভুকে কেউ আক্রমণ করছে দেখলে যে-কোনও সাহসী কুকুরই আক্রমণকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর উৎস কিন্তু সহমর্মিতাই। একটু উদাহরণ টেনে বলা যাক। একবার এক ব্যক্তি একজন মহিলাকে মারার ভান করছিল। মহিলার কোলে ছিল ভারী শান্তশিষ্ট একটা ছোট কুকুর। আগে কখনও কুকুরটার এ-রকম অভিজ্ঞতা হয়নি। ফলে অচিরেই সে মহিলাকে বিপন্ন দেখে সাহায্যের জন্য লাফিয়ে উঠল। কিন্তু অভিনয় তো আর বেশিক্ষণ চলতে পারে না। একটু পরেই তা শেষ হল। শেষ হতেই কুকুরটা পরম আন্তরিকতায় সেই মহিলার মুখে জিভ বুলিয়ে বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। তার আচরণের মধ্যেই ফুটে উঠছিল কতটা কষ্ট পেয়েছে সে। ব্রেহ্‌ম্ জানিয়েছেন, বেবুনদের খাঁচায় তিনি যখন একটি বেবুনকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে ধরতে গিয়েছিলেন, তখন অন্যরা তাড়াতাড়ি তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। এই ব্যাপারটিকেই আমরা সহানুভূতি বা সহমর্মিতা বলব। একটু আগেই আমরা দেখেছি বেবুন বা সার্কোপিথেকাস বানররা কেমন করে তাদের বাচ্চাদের কুকুর বা ঈগলের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এ-ও সেই সহমর্মিতারই প্রকাশ। আমি এখানে সহানুভূতি ও বীরত্বপূর্ণ আচরণের আর একটিমাত্র উদাহরণ পেশ করব। এ-ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু একটি খুদে আমেরিকান বানর। বেশ কয়েক বছর আগে চিড়িয়াখানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁর গলার পিছনদিকে শুকিয়ে আসা একটা গভীর ক্ষত দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন—এর জন্য দায়ী একটা গুন্ডা বেবুন। ওই খুদে বানরটির সঙ্গে কর্মচারীটির দিব্যি একটা বন্ধুত্ব ছিল। বানরটি আর বেবুনটি একই খাঁচায় থাকত—বেশ বড় মাপের খাঁচা। বিপুলাকার বেবুনটিকে খুবই ভয় পেত বানরটি। একদিন বেবুনটি আক্রমণ করে ওই কর্মচারীটিকে। তখন, বন্ধুকে বিপদগ্রস্ত দেখে, নিজের ভয়-ভীতি ভুলে, ছুটে আসে সে। শুরু করে চিৎকার, আঁচড়ে-কামড়ে নাজেহাল করে তোলে বেবুনটিকে। ফলে পালাতে সমর্থ হয় কর্মচারীটি। পরে চিকিৎসকই তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন।

৬। মিঃ বেইন বলেছেন, 'দুর্দশাগ্রস্তকে কার্যকরী সহায়তা জোগানোর উৎস হল যথার্থ সহমর্মিতা।' (দ্রঃ, 'মেন্টাল অ্যান্ড মর‍্যাল সায়েন্স', পৃঃ ২৪৫)।

ভালবাসা ও সহানুভূতি ছাড়াও জীবজন্তুরা সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানুষের মধ্যে এইসব গুণকেই আমরা নৈতিক বোধ বলে থাকি। আগাসি-র সঙ্গে আমি একমত যে কুকুরদের মধ্যে বিবেকবোধ ধরনের একটা কিছু থাকেই।

কুকুরদের মধ্যে খানিকটা আত্মদমন বা সহিষ্ণুতার গুণ দেখা যায়। এর সমস্তটাই যে ভয়জনিত কারণে, তা ভাবলে ভুল হবে। ব্রবাখ্ বলেছেন, কুকুররা কখনও তাদের প্রভুর অনুপস্থিতিতে খাবার চুরি করে না। দীর্ঘকাল ধরেই কুকুরদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার প্রতীক বলে মনে করা হয়। হাতিরাও তাদের মাহুত বা রক্ষকের অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। সম্ভবত মাহুতকে তারা দলনেতা বলেও মনে করে। ডঃ হুকার তাঁর ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা আমাকে জানিয়েছেন। ভারতবর্ষে একবার হাতির পিঠে চড়ার সময় তাঁর হাতিটির পা এমন বিশ্রীভাবে একটি জলাভূমিতে পুঁতে গিয়েছিল যে পরের দিন লোকজন এসে দড়ি দিয়ে টেনে না-তোলা পর্যন্ত হাতিটিকে ওই অবস্থাতেই থাকতে হয়েছিল। সাধারণত এ-রকম অবস্থায় হাতিরা মৃত বা জীবিত যে-কোনও বস্তুকেই শুঁড় দিয়ে টেনে হাঁটুর তলায় ফেলে দেয়, যাতে সে মাটির আরও গভীরে গেঁথে না যায়। ফলে মাহুতটি ভীত হয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে হাতিটা হয়তো ডঃ হুকারকে তুলে নিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাহুত বা হুকার, কারোরই কোনও বিপদ ঘটেনি। হাতির মতো এত ভারী একটা প্রাণীর পক্ষে বিপদে পড়েও এ-রকম সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া কল্পনাতীত ব্যাপার। নিঃসন্দেহে এটি মহান আনুগত্যেরই একটি চমৎকার নিদর্শন।

দলবদ্ধ প্রাণীরা যেহেতু যৌথভাবে আত্মরক্ষা বা শত্রুকে আক্রমণ করে, সেহেতু তারা নিশ্চয়ই একে অপরের প্রতি কিছুটা বিশ্বস্তও থাকে। আবার তারা যদি কোনও-একজন দলনেতাকে মেনে চলে, তাহলে নিশ্চয়ই তার প্রতিও তাদের কিছুটা আনুগত্য থাকে। আবিসিনিয়াতে বেবুনরা দল বেঁধে শস্যখেতে লুঠ করতে যাওয়ার সময় তাদের নেতাকেই নিঃশব্দে অনসুরণ করে। কোনও নির্বোধ বাচ্চা গোলমাল করলে অন্যদের চড়-চাঁটি লেখা থাকে তার কপালে। কড়া নির্দেশ—চুপ করো, দলনেতার অনুগত থাকো। মিঃ গ্যাল্টন সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকায় একদল আধা-বুনো গবাদি পশুর দেখা পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, এই পশুরা মুহূর্তের জন্যেও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। এদের চরিত্রটাই দাসসুলভ। নেতা হওয়ার মতো যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন কোনও ষাঁড়ের নেতৃত্ব এরা মেনে নেয় নির্বিবাদে, তার চেয়ে ভাল কিছু খুঁজতে যায় না। এইসব পশুদের গলায় মানুষের প্রভুত্ব জিন পরানোর সময় দেখা গেছে, এদের মধ্যে যারা ঘাস খেতে দল ছেড়ে দূরে যায়, তারা এমন আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাবাপন্ন যে তাদের ধরা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। তাদের এই মনোভাব নিঃসন্দেহে এগিয়ে-থাকা ষাঁড়ের লক্ষণ। মিঃ গ্যাল্টনের মতে, এ-রকম পশু খুবই দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান। আবার সংখ্যাধিক্য ঘটলে দ্রুতই এরা তাদের জন্য

অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে, যেমন দেখা যায় সিংহদের মধ্যে। দলছুট সিংহকে শাস্তি দেবার জন্যে তারা বন্য হয়ে ফেরে।

কিছু সংখ্যক পশুপাখি এই যে একসঙ্গে থাকে বা একে অপরকে নানাভাবে সাহায্য করে, তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও তাড়না আছে। কী সেই তাড়না? সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাড়না হিসেবে কাজ করে তাদের পরিতৃপ্তি বা আনন্দ বোধ, যা তারা অর্জন করে সহজাত প্রবৃত্তির বশে বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে। আবার এমনও হতে পারে যে এটা আসলে তাদের অন্যান্য সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে অবদমন করার অতৃপ্তিজনিত তাড়না। অসংখ্য ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়, আর তার চমৎকার ব্যাখ্যাও মেলে আমাদের গৃহপালিত পশুদের দ্বারা অর্জিত সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে। মেষপালকের কুকুর কখনওই ভেড়ার পালকে বিরক্ত করে না, বরং তাদের চারপাশে মনের আনন্দে ছোটাছুটি করে, পালটাকে ঠিকঠাক চালনা করে। শিয়াল-শিকারি কুকুররা (কক্সহাউন্ড) শিয়াল শিকার করে খুশি হয়, আবার অন্য অনেক কুকুর শিয়ালদের মোটেই পছন্দ করে না—এ আমার নিজের চোখে দেখা। ভাবলে অবাক লাগে, মনের মধ্যে পরিতৃপ্তির কি গভীর উপলব্ধিই না একটি কর্মব্যস্ত পাখিকে তার ডিমের উপর দিনের-পর-দিন তা দিতে উদ্বুদ্ধ করে। ঘুরে বেড়াতে না পারলে যাযাবর পাখিদের অবস্থা খুব করুণ হয়ে ওঠে। দু-ডানায় ভর দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার মধ্যেই হয়তো তারা খুঁজে পায় অপার আনন্দ। কিন্তু অদুবন্ বর্ণিত সেই হতভাগ্য ডানা-কাটা রাজহাঁসটি পায়ে হেঁটে প্রায় হাজার মাইলব্যাপী যাত্রার সময় কোনওরকম আনন্দ অনুভব করেছিল বলে মনে হয় না। অন্যদিকে, কিছু সহজাত প্রবৃত্তির গভীর আধার হল দুঃখের অনুভূতি বা ভয়, যার ফলে গড়ে ওঠে আত্মরক্ষার কৌশল এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই কৌশল বিশেষ কিছু শত্রুর দিকে পরিচালিত হয়। আমার মতে, আনন্দ বা দুঃখের অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে অনেক সময় এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি আনন্দ বা দুঃখের উত্তেজনা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রেও অবিরাম অনুসৃত হতে পারে। কোনও বাচ্চা শিকারি-কুকুর প্রথমবার শিকার খুঁজতে বেরিয়ে শিকারের গন্ধ পেলে চিৎকার করবেই। আবার, খাঁচার মধ্যে কোনও কাঠবিড়ালী বাদাম ভেঙে খেতে পারে না বলেই মাটিতে কবর দেওয়ার মতো করে বাদামটিতে মৃদু মৃদু আঘাত করে। কিন্তু তা'বলে সে (কাঠবিড়ালীটি) কোনও আনন্দ বা দুঃখ থেকে এ-কাজ করে না। আর তাই এই ধারণাটাও বোধহয় ভুল যে মানুষের প্রতিটি কাজের পিছনে রয়েছে কোনও-না-কোনও আনন্দ বা দুঃখের অভিজ্ঞতা। আনন্দ বা দুঃখের অনুভূতি ছাড়াও কোনও অভ্যাসকে মানুষ অন্ধভাবে ও সন্দেহহীনভাবে অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু এ-রকম অভ্যাসকে জোর করে বা হঠাৎ থামিয়ে দিলে সাধারণত এক ধরনের অতৃপ্তিবোধ সৃষ্টি হয়।

অধিকাংশ সময় আমরা ধরে নিই যে জীবজন্তুরা প্রাথমিক অবস্থায় দলবদ্ধ-ভাবেই বসবাস করত এবং পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে অস্বস্তি বোধ আর

একসঙ্গে থাকতে পারলে স্বস্তি বোধ করত। কিন্তু এর চেয়েও সম্ভাব্য মত হল—যৌথভাবে বসবাস করার অনুভূতি প্রাণীদের মনে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল এই কারণে যে, দলবদ্ধভাবে বাস করলে যে-সব প্রাণী লাভবান হবে, তারা যেন দলবদ্ধভাবেই থাকতে পারে, ঠিক যেমন খিদে-বোধ ও খাওয়ার আনন্দ থেকেই প্রাণীরা খেতে শিখেছিল। দলবদ্ধভাবে থাকার আনন্দটা হয়তো বাবা-মা বা সন্তানের প্রতি ভালবাসারই একটা বর্ধিত রূপ, কারণ দীর্ঘদিন বাবা-মা-র সঙ্গে একত্রে থাকার পর সন্তানের মধ্যে সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি বিকশিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ভালবাসার এই বর্ধিত রূপের পিছনে অভ্যাসের নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা আছে, কিন্তু এর মূল কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। কেননা ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বসবাসকারী প্রাণীরা একসঙ্গে থাকার আনন্দেই শুধু মত্ত ছিল না, তারা সহজেই নানান বিপদকেও এড়িয়ে যেতে পারত, আর অন্যদিকে বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ প্রাণীরা বিশাল সংখ্যায় প্রাণ হারাত। আবার বাবা-মা ও সন্তানের প্রতি যে ভালবাসার কথা বলা হল, যা স্পষ্টতই বিভিন্ন সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির ভিত্তিভূমি, তার উৎস-ই বা কী? এখানেও আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিন্তু এটুকু আমরা ধারণা করতে পারি যে প্রাকৃতিক নির্বাচন একে অনেকটাই সহায়তা করেছে। আবার নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে ঘৃণার অস্বাভাবিক ও বিরুদ্ধ-অনুভূতিও অনেকটা প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল, যেমন শ্রমিক-মৌমাছিরা তাদের নিষ্কর্মা ভাইদের মেরে ফেলে বা রানি-মৌমাছি মেরে ফেলে তার মেয়েদের। এক্ষেত্রে নিকট-আত্মীয়দের ধ্বংস করার এই প্রবৃত্তিটা তাদের সমাজের কল্যাণই করে থাকে। তারা-মাছ, মাকড়সা প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যে সন্তানপ্রীতি বা তার সমতুল অনুভূতি খুবই কম। কখনও কখনও কোনও প্রজাতির শুধুমাত্র গুটিকতক প্রাণীর মধ্যেই প্রীতি-সম্পর্কীয় এইসব অনুভূতির দেখা পাওয়া যায়। ফরফিকুলা বা কেন্নোজাতীয় কিছু নিকৃষ্ট প্রাণী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সহানুভূতির জন্য যে আবেগ জরুরি, তা কিন্তু ভালবাসার থেকে আলাদা। যেমন, ঘুমন্ত শিশুর দিকে চেয়ে মায়ের মনে ভালবাসার এক গভীর আবেগ জেগে উঠতেই পারে, কিন্তু তা থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে মা তাঁর শিশুর জন্যে সহানুভূতি বোধ করছেন।

আবার কুকুরের জন্যে তার প্রভুর ভালবাসা বা প্রভুর জন্যে কুকুরের ভালবাসার মধ্যেও সহানুভূতির কোনও প্রশ্ন ওঠে না। মিঃ বেইন সম্প্রতি যা বলেছেন, অ্যাডাম স্মিথ তা অনেক আগেই বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—ফেলে-আসা সুখ-দুঃখকে মনের গভীরে লালন করার যে বিপুল ক্ষমতা রয়েছে আমাদের, তা-ই হচ্ছে সহানুভূতির উৎসস্থল। সেইজন্যে 'অন্য কোনও ব্যক্তিকে খিদে, ঠান্ডা বা ক্লান্তিতে কষ্ট পেতে দেখলে আমাদের মনে নিজেদের ওইরকম অবস্থার স্মৃতিগুলা জেগে ওঠে, আর এইসব স্মৃতির চিন্তাটুকু পরম যন্ত্রণাময়।' তখনই আমরা অপরের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে উদ্যোগী হই, যাতে করে একইসঙ্গে আমাদের নিজেদের দুঃখের অনুভূতিগুলোও প্রশমিত হতে পারে। একই কারণে আমরা অপরের আনন্দ বা

আহ্লাদে সাড়া দিয়ে থাকি।[৭] কিন্তু ভালবাসার পাত্রের জন্য যে-রকম তীব্রমাত্রার সহানুভূতি প্রকাশ পায়, অন্য কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা পায় না কেন—তার কারণকে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, আমার জানা নেই। আবার অনেকসময় দেখা যায়, কারুর প্রতি ভালবাসা না থাকলেও তার দুঃখ আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে নিজেদের ফেলে-আসা দুঃখের স্মৃতিকে, অনুপুঙ্খ সমেত। এর কারণ হয়তো এই যে, সমস্ত প্রাণীরা শুধুমাত্র নিজ গোষ্ঠীর প্রাণীদের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকে, অর্থাৎ পরিচিত বা কম-বেশি ভালবাসার পাত্রদের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করে তারা, কিন্তু তাই বলে একই প্রজাতিভুক্ত সকলের প্রতি সহানুভূতি দেখায় না। যেমন, বহু প্রাণী কিছু বিশেষ শত্রুকেই ভয় পায়। দলবদ্ধভাবে থাকে না এমন প্রজাতির প্রাণীরা, যেমন বাঘ বা সিংহ, তারাও কিন্তু তাদের নিজেদের বাচ্চাদের দুঃখ-কষ্টে গভীর সহানুভূতি-শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে তার স্বার্থপরতা, অভিজ্ঞতা ও অনুকরণপ্রিয়তা। কারণ প্রতিদান পাওয়ার আশা নিয়েই আমরা অপরকে সহানুভূতি দেখাই। আর অভ্যাসের ফলে সহানুভূতি অনেক দৃঢ়মূল হয় ওঠে। এই অনুভূতির উৎস যত জটিলই হোক না কেন, যে-সব প্রাণীরা পরস্পরকে সাহায্য ও রক্ষা করে, তাদের ক্ষেত্রে এই অনুভূতি বেড়ে ওঠে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত। কেননা যে-সব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে গভীর সহানুভূতিশীল প্রাণীর সংখ্যা সব থেকে বেশি, তাদের উন্নতিও হয় বেশি এবং তারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নবজাতককে লালন-পালন করতেও সক্ষম।

তবে অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে যে কিছু সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে অর্জিত, নাকি সহানুভূতি, চিন্তা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা, অনুকরণপ্রবণতা প্রভৃতি অন্য কিছু সহজাত প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তির পরোক্ষ ফল, নাকি এগুলি শুধুমাত্র দীর্ঘ অভ্যাসের ফলস্বরূপই এসেছে। যেমন, জীবজন্তুদের একটি উল্লেখযোগ্য সহজাত প্রবৃত্তি হল, দলকে বিপদ থেকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে নিজেদের মধ্যেকার একজনকে প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করা। আমরা নিশ্চয়ই এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র মনোবৃত্তির পরোক্ষ ফল বলে মেনে নিতে পারি না, কেননা স্পষ্টতই এটা প্রত্যক্ষভাবে অর্জিত। অন্যদিকে, কিছু কিছু দলবদ্ধ প্রাণীর পুরুষরা অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে তাদের সম্প্রদায় বা দলকে রক্ষা করে কিংবা যৌথভাবে শত্রু

৭। অ্যাডাম স্মিথ-এর 'থিয়োরি অফ মর‍্যাল সেন্টিমেন্টস' গ্রন্থের প্রথম ও চাঞ্চল্যকর পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য। এছাড়াও দেখুন মিঃ বেইন্‌স-এর লেখা 'মেন্টাল অ্যান্ড মর‍্যাল সায়েন্স', ১৮৬, পৃঃ ২৪৪, এবং ২৭৫-২৮২। মিঃ বেইন বলেছেন, 'সহানুভূতিশীল ব্যক্তির কাছে সহানুভূতি আনন্দ লাভ করার একটি পরোক্ষ উপায় পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন। পরে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'উপকৃত ব্যক্তি বা অন্যেরা সহানুভূতি এবং সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক কাজের সাহায্যে নিজেদের প্রাপ্যের প্রতিদান দিতে পারে।' কিন্তু সহানুভূতি যদি একটি সহজাত প্রবৃত্তি হয় (আপাতভাবে তা-ই দেখা যাচ্ছে), তাহলে সহানুভূতি প্রকাশের সাহায্যে পূর্বোল্লিখিত প্রায় সকল সহজাত প্রবৃত্তির মতোই আমাদের মনে সরাসরি আনন্দের অনুভূতি জাগাই স্বাভাবিক।

বা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা সম্ভবত পারস্পরিক সহানুভূতিরই প্রকাশ। কিন্তু সাহসিকতা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিও সম্ভবত প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে আগে থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে কতকগুলি তুলনায় বেশি শক্তিশালী, অর্থাৎ এগুলির চর্চায় পাওয়া যায় বেশি আনন্দ এবং এগুলিকে চেপে রাখলে কষ্টের পরিমাণও বাড়ে। অথবা, আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এগুলি বংশানুক্রমে অনেক বেশি দৃঢ়ভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে এবং তার জন্য সুখ-দুঃখের বিশেষ কোনও অনুভূতিও সৃষ্টি হয় না। আমরা নিজেদের বেলাতেও জানি এমন কতকগুলি অভ্যাস আমাদের থাকে, যেগুলিকে অন্য অনেক অভ্যাসের মতো সহজে সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না। তাই প্রায়শই প্রাণীদের বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বা কোনও সহজাত প্রবৃত্তি ও কিছু অভ্যাসগত আচরণের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। যেমন, একটি কুকুর কোনও খরগোশকে তাড়া করার সময় যদি তিরস্কৃত হয়, তাহলে সে মুহূর্তের জন্যে থামে, একটু ইতস্তত করে, তারপর আবার ছুটে যায়, কিংবা লজ্জিত হয়ে প্রভুর কাছে ফিরে আসে। আবার, কোনও মেয়ে-কুকুর একদিকে তার বাচ্চা আর অন্যদিকে তার প্রভু, এই দুয়ের প্রতি ভালবাসা নিয়ে সমস্যায় পড়ে। তাই যখন সে তার বাচ্চাদের কাছে চুপিচুপি সরে পড়ে, তখন তার প্রভুকে সঙ্গ না দেওয়ার লজ্জা তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার জানা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক উদাহরণটি হল দেশান্তরে উড়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তিটির কাছে মাতৃত্বের মতো একটি প্রবৃত্তিও তুচ্ছ হয়ে যায়। দেশান্তর গমনের প্রবৃত্তি এতই শক্তিশালী যে, যদি কোনও পাখিকে তার দেশান্তরের মরশুমে খাঁচা-বন্দী করে রাখা হয়, তাহলে সে খাঁচার তারে নিজের বুক ঘষতে থাকে, এবং যতক্ষণ না তা পালকশূন্য ও রক্তাক্ত হয়ে ওঠে ততক্ষণ এই মরণ-যজ্ঞ শেষ হয় না। আবার এই প্রবৃত্তির বশেই স্যামন মাছেরা তাদের বাঁচার পক্ষে অনুকূল জল থেকে লাফিয়ে ডাঙায় ওঠে এবং একরকম ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আত্মাহুতি দেয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সন্তানের প্রতি ভালবাসা বা মাতৃত্ববোধ অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সহজাত বোধ, আর তার প্রভাবেই ভীরু স্বভাবের দুর্বল পাখিরাও আত্মরক্ষার কথা ভুলে চরম বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে—অবশ্য কিছু দ্বিধা তাদের থাকেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, দেশান্তর গমনের প্রবৃত্তি এত শক্তিশালী যে শরৎকালের শেষে সোয়ালো, হাউসমার্টিন, সুইফ্‌ট্ প্রভৃতি পাখিরা বাসায় অসহায় বাচ্চাদের মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখেও দিব্যি উড়ে যায়।[৮]

৮। রেভারেন্ড এল. জেনিন্স জানিয়েছেন (দ্রঃ, জেনিন্স সম্পাদিত 'হোয়াইটন্ ন্যাচরাল হিস্ট্রি অফ সেলবরন', ১৮৫৩, পৃঃ ২০৪), মহান জেনার সর্বপ্রথম এই ঘটনাটি নথিভুক্ত করেছিলেন (দ্রঃ, 'ফিল. ট্র্যানজ্যাকট্', ১৮২৪) এবং তারপর অনেকেই, বিশেষত মিঃ ব্লাকওয়াল, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দু-বছর ধরে ৩৬টি পাখির বাসায় অনুসন্ধান চালান, সময় হিসেবে বেছে নেন শরৎকালের শেষ দিকটা। তিনি দেখেন—১২টি বাসায় পড়ে আছে পাখির মৃত ছানা, ৫টিতে

কোনও সহজাত আবেগ যদি একবার কোনও প্রজাতির পক্ষে অন্যান্য বা বিপরীতধর্মী সহজাত প্রবৃত্তির থেকে বেশি উপকারী বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে অন্য প্রবৃত্তিগুলোর তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কারণ যে-সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এই আবেগটি বিশেষভাবে বিকশিত হয়, বাস্তবে তারাই বেশি সংখ্যায় টিকে থাকে। অবশ্য এইভাবে মাতৃস্নেহের সঙ্গে দেশান্তরে উড়ে যাওয়ার প্রবৃত্তির তুলনা করা যায় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেননা, বছরের কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়েই সারা দিন ধরে যাযাবর পাখিদের এই অধ্যবসায় বা ব্যস্ততা অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে উঠতে দেখা যায়।

মানুষ সামাজিক জীব

মানুষ যে সামাজিক জীব, সে-ব্যাপারে কারোরই দ্বিমত থাকার কথা নয়। মানুষের এই সামাজিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখি সে একা-একা থাকতে পছন্দ করে না বা পারিবারিক জীবনের বাইরেও অন্যদের সঙ্গ কামনা করে। তাই তার পক্ষে নির্জন কারাবাস একটি কঠিন শাস্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়। কোনও কোনও লেখক মনে করেন, একেবারে গোড়ার দিকে মানুষ পৃথক পৃথক পরিবারে বিভক্ত হয়ে বাস করত। কিন্তু বর্তমানে কোনও একটিমাত্র বা একসঙ্গে দু-তিনটি অ-সভ্য পরিবার নির্জন বনে-জঙ্গলে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়ালেও, একই অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে তাদের সবসময় একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকেই। তেমন প্রয়োজন হলে এই পরিবারগুলি একে অপরের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে, এমনকী বিপদের সময় তারা দল বেঁধে শত্রুর মোকাবিলাও করে। এ-কথা ঠিক যে পাশাপাশি অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বেশির ভাগ সময় হানাহানি লেগেই থাকে। কিন্তু এ থেকে যদি সিদ্ধান্ত করতে বসি যে অ-সভ্য লোকেরা সামাজিক জীব নয়, তাহলে সেটা অসঙ্গত হবে। কেননা একই প্রজাতিভুক্ত সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই যে সমাজবদ্ধতার সহজাত প্রবণতা দেখা যাবে, এমন কোনও কথা নেই। হাত-পা-ওয়ালা অধিকাংশ প্রাণীর আচার-আচরণ একইরকম বলে আমরা ধরে নিতে পারি, মানুষের বানর-সদৃশ আদি পূর্বপুরুষরাও তাদের মতোই সামাজিক প্রাণী ছিল। তবে এটা আমাদের আলোচনায় খুব-একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একথা ঠিক যে বর্তমান সময়ের মানুষের মধ্যে তাদের আদি-পূর্বপুরুষদের দ্বারা অর্জিত বিশেষ বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তিগুলির

স্ফুটনোন্মুখ ডিম, আর ৩টিতে রয়েছে অপরিণত ডিম। যে-সব পাখি তখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার মতো সক্ষম হয়ে ওঠেনি, তাদেরকেও ফেলে যাওয়া হয়েছে (দ্রঃ, ব্ল্যাকওয়াল-এর 'রিসার্চেস ইন জুলজি', ১৮৩৪, পৃঃ ১০৮, ১১৮। খুব-একটা দরকার না থাকলেও অতিরিক্ত প্রমাণাদির জন্য দেখুন, লেরয়-এর 'লেটারস্ ফিলং', ১৮০২, ২১৭, আর সুইফ্‌ট্ পাখিদের বিবরণ জানার জন্য দেখুন, গোল্ড-এর 'ইনট্রোডাক্‌শন টু দ্য বার্ডস অফ গ্রেট ব্রিটেন', ১৮২৩, পৃঃ ৫)। মিঃ অ্যাজম্‌স্-ও কানাডায় অনুরূপ ঘটনা লক্ষ করেছেন (দ্রঃ, 'পপুলার সায়েন্স রিভিউ', জুলাই ১৮৭৩, পৃঃ ২৮৩)।

প্রায় সবক'টিই নষ্ট হয়ে গিয়ে কয়েকটি মাত্র টিকে আছে। কিন্তু তাই বলে সে তার পাড়া-পড়শির জন্যে কিছু পরিমাণ সহজাত প্রবৃত্তিগত ভালবাসা ও সহানুভূতি বোধ করবে না, এটা কোনও কাজের কথা নয়। সত্যি বলতে কি, আমরা প্রত্যেকেই জানি আমাদের মধ্যে এ-রকম সহানুভূতি বোধ রয়েছে,[৯] কিন্তু আমাদের সচেতনতা দিয়ে আমরা বলতে পারি না যে এগুলি নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মতো একইরকম উপায়ে বহুদিন আগে সৃষ্ট কোনও সহজাত প্রবৃত্তি, নাকি আমরা প্রত্যেকে আমাদের শৈশবে এগুলি অর্জন করে থাকি। আবার মানুষ সামাজিক জীব বলেই আমরা প্রায় নিশ্চিত করে বলতে পারি যে উত্তরাধিকারসূত্রেই সে তার সঙ্গীসাথীদের প্রতি বিশ্বস্ত হতে ও গোষ্ঠীর দলপতিকে মেনে চলতে শেখে। অধিকাংশ সমাজবদ্ধ প্রাণীদের মধ্যেই এই গুণগুলি দেখা যায়। এই গুণের ফলে মানুষের মধ্যে কিছুটা আত্মসংযমের ক্ষমতাও থাকে। তাছাড়া প্রবৃত্তির বশেই সে তার অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে শত্রুর মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হয় এবং সঙ্গীদের যে-কোনও উপায়ে সাহায্য করতে তৈরি থাকে, যদি না তাতে তার নিজের উন্নতি বা প্রবল ইচ্ছার ক্ষেত্রে তেমন কোনও বড় রকমের হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। সমাজবদ্ধ জীবদের মধ্যে যারা নীচের সারিতে রয়েছে, তারা প্রায় পুরোপুরিভাবে এবং ওপরের সারিতে অবস্থিত জীবেরা অনেকটা পরিমাণে, বিশেষ বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তির বশে নিজ নিজ সমাজের অন্যান্যদের সাহায্য করে থাকে। কিন্তু সেইসঙ্গেই তারা পারস্পরিক ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারাও পরিচালিত হয়, আর তার পাশাপাশি থাকে কিছুটা যুক্তি-বিবেচনা। যদিও একটু আগেই বলা হয়েছে যে মানুষের এমন কোনও বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তি থাকে না যা তাকে তার প্রতিবেশীদের সাহায্য করার উপায় বাতলে দিতে পারে, তবু এ-কথা অনস্বীকার্য যে তার মধ্যে একটা আবেগ বা তাড়না কাজ করে এবং উন্নত বৌদ্ধিক ক্ষমতা থাকার ফলে এ-ব্যাপারে সে তার যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই চালিত হয়। আবার, সহজাত প্রবৃত্তিগত সহানুভূতির ফলে সে তার সঙ্গী-সাথীদের মতামতকে বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকে। মিঃ বেইন স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন, প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, গৌরব অর্জনের প্রবল ইচ্ছা এবং অবজ্ঞা ও অপযশ সম্বন্ধে নিদারুণ ভীতি—'সহানুভূতিই হচ্ছে এ-সবের জন্মদাতা।' ফলে মানুষ তার সঙ্গীসাথীদের ইচ্ছা, সম্মতি ও দোষারোপ দ্বারাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়, যে-ভাবগুলি ফুটে ওঠে তাদের অঙ্গভঙ্গি ও কথার মধ্যে। তাই অত্যন্ত আদিম অবস্থায় থাকার সময়, এমনকী হয়তো সেই বানর-সদৃশ আদি পূর্বপুরুষদের সময়েই অর্জিত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি আজও মানুষকে সবচেয়ে ভাল কয়েকটি কাজ করার প্রেরণা

৯। হিউম্ বলেছেন (দ্রঃ, 'অ্যান ইন্‌কোয়ারি কন্‌সার্নিং দ্য প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অফ মর‍্যাল্‌স', ১৭৫১, পৃ ১৩২), 'একটা কথা স্বীকার করা দরকার যে, অপরের সুখে বা দুঃখে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না, কিন্তু অন্যের আনন্দের বিষয়টি...আমাদের মনের মধ্যে খুশির ঝরনা বইয়ে দেয়, আর তাদের দুঃখ...আমাদের কল্পনার জগতে এক বিষাদ-কালো বাধা হয়ে দাঁড়ায়।'

জোগায়। তা সত্ত্বেও তার কাজের অনেকটাই তার প্রতিবেশীদের ইচ্ছা ও মতামতের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং দুর্ভাগ্যবশত প্রায়শই তাতে তার নিজের স্বার্থপর ইচ্ছার থাবাও জাঁকিয়ে বসে। কিন্তু ভালবাসা, সহানুভূতি ও আত্মসংযম অভ্যাসের ফলে শক্তিশালী হয়ে উঠলে এবং চিন্তাভাবনার ক্ষমতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলে মানুষ তার সঙ্গীসাথীদের মতামতকে সঠিকভাবে বিচার করতে পারে, এবং ক্ষণস্থায়ী কোনও সুখ-দুঃখের ব্যাপারে ছাড়া, সে তার আচার-আচরণের কিছু নির্দিষ্ট রীতিও ঠিক করে নেয়। আর তখনই সে ঘোষণা করে (কোনও বর্বর বা অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে এ-রকম ঘোষণা করা সম্ভব নয়)—আমিই আমার আচার-আচরণের সর্বোচ্চ বিচারক, আর কান্টের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, আমি নিজে থেকে কখনও মনুষ্যত্বের অমর্যাদা করব না।

অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি স্বল্পস্থায়ী প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে

এখনও পর্যন্ত আমরা মুখ্য বিষয়টিতে এসে পৌঁছইনি, আমাদের বর্তমান দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী যা নৈতিক বোধ সংক্রান্ত সমগ্র প্রশ্নটির বনিয়াদস্বরূপ। কেন মানুষ কোনও-একটি সহজাত প্রবৃত্তির বদলে অপর একটি প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করার দায়িত্ব অনুভব করে? আত্মরক্ষার নিদারুণ তাড়নার কাছে নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রতিবেশীকে বাঁচাতে না গেলে মনে মনে সে দারুণ কষ্ট পায় কেন? কেনই-বা সে খিদের জ্বালায় চুরি করে খেয়ে পরে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়?

প্রথমেই স্পষ্টভাবে বলা উচিত, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগত আবেগ বা তাড়নার মধ্যে শক্তির নানান তারতম্য আছে। একজন অ-সভ্য মানুষ তার নিজের গোষ্ঠীর কোনও-একজনকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে পারে, কিন্তু অন্য কোনও গোষ্ঠীর অপরিচিত একজনের বিপদে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। আবার, অনভিজ্ঞা কোনও ভীরু জননী তাঁর নিজের শিশুকে বাঁচানোর জন্য মাতৃস্নেহের বশে যে-কোনও বিপদের মুখে ছুটে যান নির্দ্বিধায়, কিন্তু অন্য কোনও শিশুর বেলায় সেভাবে ছুটে যান না। তথাপি অনেক সভ্য লোক, এমনকী ছোট ছোট ছেলেরাও, যারা হয়তো আগে কখনও অন্যের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি কিন্তু দারুণ সাহসী ও সহানুভূতিশীল, তারাও অনেক সময় আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে অগ্রাহ্য করে জলস্রোতে হাবুডুবু খাওয়া কোনও ব্যক্তিকে (সে অপরিচিত হলেও) ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা করে। এক্ষেত্রে মানুষও সেই একই সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়, যে-প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়েই পূর্বোল্লিখিত খুদে কিন্তু যথার্থ বীর আমেরিকান বানরটি তার প্রভুকে রক্ষা করার জন্য বৃহদাকার মারাত্মক বেবুনটিকে আক্রমণ করেছিল। এখানে উল্লিখিত এই ধরনের কাজগুলি হচ্ছে অন্য যে-কোনও সহজাত প্রবৃত্তি বা উদ্দেশ্যের তুলনায় সামাজিক বা মাতৃসুলভ প্রবৃত্তির অধিক শক্তিমত্তারই ফল। কেননা এইসব কাজ করার জন্য কোনওরকম চিন্তা-

ভাবনার অবকাশ পাওয়া যায় না কিংবা ঠিক সেই মুহূর্তে কোনও আনন্দ বা দুঃখের অনুভূতিও কাজ করে না। তবে কোনও কারণে এ-সব কাজ বাধাপ্রাপ্ত হলে নির্দিষ্ট প্রাণীটি দুঃখ বা নৈরাশ্য বোধ করে। অন্যদিকে, ভীরু প্রকৃতির লোকদের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রবণতা এত জোরদার হতে পারে, যার দরুন তারা এই ধরনের ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না, এমনকী নিজের সন্তানের বিপদের সময়েও না।

জানি, কেউ কেউ বলবেন উপরোল্লিখিত কাজগুলি নিছকই আবেগতাড়িত, কাজেই এগুলিকে নৈতিক বোধের আওতায় আনা যায় না এবং নীতিসম্মত বলে আখ্যাতও করা যায় না। বিরুদ্ধ-ইচ্ছাকে দমন করার পর বা কোনও মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে করা কাজের ক্ষেত্রেই শুধু তাঁরা এই অভিধাটিকে (নীতিসম্মত) প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু এই ধরনের কোনও পার্থক্যরেখা টানা প্রায় অসম্ভব।[১০] মহৎ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বলা যায়—অ-সভ্য মানুষদের সম্পর্কে এমন বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে, যেখানে দেখা গেছে যে মানবজাতির হিতাহিত সম্পর্কে কোনও বোধ বা কোনওরকম ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়াই, নিজেদের সাথীদের বাঁচানোর জন্য তারা স্বেছায় বন্দীদশা মেনে নিয়েছে,[১১] তবু প্রতারণা করেনি। তাদের এই আত্মত্যাগকে নৈতিক মূল্য দিতেই হবে। স্বেচ্ছাকৃত কাজ ও বিরুদ্ধ-উদ্দেশ্যকে দমন করা সম্বন্ধে বলা যায়—নিজেদের সন্তান কিংবা সাথীদের বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করার সময় জীবজন্তুরা অনেক সময় দুই বিপরীত প্রবৃত্তির দোলাচলে পড়ে। তখন তাদের কাজকে (তা অন্যের কল্যাণের জন্য হলেও) নৈতিকবোধসম্পন্ন বলা চলে না। উপরন্তু, যে-সব কাজ আমরা হামেশাই করে থাকি সেগুলিকে শেষ পর্যন্ত আর চিন্তাভাবনা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে করতে হয় না, আপনা-আপনিই হয়ে যায়। তখন আর সেগুলিকে সহজাত প্রবৃত্তির থেকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা চলে না যে এই কাজগুলি আর নৈতিকবোধসম্পন্ন নয়। বিপরীতপক্ষে, আমরা সকলেই বুঝতে পারি যে, কোনও কাজকে যথাযথ বা মহত্তম উপায়ে সম্পাদিত বলে মনে করা যায় না, যদি তা আবেগতাড়িত না হয়, প্রচুর চিন্তাভাবনা বা প্রচেষ্টা ছাড়াই যদি তা করা না হয়—ঠিক যেমনভাবে কাজ করে থাকেন এই ধরনের সহজাত গুণসম্পন্ন মানুষেরা। কাউকে যদি কোনও কাজ করার আগেই তার ভয়-

---

১০। এখানে আমি 'বস্তুগত নৈতিকতা'র সঙ্গে 'প্রথাগত নীতিজ্ঞান'-এর পার্থক্যের কথাই বলেছি। অধ্যাপক হাক্সলি-ও এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত জেনে খুবই খুশি হয়েছি আমি (দ্রঃ, ক্রিটিক্স্ অ্যান্ড অ্যাড্রেসেস', ১৮৭৩, পৃঃ ২৮৭)। মিঃ লেস্‌লি স্টিফেন বলেছেন (দ্রঃ, 'এসেজ অন ফ্রি থিংকিং অ্যান্ড প্লেন স্পিকিং', ১৮৭৩, পৃঃ ৮৩), 'বস্তুগত ও প্রথাগত নৈতিকতার মধ্যেকার অধিবিদ্যক পার্থক্যের মতোই এই ধরনের অন্য যে-কোনও পার্থক্য নিতান্তই অবাস্তব।'

১১। এ-রকম একটি ঘটনার কথা আমি জানি। নিজেদের সহযোদ্ধাদের যুদ্ধের পরিকল্পনার কথা শত্রুর কাছে ফাঁস না করার জন্য তিনজন পাটাগোনিয়ান ইন্ডিয়ানকে একের পর এক গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল (দ্রঃ, 'জার্নাল অফ রিসার্চেস', ১৮৪৫, পৃঃ ১০৩)।

ভীতি জয় করতে বা সহানুভূতির অভাব মেটাতে বাধ্য করা হয়, তাহলে একদিক থেকে তার কাজ সহজাত গুণসম্পন্ন কোনও ব্যক্তির স্বতোৎসারিত হাজার ভাল কাজের তুলনায় অনেক বেশি প্রশংসার যোগ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে ঠিকমতো পার্থক্য করতে পারি না বলেই আমরা নৈতিকবোধসম্পন্ন কোনও মানুষের বিশেষ কিছু কাজকে নৈতিক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি।

নৈতিকবোধসম্পন্ন মানুষ আমরা তাকেই বলি, যে তার অতীত ও ভবিষ্যতের কাজ বা উদ্দেশ্যের মধ্যে তুলনা করতে এবং সেগুলির ভাল-মন্দ বিচার করতে সক্ষম। তা'বলে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে নিম্নশ্রেণির কোনও প্রাণীর মধ্যেও এই ক্ষমতা আছে, আর সেইজন্যেই যখন কোনও সন্তরণপটু কুকুর (New Foundland dog) জল থেকে কোনও শিশুকে উদ্ধার করে, কিংবা যখন কোনও বানর তার সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে বিপদের মুখোমুখি হয় বা বাপ-মা-হারা অন্য একটি বানরছানার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়, তখন আমরা তাদের আচরণকে নৈতিকতামণ্ডিত বলে দাবি করতে পারি না। একমাত্র মানুষকেই নৈতিক সত্ত্বার মর্যাদা দেওয়া হয় এবং তার বিশেষ এক ধরনের কাজকে নীতিসম্মত কাজ বলা হয়—তা সেই কাজ ভাবনাচিন্তা করে করা হোক, বিরুদ্ধ-উদ্দেশ্যের সঙ্গে লড়াই করার পর স্বেচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত হোক কিংবা সহজাত প্রবণতার ফলে আবেগতাড়িত হয়ে বা ধীরে ধীরে আয়ত্তাধীন অভ্যাসের ফল থেকে, যেভাবেই করা হোক না কেন।

এবার আমরা বরং আমাদের বর্তমান আলোচনায় ফিরে আসি। সন্দেহ নেই যে কয়েকটি সহজাত প্রবৃত্তি অন্যগুলির তুলনায় শক্তিশালী, এবং সেগুলির প্রভাবে যথোচিত কাজও সম্পাদিত হয়। তবু এ-কথাটা মেনে নেওয়া মুশকিল যে মানুষের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি (সুনামপ্রীতি ও দুর্নামভীতি-সহ) আত্মরক্ষা, ক্ষুধা, যৌন কামনা, প্রতিশোধস্পৃহা প্রভৃতি সহজাত প্রবণতার চেয়ে বেশি শক্তিশালী কিংবা দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাহলে কেনই-বা মানুষ কোনও-একটি প্রবৃত্তির বদলে অন্য একটি প্রবৃত্তিমাফিক কাজ করার জন্য অনুশোচনা করে—এমনকী এ-রকম অনুশোচনার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করেও সে সফল হয় না? আবার কেনই-বা তার মনে হয় যে নিজের কাজের জন্য পরে তাকে অনুশোচনা করতে হবে? আসলে এখানেই মানুষের সঙ্গে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের বিপুল পার্থক্য রয়ে গেছে। তবুও চেষ্টা করলে আমরা হয়তো এই পার্থক্যের কারণ কিছুটা অনুধাবন করতে পারি।

মানুষের মধ্যে মানসিক বিষয়গুলি কাজ করার দরুন সে কিছুতেই চিন্তা-ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। অতীতের নানান ঘটনা ও ছবি অবিরাম তার মনের ভিতর আসা-যাওয়া করে। যে-সব প্রাণী সর্বদা দলবদ্ধভাবে থাকে, তাদের মধ্যে সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিও সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। এইসব প্রাণীরা অভ্যাসবশে বিপদ-সংকেত জানাতে বা নিজের সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে কিংবা সঙ্গীসাথীদের সাহায্য

করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। সঙ্গীসাথীদের জন্যে কিছুটা ভালবাসা বা সহানুভূতির বোধ তাদের মধ্যে থাকেই, এবং তার জন্য বিশেষ কোনও আবেগ বা ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। দীর্ঘ বন্ধুবিচ্ছেদ তাদের মনমরা করে রাখে, আবার পুনর্মিলন আনন্দের জোয়ার আনে। মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম। এমনকী সম্পূর্ণ একা থাকার সময়েও আমরা আনন্দ বা দুঃখের সঙ্গে প্রায়শই ভাবি—অন্যেরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে, কল্পনা করি তারা কীসে সম্মত, কীসে অসম্মত। এ-সব কিছুরই উৎস হচ্ছে সহানুভূতি, যা যাবতীয় সামাজিক প্রবৃত্তির একটি মৌলিক উপাদান। তাই যে-ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের কোনও সহজাত প্রবৃত্তি নেই, তাকে এক অস্বাভাবিক দানব ছাড়া আর কী-ই বলা যায়! অন্যদিকে, খিদে বা প্রতিহিংসার মতো কোনও কোনও প্রবৃত্তির চরিত্র অস্থায়ী ধরনের এবং কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য এগুলিকে পুরোপুরি মেটানোও যায়। খিদের মতো কোনও অনুভূতিকে পরে হুবহু মনে করা মোটেই সহজ নয়, বা বলা যায়, প্রায় অসম্ভব। কোনও দুঃখ-কষ্টের অনুভূতিকেও হুবহু মনে করা দুষ্কর—এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। আবার, বিপদ দোরগোড়ায় এসে না পড়লে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও জেগে ওঠে না। আর তাই অনেক ভীরুপ্রকৃতির লোক নিজেদের সাহসী বলে দাবি করলেও, তার সত্য-মিথ্যা যাচাই হয় তখনই যখন শত্রুর মোকাবিলা করার প্রশ্ন ওঠে। অপরের সম্পত্তি গ্রাস করার আকাঙ্ক্ষাও অন্যান্য অনেক আকাঙ্ক্ষার মতোই এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তাহলেও, সত্যি সত্যি অন্য কারোর সম্পত্তি দখল করার মধ্যে যে-পরিতৃপ্তি, তা অন্যের সম্পত্তি দখলের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে দুর্বল একটি অনুভূতি। অনেক চোর (স্বভাব-চোরদের কথা আলাদা) চুরি করার পর ভাবে—তাই তো, চুরিটা আমি কেন করলাম?[১২]

১২। বিদ্বেষ বা ঘৃণা একটি দীর্ঘস্থায়ী অনুভূতি, সম্ভবত অন্য যে-কোনও অনুভূতির চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী। অন্য কেউ চরম উৎকর্ষতার পরিচয় দিলে বা পর পর সাফল্য লাভ করলে তার প্রতি যে বিদ্বেষ জন্মায় অন্যদের, তাই হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। বেকন জোরের সঙ্গে বলেছেন (দ্রঃ, প্রবন্ধাবলি, ৯ম খণ্ড), 'সমস্ত আসক্তির মধ্যে পরশ্রীকাতরতাই হচ্ছে সবচেয়ে নাছোড়বান্দা, আর তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।' অপরিচিত লোকজন বা অপরিচিত কুকুরের প্রতি সাধারণত কুকুরদের ঘৃণা খুব প্রবল হয়, বিশেষ করে অপরিচিতদের দল যদি তাদের পরিবার, উপজাতি বা গোষ্ঠীভুক্ত না হয়েও কাছাকাছি কোথাও আস্তানা গাড়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই অনুভূতিটা একান্তই সহজাত এবং অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ীও বটে। সত্যিকারের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির পরিপূরক বা বিপরীত হচ্ছে এই অনুভূতি। অ-সভ্য লোকজন সম্পর্কে আমরা যা জানি তা থেকে বলা যায় যে, তাদের মধ্যেও এই ধরনের অনুভূতি কাজ করে। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে যে-কোনও লোক তার নিজের গোষ্ঠীভুক্ত কারুর সম্বন্ধেও এই ধরনের অনুভূতি পোষণ করতে পারে—যদি সেই লোকটি তার কোনও ক্ষতি করে এবং শত্রুতে পরিণত হয়ে থাকে। আবার, শত্রুকে আঘাত করার জন্য তাদেরকে আদিম বিবেকবোধের তাড়না অনুভব করতে হবে—এটাও সম্ভব নয়। শত্রুর ওপর প্রতিশোধ না নিলেই বরং তাকে বিবেকের দংশনে ভুগতে হয়। লোকে তোমার খারাপ চাইছে? বেশ তো, তুমি

মানুষ ইচ্ছে করলেই তার মনের মধ্যে অতীত ঘটনার নিরন্তর আসা-যাওয়া বন্ধ করতে পারে না। ফলে সে অতীতের খিদে পাওয়া, প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণ বা অন্যকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাকে বিচার করে দেখতে বাধ্য হয়। আর তখন তার মধ্যে জেগে ওঠে সেই প্রায়-সর্বদা বিদ্যমান সহানুভূতি এবং প্রশংসাযোগ্য বা নিন্দাযোগ্য কাজ সম্বন্ধে অন্যদের কী ধারণা—সে সংক্রান্ত পূর্বলব্ধ জ্ঞান। অভিজ্ঞতালব্ধ এই জ্ঞান তার মন থেকে মুছে যায় না এবং প্রবৃত্তিগত সহানুভূতির দরুন এই জ্ঞানকে মানুষ দারুণ গুরুত্বপূর্ণ বলেও মনে করে। ফলে সে তখন মনে করে, হয়তো সাম্প্রতিক কোনও প্রবৃত্তি বা অভ্যাসের অনুসরণ করতে গিয়েই তাকে নিরাশ হতে হল। সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই এই ব্যাপারটি অসন্তোষ, এমনকী দুঃখকষ্টও সৃষ্টি করে থাকে।

সাধারণত যে-প্রবৃত্তিটি অন্য প্রবৃত্তিগুলিকে দমিয়ে রাখে, তাকে হঠিয়ে অন্য কোনও স্বল্পস্থায়ী অথচ সেই-মুহূর্তে-শক্তিশালী প্রবৃত্তি কীভাবে মাথা তোলে—তার দৃষ্টান্ত হিসেবে পূর্বোল্লিখিত সোয়ালো পাখিদের ঘটনাটিকে গ্রহণ করা যায় (অবশ্য দৃষ্টান্তটা একটু উলটো ধরনেরই হবে)। নির্দিষ্ট একটি ঋতুতে এই পাখিরা দেশান্তরে উড়ে যাওয়ার ইচ্ছাতেই সারাদিন বুঁদ হয়ে থাকে। তাদের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে, চঞ্চল হয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দেয় এবং দলে-দলে এক জায়গায় জড়ো হয়। অবশ্য পক্ষী-মা যখন তার শাবকদের খাওয়ায় কিংবা তাদেরকে ডানা দিয়ে ঢেকে রাখে, তখন মাতৃস্নেহের কাছে দেশান্তরে উড়ে যাওয়ার প্রবৃত্তিটি সম্ভবত হার মানে। কিন্তু যে-প্রবৃত্তিটি দীর্ঘসময় ধরে টিকে থাকে, জয় হয় তারই। তাই তার সন্তানেরা চোখের আড়াল হওয়ামাত্রই সে তাদের ফেলে রেখে উড়ে যায়। দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের পর সে তার গন্তব্যে পৌঁছয় এবং এই যাযাবর প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটে। পাখিদের মানসিক ক্ষমতা যদি খুব উন্নত ধরনের হত, তাহলে তার মনের মধ্যে অতীতের স্মৃতি ভেসে উঠত অনুক্ষণ—পাখিহীন সেই উত্তর ভূখণ্ডে খিদে আর ঠান্ডায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে তার সন্তানরা। মনের এই ক্ষমতা থাকলে গন্তব্যে পৌঁছনোর পর এক অন্তহীন যন্ত্রণায় আর অনুশোচনায় দগ্ধ হত যাযাবর পাখিরা।

কাজ করার সময় মানুষ তার জোরালো আবেগের বশেই তৎপর হয়ে ওঠে। এইরকম জোরালো আবেগের বশে সে মাঝেমধ্যে ভাল কাজ করলেও সাধারণত কিন্তু সে এ-রকম আবেগের ধাক্কায় অন্যের ক্ষতি করেই নিজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে থাকে। অবশ্য পরে যখন অতীতের ঝাপ্‌সা-হয়ে-আসা এই স্মৃতিকে সে বিচার

তাদের ভাল করো, বা শত্রুকেও ভালবাসতে শেখো—নিঃসন্দেহে এ-সব নৈতিকতার অনেক উচ্চ স্তরের গুণ। কিন্তু আমাদের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি নিজে থেকে আমাদের সেই স্তরে উন্নীত করতে পারে কি না, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। এ-ধরনের কোনও মূল্যবান নীতির কথা ভাবা বা মেনে চলার আগে যুক্তি, নির্দেশ এবং ঈশ্বরপ্রীতি বা ঈশ্বরভীতির সাহায্যে অতান্ত উন্নতও করে তুলতে হবে এইসব প্রবৃত্তিকে এবং সহানুভূতিকে—একযোগে।

করতে বসে তার চিরস্থায়ী সামাজিক প্রবৃত্তির আলোয়, প্রতিবেশীদের শুভ মতামতের প্রতি তার শ্রদ্ধার আলোয়, তখন তার মধ্যে জেগে ওঠে বিপরীত ভাব। কৃতকার্যের জন্য তখন সে অনুশোচনা করে, পাপ করেছে ভেবে পরিতাপ করে, দুঃখিত হয়, লজ্জিত হয়। তবে শেষের এই বোধটি (লজ্জিত হওয়া) মূলত অন্যদের মতামতের ওপরেই নির্ভর করে। এর ফলে সে কম-বেশি দৃঢ়তা সহকারে সিদ্ধান্ত নেয়—না, ভবিষ্যতে আর এ-রকম কাজ করব না। এই হচ্ছে বিবেকবোধ। কারণ বিবেকবোধ মানুষকে পিছন ফিরে দেখতে বাধ্য করে এবং ভবিষ্যতের পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

যে-সমস্ত অনুভূতিকে আমরা দুঃখ, লজ্জা, পরিতাপ বা অনুশোচনা বলে থাকি, সেগুলির প্রকৃতি ও শক্তি শুধুমাত্র যে-সহজাত প্রবৃত্তিটিকে লঙ্ঘন করে তার ওপরেই নির্ভর করে না, কিছুটা নির্ভর করে প্ররোচনার শক্তির ওপরে এবং সাধারণত বেশি বেশি ভাবে আমাদের প্রতিবেশীদের মতামতের ওপরে। কোনও-একজন ব্যক্তি অপরের উপলব্ধিকে কতখানি গুরুত্ব দেবে, তা নির্ভর করে তার সহজাত বা অর্জিত সহানুভূতি বোধের ওপর এবং নিজের কাজের ভবিষ্যৎ ফলাফল বিচার করার ক্ষমতার ওপর। আরও-একটি উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (যদিও তেমন আবশ্যকীয় নয়)—ঈশ্বর বা অজানাশক্তি সম্বন্ধে ভয় বা ভক্তি। মূলত এই ভয় বা ভক্তি থেকেই অনুশোচনার জন্ম। কয়েকজন সমালোচক আপত্তি তুলে বলেছেন, এই পরিচ্ছেদে উত্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ছোটখাটো দুঃখ বা পরিতাপের ব্যাখ্যা করা গেলেও, হৃদয়-তোলপাড়-করা অনুশোচনা বোধকে এ-দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এই আপত্তি খুব জোরদার নয়। কেননা, আমার সমালোচক বন্ধুরা ঠিকমতো বলতে পারেননি যে অনুশোচনা বলতে তাঁরা কী বোঝাতে চাইছেন। আমি নিজেও অনুশোচনা বলতে একটা প্রচণ্ড পরিতাপবোধ ছাড়া আর কোনও সংজ্ঞা দাঁড় করাতে পারিনি। ক্রোধের সঙ্গে রাগের, কিংবা ব্যথার সঙ্গে যন্ত্রণার যে-সম্পর্ক, অনুশোচনার সঙ্গে পরিতাপেরও সম্ভবত সেই একই সম্পর্ক। এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে মাতৃস্নেহের মতো অত্যন্ত শক্তিশালী ও মর্যাদাময় কোনও প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করা হলে নিদারুণ যন্ত্রণার উদ্রেক হয় এবং সেইসঙ্গেই অতীতে এই প্রবৃত্তিকে অমান্য করার কারণ সংক্রান্ত স্মৃতিও দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকী যখন কোনও কাজ বিশেষ কোনও সহজাত প্রবৃত্তির বিরাধিতা করে না, তখনও যদি আমরা জানতে পারি যে ওই কাজটি করার জন্য বন্ধুবান্ধবরা আমাদের ঘৃণা করছে, তাহলে সেটুকুই আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এক গভীর দুঃখবোধ। ভয় পেয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার পর বহুজনই লজ্জায় জর্জরিত হয়েছে—এ কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? শোনা যায়, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকেই অস্পৃশ্যদের ছোঁয়া খাবার খাওয়ার পর মরমে মরে থাকেন। এখানে আর-একটি ঘটনার কথা বলছি, যাকে অনুশোচনাবোধ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ডঃ ল্যান্ডর যখন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন, তখন তাঁর খামারের কাজে নিযুক্ত একজন আদিবাসীর একটি স্ত্রী অসুখে ভুগে মারা যায়। লোকটি তখন ল্যান্ডরের কাছে এসে বলে যে, 'সে একটি দূরবর্তী গোষ্ঠীর কোনও-একজন স্ত্রীলোককে বর্শা

বিঁধিয়ে হত্যা করতে যাচ্ছে, কেননা তবেই সে তার নিজের স্ত্রীর প্রতি শেষ কর্তব্য পালন করতে পারবে এবং নিজেও শান্তি পাবে। আমি তাকে সাবধান করে বললাম, এমন কাজ করলে তাকে আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করব। মাস কয়েক সে আগের মতোই খামারে পড়ে রইল, কিন্তু ক্রমশ রোগা হতে শুরু করল। শেষে একদিন বলল যে সে কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, খাওয়া-দাওয়া করতে পারছে না। তার স্ত্রীর আত্মা তাকে সবসময় তাড়া করে বেড়াচ্ছে, কারণ মৃতা স্ত্রীকে খুশি করার জন্য সে তখনও পর্যন্ত অন্য একটি প্রাণহানি ঘটাতে পারেনি। এ-কথার কী জবাব দৈব বুঝতে না পেরে আমি শুধু তাকে বললাম যে এমন কাজ করলে কোনও-কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারবে না।' অতঃপর লোকটি বছরখানেকের জন্য উধাও হল। তারপর একসময় ফিরে এল বেশ খোশমেজাজি হয়ে। ব্যাপারটা কী খোঁজ করতে লোকটির অপর এক স্ত্রী ডঃ ল্যান্ডরকে জানায় যে তার স্বামী দূরবর্তী একটি গোষ্ঠীর জনৈকা স্ত্রীলোককে খুন করে এসেছে। কিন্তু আইনমতে কোনও সাক্ষ্য পাওয়া না যাওয়ায় আদালতে তাকে অভিযুক্ত করা যায়নি। এভাবে কোনও আইনকে লঙ্ঘন করা, যাকে আদিবাসীরা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে, তা তাদের মধ্যে এক গভীরতম অনুভূতির জন্ম দেয়, এবং এই অনুভূতি সামাজিক প্রবৃত্তির থেকে একেবারেই আলাদা—অবশ্য সেই আইনটি গোষ্ঠীর মতামতের ভিত্তিতে রচিত হলে আলাদা কথা। সারা পৃথিবী জুড়ে এতসব বিচিত্র কুসংস্কার কীভাবে সৃষ্টি হল তা আমরা জানি না, যেমন জানি না নিকট-সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অবৈধ সঙ্গম বা স্বজনমেহনের মতো প্রকৃতই মারাত্মক কিছু অপরাধকে একেবারে নিম্নশ্রেণির বন্যদশার মানুষরাও কীভাবে ঘৃণাভরে পরিহার করতে শিখল (অবশ্য সমস্ত বন্যরাই যে এ-সব পরিহার করে, এমন নয়)। এমনকী কোনও কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে অনাত্মীয় অথচ একই পদবীবিশিষ্ট দুজন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার বৈবাহিক সম্পর্কের চেয়েও বেশি ভয়ের কারণ হিসেবে স্বজনমেহনকে দেখা হত কি না, সে-ব্যাপারেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 'এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে (একই পদবীবিশিষ্ট দুজন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক) যে-পাপ হত, অস্ট্রেলিয়ানরা তাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। উত্তর আমেরিকার কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যেও এ-রকম ঘৃণার স্বীকৃতি মেলে। এই দুই অঞ্চলের কোনও লোককে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ভিন্ন গোষ্ঠীর কোনও মেয়েকে খুন করা আর স্বজাতির একটি মেয়েকে বিয়ে করা—এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি তার কাম্য, তাহলে সে কোনওরকম ইতস্তত না করে আমাদের মনোভাবের ঠিক উলটো জবাবটাই দেবে।' তাহলে সম্প্রতি কিছু লেখকের জোর গলায় বলা মতবাদটিকে বাতিল বলে ধরে নিতে পারি আমরা। তাঁরা বলেছিলেন, স্বজনমেহনের প্রতি তীব্র ঘৃণার কারণ হচ্ছে আমাদের মধ্যে ঈশ্বর-প্রদত্ত বিবেক নামক বিশেষ বস্তুটির অধিষ্ঠান। মোটের ওপর বোঝা যাচ্ছে, সহানুভূতির মতো এত শক্তিশালী একটি ভাবপ্রবণতার দ্বারা চালিত হলে (যদিও তা উপরোক্তভাবেই গড়ে

ওঠে) মানুষ এমনভাবে কাজ করে, যাকে সে প্রায়শ্চিত্ত বলে ভাবতে শিখেছে। যেমন, নিজেকে তখন আইনের হাতে তুলে দেয় সে।

বিবেকের প্রেরণায় মানুষ দীর্ঘ অভ্যাসের সাহায্যে এমন এক আত্মসংযম অর্জন করে যে একসময় তার আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ বিনা দ্বন্দ্বে আত্মসমর্পণ করে তার সামাজিক সহানুভূতি ও প্রবৃত্তির কাছে, আর প্রতিবেশীদের মতামত সম্বন্ধে অনুভূতির কাছে। সেইজন্য অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়েও অনেক মানুষ খাবার চুরি করার কথা ভাবে না বা তীব্র প্রতিহংসাপরায়ণতা থাকা সত্ত্বেও তাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে না। সম্ভবত আত্মসংযমের অভ্যাসটি অন্যান্য অভ্যাসের মতোই বংশগত; পরে আমরা দেখব যে তা সম্ভবও বটে। অবশেষে মানুষ তার অর্জিত ও খুব সম্ভব বংশগত অভ্যাসের সাহায্যে বুঝতে পারে যে অধিক স্থায়ী আবেগকে মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। 'উচিত' নামক কর্তৃত্বব্যঞ্জক শব্দটি কেবলমাত্র আচরণের নিয়ম মেনে চলার জন্য ব্যক্তির সচেতনতাকেই বোঝায়, তা সে নিয়মের সৃষ্টি যেভাবেই হয়ে থাক না কেন। আগে তো হামেশাই প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে বলা হত যে অপমানিত ব্যক্তি মাত্রেরই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া 'উচিত'। এমনকী আমরা এ-ও বলে থাকি যে শিকারি কুকুরের শিকার খোঁজা 'উচিত' এবং উদ্ধারকারী কুকুরের 'উচিত' ভূপাতিত শিকারকে তুলে আনা। আর তা করতে না পারলে বলা হয় তারা কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং ভুলভাবে কাজ করছে।

কোনও-একটি কাজ করবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি যদি অপরের ভাল না করে ক্ষতি করে এবং সেই কাজের স্মৃতি রোমন্থনের সময় যদি তা সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির সমান বা তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী রূপ নেয়, তাহলে কাজটি করার জন্য মানুষটির মনে তেমন কোনও গভীর দুঃখের উদ্রেক হয় না। কিন্তু সে এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে যে প্রতিবেশীরা তার কাজের কথা জানতে পারলে মোটেই তাকে সমর্থন করত না। এ-ধরনের ঘটনার পরেও কোনও অস্বস্তি বোধ করে না, এমন সহানুভূতিহীন মানুষ খুব কমই দেখা যায়। আর সত্যিই যদি কারুর মধ্যে সহানুভূতি না থাকে এবং তার মন্দ কাজ করার ইচ্ছা জোরালো হয়, এবং এইসব কাজের কথা মনে করার সময় যদি স্থায়ী সামাজিক প্রবৃত্তি ও অন্যদের মতামত তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে না তোলে—তাহলে সে অবশ্যই একজন খারাপ প্রকৃতির লোক।[১৩] তখন তার মধ্যে আত্মসংযমের যে একমাত্র প্রবণতাটি দেখা যায়, তা হচ্ছে স্রেফ শাস্তি পাওয়ার ভয়। সেইসঙ্গে থাকে একটা বিশ্বাস যে, নিজের চেয়ে অপরের ভাল গুণকে শ্রদ্ধা জানানোটাই ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার পক্ষে অনুকূল হবে।

স্পষ্টতই প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ কিছু না ভেবে সহজ-সরল মনেই নিজের ইচ্ছা

১৩। ডঃ প্রস্‌পার ডেস্‌পাইন তাঁর 'সাইকোলজি ন্যাচারেল', (১৮৬৮) গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃঃ ২৪৩; খণ্ড ২, পৃঃ ১৬৯) বেশ কিছু জঘন্য অপরাধীর ঘটনা বিবৃত করেছেন, যাদের মধ্যে আপাতভাবে কোনওরকম বিবেকবোধই নেই।

পূরণ করে থাকে, অবশ্য যদি না সেইসব ব্যক্তিগত ইচ্ছা তার সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিতে হস্তক্ষেপ করে, অর্থাৎ যদি না অপরের মঙ্গল সাধনে কোনও ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু আত্মভৎর্সনা বা নিদেনপক্ষে দুশ্চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাওয়ার জন্য সে তার প্রতিবেশীদের সম্মতি নেই এ-রকম কোনও কাজ (তা সে অসম্মতি যুক্তিসঙ্গত হোক বা না-ই হোক) এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নিজের দৈনন্দিন অভ্যাসগুলিও তাকে পরিহার করতে হয় না, বিশেষ করে সেগুলি যদি যুক্তিযুক্ত হয় তাহলে তো একেবারেই নয়। কারণ তা করতে গেলে সে নিশ্চিতভাবেই অসন্তুষ্টির শিকার হবে। একইভাবে সে তার জ্ঞানমতে বা অন্ধ ধারণার বশে যে-ঈশ্বর বা বহু-ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তারা বা তাদের প্রত্যাখ্যান থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে সে। অবশ্য এর সঙ্গে প্রায়শই ঈশ্বরদত্ত শাস্তির ভয়ও তার মনের মধ্যে কাজ করে চলে।

প্রথমে প্রকৃত সামাজিক নীতিজ্ঞানকেই মান্য করা হত

নৈতিক বোধের উৎস ও প্রকৃতি সম্পর্কে ওপরে যে-দৃষ্টিভঙ্গিটির কথা বলা হল, তা আমাদের বলে দেয়—কী করা উচিত। এবং বিবেকবোধ সম্পর্কে যে-দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হল, তা আমাদের ভর্ৎসনা করে অনুচিত কাজ করলে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির সঙ্গে মানুষের মধ্যে এই গুণটির প্রারম্ভিক ও অনুন্নত অবস্থার যথেষ্ট মিল রয়েছে। বর্বর অবস্থায় একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকবার জন্য মানুষের মধ্যে অন্তত সাধারণভাবেও যে-গুণগুলি থাকার দরকার ছিল, আজও সেগুলিকেই মানুষের সব থেকে প্রয়োজনীয় গুণাবলি বলে মনে করা হয়। কিন্তু এগুলি প্রায় পুরোপুরিভাবে কেবলমাত্র একই গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। অন্য গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে একেবারে বিরুদ্ধ আচরণ করলেও তাকে কোনও অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। খুন, লুঠতরাজ, প্রতারণা প্রভৃতি ঘটনা একেবারে যথেচ্ছ হয়ে উঠলে কোনও গোষ্ঠীই মিলে-মিশে বাস করতে পারত না। তাই কেউ তার নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের অপরাধ ঘটালে সে 'আজীবন অপযশের ভাগীদার হয়', কিন্তু অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে এ-সব ঘটনা ঘটালে অপযশের প্রশ্ন আদৌ ওঠে না। উত্তর আমেরিকার কোনও ইন্ডিয়ান যদি ভিন্ন কোনও গোষ্ঠীর কারুর মাথার খুলি উপড়ে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে সে নিজে যেমন সন্তুষ্ট হয়, তেমনি গোষ্ঠীর অন্যেরাও তাকে অভিনন্দন জানায়। শুধু তাই নয়, ডিয়াক্-রা অনেকসময় অকারণেই কোনও নিরীহ মানুষের মাথা কেটে আনে, তারপর জয়ের স্মারক হিসেবে সেটাকে যত্ন করে শুকিয়ে রাখে। শিশুহত্যা তো সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবেই চালু আছে,[১৪] কিন্তু

১৪। এ বিষয়ে সবথেকে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দেখেছি ডঃ গারল্যান্ড-এর 'Ueber dan Aussterben der Natarviolker' (১৮৬৮) শীর্ষক রচনায়। শিশুহত্যা সম্বন্ধে পরবর্তী কোনও পরিচ্ছেদে আবার আলোচনা করব আমি।

তার জন্য হত্যাকারীদের কোনও সমালোচনার মুখে পড়তে হয় না। বরং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শিশুহত্যা, বিশেষ করে মেয়ে-শিশু হত্যাকে মঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়, বা এই হত্যাকে কোনও ক্ষতিকর কাজ বলে অন্তত মনে করা হয় না। আগেকার দিনে আত্মহত্যাকে সাধারণত কোনও অপরাধ বলে মনে করা হত না,[১৫] বরং সাহসের নিদর্শন হিসেবে কাজটাকে সম্মানজনক কাজ বলেই বিবেচনা করা হত। এখনও পর্যন্ত কিছু অর্ধ-সভ্য ও বন্য জাতির মধ্যে আত্মহত্যার জন্য কোনওরকম ভর্ৎসনা করা হয় না, কারণ কোনও ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে গোষ্ঠীর অন্যদের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না। জানা যায় ভারতবর্ষের ঠগীরা তাদের বাপ-কাকাদের মতো অগুন্‌তি লুঠতরাজ বা পথচারীদের নিষ্ঠুরভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে না পারলে অন্তত অনুশোচনা করে থাকে। সত্যি বলতে কী, সভ্যতার আদি অবস্থায় কোনও অপরিচিতের জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়াটাকে সম্মানজনক কাজ বলেই মনে করা হত।

প্রাচীনকালে ক্রীতদাসপ্রথার কিছু উপকারী ভূমিকা থাকলেও, আসলে এটা একটা মারাত্মক অপরাধ। তথাপি এই সেদিন পর্যন্ত এমনকী অত্যন্ত সুসভ্য জাতিগুলিও এই প্রথাকে কোনও অপরাধ বলে মনে করত না। আর তার মূল কারণ ছিল এই যে, সাধারণত ক্রীতদাস আর তাদের প্রভুরা ছিল ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক। অন্যদিকে, বর্বর লোকেরা সাধারণত তাদের স্ত্রীদের কথায় কোনও আমল দেয় না। ফলে এই স্ত্রীলোকরা কার্যত ক্রীতদাসী হয়েই দিন কাটায়। অধিকাংশ বন্য জাতির লোকজন তাদের অপরিচিত লোকেদের দুঃখ-কষ্টে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে, এমনকী তা দেখে মনে মনে মজাও অনুভব করে। অনেকেই হয়তো জানেন উত্তর আমেরিকার রেড-ইন্ডিয়ানদের বউ-বাচ্চারা তাদের শত্রুকে পীড়ন করার সময় যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কোনও কোনও বন্য জাতির লোকেরা জীবজন্তুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এক বীভৎস উল্লাস অনুভব করে। তাদের কাছে মানবিকতা এক অজানা বিষয়। তা সত্ত্বেও, পারিবারিক প্রীতির পাশাপাশি, একই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে একটা মায়া-মমতার বাঁধন থাকেই এবং সেটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় দলের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে। শুধু তাই নয়, কখনও কখনও গোষ্ঠীর বাইরের লোকেদের প্রতিও তাদের মমতাময় হাতটি বাড়ানো থাকে। এ-সম্পর্কে মাঙ্গো পার্ক একটি

১৫। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে লেকি-র 'হিস্ট্রি অফ ইউরোপিয়ান মর‍্যাল্‌স' গ্রন্থের খণ্ড ১, ১৮৬৯, পৃঃ ২২৩-এর চিত্তাকর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য। মিঃ উইনউড রিড বন্যদের ব্যাপারে আমাকে জানিয়েছেন, পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোরা হামেশাই আত্মহত্যা করে থাকে। এটা সুবিদিত যে স্পেন কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর দক্ষিণ আমেরিকার হতভাগ্য আদিবাসীদের মধ্যে আত্মহত্যা হয়ে উঠেছিল প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। নিউজিল্যান্ডের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, 'নোভারা'-র ভ্রমণবৃত্তান্ত, আর অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, মুলার-এর রচনা—এগুলি মুলার তাঁর 'Les Facultes Mentales' গ্রন্থের খণ্ড ২, পৃঃ ১৩৬-এ উদ্ধৃত করেছেন।

মর্মস্পর্শী বর্ণনা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, অরণ্যবাসী একটি নিগ্রো স্ত্রীলোক তাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয় আচরণ করেছিল। বন্য জাতের লোকেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি চমৎকার বিশ্বস্ততার অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়, কিন্তু অপরিচিত আগন্তুকদের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ একেবারেই বিপরীত। অভিজ্ঞতা বলেছে, তাদের সম্বন্ধে স্পেনীয়দের প্রবচনটা ন্যায্যই ছিল—'না না, কোনও ইন্ডিয়ানকে কখনও বিশ্বাস কোরো না।' সত্য না থাকলে বিশ্বস্ততা আসতে পারে না। একই গোষ্ঠীর লোকজনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই প্রধানতম চরিত্রগুণ মোটেই বিরল ঘটনা নয়। মাঙ্গো পার্ক নিজের কানে শুনেছিলেন, নিগ্রো স্ত্রীলোকটি তার শিশুদের সত্যি কথা বলার উপদেশ দিচ্ছে। এই গুণটি তাদের মনের মধ্যে এত গভীরভাবে গেঁথে যায় যে অনেক সময় অপরিচিত আগন্তুকদের ক্ষেত্রেও বন্যরা সত্যের কোনও অন্যথা করে না, এমনকী তার জন্য যথেষ্ট ত্যাগও স্বীকার করে থাকে তারা। অবশ্য আধুনিক কূটনীতিবিদ্যার ইতিহাস স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয় যে শত্রুর কাছে মিথ্যা কথা বলাটা খুব-একটা দোষের কিছু নয়। যে-মুহূর্তে কোনও গোষ্ঠীর একজন স্বীকৃত নেতার উদ্ভব হয়, সেই মুহূর্ত থেকেই অবিশ্বস্ততাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। এমনকী চরম অন্ধ আনুগত্যও একটা মহান গুণ হিসেবেই বিবেচিত হয়। আদিম অবস্থায় কোনও লোকের সাহস না থাকলে তাকে তার গোষ্ঠীর পক্ষে উপকারী বা বিশ্বস্ত বলে মনে করা হত না। ফলে সারা পৃথিবীতেই এই গুণটি দারুণ সম্মান পেত। সভ্য দেশে একজন ভাল কিন্তু ভীরু মানুষও সমাজের পক্ষে একজন সাহসী লোক অপেক্ষা অনেক বেশি উপকারী হতে পারে, তবু কিন্তু আমরা সাহসী লোকের চেয়ে ভীরু লোককে বেশি সম্মান করি না, তা সে সমাজের যত উপকারই করুক না কেন। অন্যদিকে, একজনের বিচক্ষণতার সঙ্গে অন্যদের কল্যাণের তেমন কোনও সম্পর্ক না থাকলেও, এটা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ। কিন্তু কখনওই সেটা যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। আত্মোৎসর্গ, আত্মসংযম ও সহ্যশক্তি না থাকলে কোনও মানুষই তার গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারে না, ফলে এই গুণগুলিকে অধিকাংশ সময়েই উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং সঠিকভাবেই মূল্যায়ন করা হয়। অ-সভ্য আমেরিকানরা তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও সাহসের প্রমাণ দেওয়া এবং তা বাড়ানোর জন্য মারাত্মক সব শারীরিক পীড়নের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে, মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না। অবশ্যই এরা প্রশংসার দাবিদার। ভারতীয় ফকিররাও প্রশংসার দাবি রাখে যখন তারা তাদের দেহের মাংসের মধ্যে একটা আঁকশি আটকে দোল খায়। অবশ্য এর পিছনে থাকে নির্বোধ ধর্মীয় প্রেরণা।

অন্যান্য তথাকথিত আত্মবিবেচনামূলক গুণাবলির সঙ্গে গোষ্ঠীর কল্যাণ-অকল্যাণের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই—যদিও পরোক্ষ সম্পর্ক থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু বন্য মানুষরা এগুলিকে কখনওই তেমন গুরুত্ব দেয়নি। অবশ্য সভ্য জাতিগুলি এখন এই গুণগুলিকে যথেষ্ট মর্যাদা দিচ্ছে। বন্য জাতিগুলির মধ্যে অপরিমিত সুরা পানের অভ্যাস কোনও নিন্দনীয় কাজ নয়। এদের মধ্যে চরম

কামুকতা ও অস্বাভাবিক অপরাধের হার আশ্চর্যরকম বেশি। কিন্তু যখন থেকে বহুবিবাহ বা একবিবাহের প্রথা চালু হল, তখন থেকেই এরা নারীর গুণাবলিকে মর্যাদা দিতে শিখল। অবিবাহিতা মেয়েরাও এই মর্যাদার অংশীদার হল। পুরুষদের মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছিল খুব ধীরে ধীরে, আমাদের আজকের সমাজ তো তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সতীত্বের জন্য আত্মসংযম একান্তই প্রয়োজন। সেইজন্যই সভ্য মানুষের নৈতিক ইতিহাসের সূচনা থেকেই একে এত সম্মান করে আসা হচ্ছে। আর তার ফলে সেই সুদূর সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত কৌমার্য রক্ষার নিরর্থক প্রয়াস একটি মহৎ গুণ হিসেবে উচ্চাসন দখল করে আছে। অশোভন আচরণকে ঘৃণা করাটা আমাদের কাছে এত স্বাভাবিক যে মনে হয় যেন তা আমাদের মজ্জাগত। আবার সতীত্ব রক্ষার জন্য এই ব্যাপারটা খুব মূল্যবানও বটে। স্যর জি. স্ট্যানটোনের মতে, এটা শুধুমাত্র সভ্য জীবনের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট একটি আধুনিক গুণ। বিভিন্ন জাতির প্রাচীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে, পম্পেঈ নগরীর দেওয়াল-চিত্রে এবং নানান বন্য জাতির কাজকর্মের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে বন্য লোকেরা, এবং সম্ভবত আদিম মানুষেরাও কোনও কাজের ভাল-মন্দ বিচার করত তাদের নিজেদের গোষ্ঠীর কল্যাণ-অকল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে, সমগ্র মানবজাতির কিংবা গোষ্ঠীর কোনও-একজন সদস্যের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে তাদের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর বলা যায়, তথাকথিত নৈতিক বোধ প্রাথমিকভাবে সামাজিক প্রবৃত্তি থেকেই গড়ে ওঠে, কারণ দেখতে গেলে এই দুটিই পুরোপুরি ভাবে সমাজসম্পৃক্ত। আবার আমাদের মানদণ্ডের বিচারে বন্য লোকজনদের নৈতিক মান নিচু হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে একই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেই তাদের সহানুভূতি সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়ত, চিন্তাভাবনার ক্ষমতা যথেষ্ট দুর্বল হওয়ায় তারা অনেক গুণকে গুণ বলে চিনতেই পারে না, বিশেষত আত্মোপলব্ধিগত গুণগুলিকে, যা তাদের গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য একান্ত দরকারি। যেমন, অধিকাংশ সময় বন্যরা মিতাচার, সতীত্ব ইত্যাদির অভাবে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অশুভ বিষয়গুলিকে নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়। তৃতীয়ত, তাদের আত্মসংযমের ক্ষমতা বেশ দুর্বল, কারণ তাদের এই ক্ষমতাটি দীর্ঘদিনের—সম্ভবত জন্মগত—অভ্যাস, নির্দেশ ও ধর্মের সাহায্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি।

এখানে আমি বন্য মানুষদের অনৈতিক কাজকর্মের বিশদ ব্যাখ্যা দিলাম এই জন্য যে সম্প্রতি কোনও কোনও লেখক হয় তাদের নৈতিক চরিত্রকে প্রশংসার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করেছেন অথবা তাদের অধিকাংশ অপরাধকে পথভ্রষ্ট পরোপকারিতা বলে দেখাতে চেয়েছেন। এইসব লেখকরা তাঁদের সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছেন বন্যদের সেইসব গুণের ওপর ভিত্তি করে যেগুলি তাদের পরিবার ও গোষ্ঠীর অস্তিত্বের পক্ষে কার্যকরী এবং প্রয়োজনীয়ও বটে—নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে এইসব গুণ তাদের মধ্যে বেশ উচ্চ মাত্রাতেই আছে।

সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য

নীতিজ্ঞান বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক মতবাদপন্থী দার্শনিকদের দল মনে করতেন, নৈতিকতার ভিত্তি হল এক ধরনের স্বার্থপরতা। কিন্তু অতি আধুনিককালে 'চরম সুখের নীতি'-কেই এর ভিত্তি বলে মনে করা হচ্ছে। তবে শেষোক্ত নীতিটিকে মানুষের আচার-আচরণের মাপকাঠি হিসেবে দেখাটাই যুক্তিযুক্ত, তার আচার-আচরণের চালিকাশক্তি হিসেবে নয়। তথাপি যে-সব লেখকের লেখা আমি পড়েছি, তাঁদের মধ্যে দু-একজন বাদে[১৬] সবাই এমনভাবে লিখেছেন যেন প্রত্যেকটি কাজেরই একটি নির্দিষ্ট হেতু বা চালিকাশক্তি থাকে, আর তা অবশ্যই কোনও-না-কোনও আনন্দ বা নিরানন্দের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় মানুষ আনন্দ-সচেতন না হয়ে কেবল সহজাত প্রবৃত্তি বা দীর্ঘ অভ্যাসের বশে আবেগপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে—মৌমাছি বা পিঁপড়েরা যেভাবে তাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে, অনেকটা সেভাবেই। মনে করা যাক কোথাও আগুন লেগেছে। এটি নিশ্চয়ই একটি বিপজ্জনক ঘটনা। তখন আমরা কী দেখি? দেখি একজন লোক এক মুহূর্তও ইতস্তত না করে তার প্রতিবেশীকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় সে নিশ্চয়ই কোনও আনন্দ অনুভব করে না। আবার প্রতিবেশীকে উদ্ধারের চেষ্টা না করলে পরবর্তীকালে তার নিজের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার সময়ও তখন সে পায় না। পরবর্তী সময়ে নিজের আচরণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে সে বুঝতে পারে তার মধ্যে আবেগতাড়িত একটি শক্তি রয়েছে, যা আনন্দ বা সুখসন্ধানের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর এটাই হচ্ছে মনের মধ্যে গভীরভাবে জাঁকিয়ে বসা সহজাত প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত।

নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রবৃত্তির ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বোধহয় এটা বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত হবে যে তাদের এই প্রবৃত্তি সমগ্র প্রজাতির সুখের জন্য বিকশিত হয়নি, বিকশিত হয়েছে সমগ্র প্রজাতির সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য। সার্বজনীন

১৬। মিল্ খুব স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন (দ্রঃ, 'সিস্টেম অফ লজিক', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২২), আনন্দের প্রত্যাশা না করেই কেবল অভ্যাসের বশেও অনেক কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে। মিঃ সিজ্‌উইক-ও আনন্দ ও ইচ্ছা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন (দ্রঃ, 'দ্য কনটেম্পোরারি রিভিউ', এপ্রিল ১৮১২, পৃঃ ৬৭১), 'সংক্ষেপে, আমাদের সচেতন ও তৎপর আবেগ সর্বদাই আমাদের মধ্যে যথেষ্ট সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করে—এই মতবাদটির বিরুদ্ধে আমি বলতে চাই যে, আমরা আমাদের সচেতনতার মধ্যে সর্বত্রই বাড়তি উপলব্ধির আবেগ খুঁজে পাই যার লক্ষ্য আনন্দ নয়, অন্য কিছু। অনেক সময় এই আবেগ আত্মোপলব্ধির সঙ্গে এতই সঙ্গতিহীন হয়ে ওঠে যে এ দুটি সচেতনতার মধ্যে একসঙ্গে সহজে সহাবস্থান করতে পারে না।' আমাদের আবেগ কোনও প্রকারেই সবসময় সমসাময়িক বা প্রত্যাশিত আনন্দের অনুভূতি থেকে উৎপন্ন হয় না—সাধারণ এই অনুভূতিই হল নৈতিকতার স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান-উপলব্ধি-তত্ত্ব গ্রহণের পিছনে একটি বড় কারণ। শুধু তাই নয়, এই অনুভূতি থাকার জন্যই উপযোগবাদ বা 'চরম সুখের' নীতিটিও পরিত্যক্ত হয়। শেষের মতবাদটির ব্যাপারে প্রায়শই আচরণের মাত্রা ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, কিন্তু আসলে এ দুটি কিছুটা এক হয়েই পরস্পরের সঙ্গে মিশে থাকে।

মঙ্গল বলতে আমরা কী বুঝি? বিশাল সংখ্যক প্রাণীকে তাদের নিজ নিজ অবস্থার মধ্যেই পূর্ণ প্রাণশক্তিতে ও স্বাস্থ্যে ভরপুর করে তোলা এবং তা করতে গিয়ে তাদের মানসিক গুণাবলির কোনও ক্ষতি না করা। সন্দেহ নেই মানুষ ও নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের সামাজিক প্রবৃত্তি প্রায় একইরকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এই পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যে সম্ভব হলে উভয়ের এই প্রবৃত্তির জন্য একই সংজ্ঞা ব্যবহার করা এবং নৈতিকতার মাপকাঠি হিসেবে সার্বিক সুখের বদলে সার্বিক মঙ্গল বা কল্যাণকেই গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক নীতিশাস্ত্রের বিচারে এই সংজ্ঞার মধ্যে কিছু ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে।

যখন কোনও লোক নিজের জীবন বিপন্ন করে তার প্রতিবেশীকে রক্ষা করতে ছুটে যায়, তখন তার কাজকে মানবজাতির সার্বিক সুখের জন্য না ভেবে সার্বিক মঙ্গলের জন্য ভাবাই যুক্তিযুক্ত। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে মঙ্গল আর সুখ সাধারণত সমার্থকই হয়ে থাকে, এবং সন্তুষ্ট ও সুখী কোনও মানবগোষ্ঠী অসন্তুষ্ট ও অসুখী একটি মানবগোষ্ঠীর চেয়ে অনেক ভালভাবে বিকাশ লাভ করে। আমরা আগেই দেখেছি যে মানব-ইতিহাসের প্রারম্ভিক সময়ে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ইচ্ছা প্রতিটি সদস্যের আচরণের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করত। আর সকলেই যেহেতু সুখ কামনা করে, তাই 'চরম সুখের নীতি' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গৌণ নির্দেশক বা লক্ষ্যের রূপ নেয়, তবে, সহানুভূতি (যা কিনা অন্যদের সম্মতি বা অসম্মতিকে মূল্য দিতে শেখায় আমাদের) আর সামাজিক প্রবৃত্তিই মুখ্য আবেগ ও নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কাজেই আমাদের চরিত্রের মহত্তর অংশটি গড়ে উঠেছে স্বার্থপরতার নীতির ভিত্তিতে—এ অভিযোগ ধোপে টেকে না। নিজের সত্যিকারের সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করে প্রতিটি প্রাণী যে তৃপ্তি পায় আর সেই কাজে বাধা পেলে যে অতৃপ্তি দেখা দেয়, তাকেই স্বার্থপরতা বলা হলে অবশ্য আলাদা কথা।

একই গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের ইচ্ছা বা মতামত প্রথমে মৌখিকভাবে জানানোর চল ছিল, পরে লিখিতভাবে জানানোও শুরু হয়, আর সকলকার এই ইচ্ছা বা মতামতই আমাদের আচার-আচরণের একমাত্র নির্দেশক হিসেবে কাজ করে অথবা আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তিগুলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলে। তবে এই ধরনের মতামত কখনও কখনও সরাসরি এইসব প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে। শেষোক্ত ঘটনাটিকে ভালভাবে বোঝা যায় সম্মান-নীতির সাহায্যে, অর্থাৎ যে-নীতি অনুযায়ী আমরা শুধু আমাদের সমকক্ষদের মতামতকেই গুরুত্ব দিই, সমগ্র দেশবাসীর মতামতকে গুরুত্ব দিই না। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে—এমনকী সেই নিয়মলঙ্ঘন প্রকৃত নৈতিকতার সঙ্গে পুরোপুরি সাযুজ্যপূর্ণ হলেও—মানুষ সত্যিকারের কোনও অপরাধ করার থেকেও বেশি যন্ত্রণা অনুভব করে। একই ব্যাপার দেখা যায় তীব্র লজ্জাবোধের ক্ষেত্রেও। এ-বোধ আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই ঘুরে-ফিরে আসে। শিষ্টাচারের কোনও তুচ্ছ অথচ প্রথাগত নিয়ম ভঙ্গ করার অনেক বছর পরেও সেই ঘটনার কথা মনে পড়লে আমরা লজ্জিত হই। সাধারণত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বিচারধারা গড়ে ওঠে কিছু স্থূল

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, যে-অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় গোষ্ঠীর সকল সদস্যের পক্ষে আখেরে কোন্‌টা সবথেকে ভাল ফল দেবে। কিন্তু বেশিরভাগ সময় এই বিচারধারা তাদের অজ্ঞতা বা চিন্তা-ভাবনার দুর্বলতার দরুন একটা ভুল জায়গায় গিয়ে পৌঁছয়। আর তাই দুনিয়া জুড়ে নানান অদ্ভুত অদ্ভুত দেশাচার ও কুসংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যেগুলি মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও সুখের পুরোপুরি পরিপন্থী। হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনও গোঁড়া ব্যক্তি তার জাত-পাঁচিল একবার টপকালে প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অবশ্য নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় কার অনুশোচনার তীব্রতা বেশি—ঝোঁকের মাথায় নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে পরে অনুশোচনাকারী একজন জাত-হিন্দুর, নাকি চুরি করার পর কেন চুরি করলাম ভেবে কষ্ট পাওয়া একজন চোরের। সম্ভবত চোরের তুলনায় গোঁড়া-হিন্দুর মনস্তাপই বেশি দুঃসহ।

আচার-আচরণের এইসব অদ্ভুত অদ্ভুত নীতি, অজস্র অদ্ভুত ধর্মীয় বিশ্বাসের উদ্ভব কীভাবে হয়েছে, তা আমরা জানি না। কীভাবেই বা এগুলি পৃথিবীর সর্বত্র মানব-মনের ওপর এত গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারল, তা-ও জানা নেই আমাদের। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে জীবনের ঊষালগ্নে আমাদের মস্তিষ্ক তীব্র সংবেদনশীল থাকে, অর্থাৎ যা শোনে তা-ই করে বা যা দেখে তা-ই শেখে। তখন যদি কানের সামনে অনবরত নির্দিষ্ট একটি বিশ্বাসের বুলি আওড়ানো হয়, তাহলে তা অচিরেই প্রায় সহজাত প্রবৃত্তির স্তরে পৌঁছে যায়, আর সহজাত প্রবৃত্তির মূল কথা হল যুক্তি বা ভাবনা ছাড়াই ওই প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করা। অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় কিছু বন্য গোষ্ঠী কেন কয়েকটি শুভ গুণকে—যেমন সত্যের প্রতি ভালবাসাকে—বেশি মর্যাদা দেয়, তা-ও আমরা জানি না। কেনই-বা অত্যন্ত সভ্য জাতিগুলির মধ্যে একইরকম মতপার্থক্য দেখা যায়, তা-ও আমাদের অজানা। এইসব অদ্ভুত দেশাচার ও কুসংস্কারগুলি কত দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে, তা আমরা জানি। ফলে যুক্তিসিদ্ধ আত্মোপলব্ধির গুণকে আমরা যে আজ একান্ত স্বাভাবিক ও প্রায় সহজাত গুণ বলেই মনে করি, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আদিম যুগের মানুষরা কিন্তু এই গুণের কোনও মূল্যই দিত না।

মনের ভিতর যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও মানুষ সাধারণত নৈতিক নিয়মের কোন্‌গুলি উৎকৃষ্ট আর কোন্‌গুলি নিকৃষ্ট, তার মধ্যেকার তফাত চটপট বুঝে নিতে পারে। উৎকৃষ্ট নিয়মগুলি সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং সেইসঙ্গে সর্বসাধারণের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা নেয়। এই নিয়মগুলির পিছনে থাকে যুক্তির জোর আর আমাদের প্রতিবেশীদের সম্মতি, অন্যদিকে নিকৃষ্ট নিয়মগুলির মধ্যে কয়েকটি আত্মত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, ফলে সেগুলিকে ঠিক নিকৃষ্ট বলা চলে না। এছাড়া বাকি নিকৃষ্ট নিয়মগুলি মূলত আত্মস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, জনমত এগুলির জন্ম দেয় এবং অভিজ্ঞতা ও চর্চার সাহায্যে এগুলি ক্রমশ পরিণত হয়ে ওঠে। তাই অ-সভ্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এগুলির প্রচলন দেখা যায় না।

যখন থেকে মানুষ সভ্যতার দিকে যাত্রা শুরু করল আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি একটি বৃহৎ সম্প্রদায় ভুক্ত হল, তখন থেকে প্রতিটি মানুষই বুঝতে শুরু করল যে তার

সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি ও সহানুভূতিকে জাতির সকলের কাজে লাগাতে হবে—এমনকী নিজের সম্প্রদায়ের যাদেরকে সে চেনে না, তারাও এর বাইরে থাকবে না। একবার এই অবস্থায় পৌঁছনোর পর সমস্ত দেশ ও সমস্ত জাতির মানুষের জন্যই সে নিজের সহানুভূতিকে ছড়িয়ে দিতে পারে, মাঝে থাকে শুধু একটা কৃত্রিম বাধার দূরত্ব। ওইসব মানুষদের সঙ্গে চেহারায় ও অভ্যাসে যদি তার বিপুল পার্থক্য থাকে, তাহলে তাদেরকে নিজের সমধর্মী বলে মনে করতে তার অনেক দেরি হয়—এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী! কেবল মানুষের গণ্ডিতেই নয়, তাকে অতিক্রম করে নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের প্রতিও সহানুভূতি অর্থাৎ মানবতা দেখানোর ব্যাপারটা সম্ভবত অনেক পরে অর্জিত গুণগুলির অন্যতম। আপাতভাবে বন্যদের মধ্যে এই বোধ অনুপস্থিত। অবশ্য নিজেদের পোষা জীবজন্তুর প্রতি তাদের যথেষ্ট সহানুভূতি থাকে। প্রাচীন রোমবাসীদের মানবতাবোধ কত কম ছিল, সেটা তাদের ঘৃণ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের (পেশাদার একজন যোদ্ধা বা গ্ল্যাডিয়েটরের সঙ্গে কোনও পশু বা মানুষের আমৃত্যু লড়াই) প্রদর্শনী থেকেই বোঝা যায়। আমি যতদূর জানি, পম্পাস নগরীর রাখালদের কাছে মানবতাবোধের ধারণা ছিল একেবারেই অপরিচিত। মানুষের এই মহান গুণটি (মানবতাবোধ) খুব সম্ভবত সহানুভূতি থেকেই গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ আমাদের সহানুভূতি যতই কোমলতর হয়ে উঠেছে, ছড়িয়ে পড়েছে, আমরা যতই সহানুভূতি বোধ করেছি যাবতীয় সজীব বস্তু সম্বন্ধে, ততই গড়ে উঠেছে আমাদের মানবতাবোধ। প্রথমে অল্প কয়েকজন মানুষ এই বোধটির মর্যাদা দিতে শুরু করে এবং প্রয়োগ করতে শুরু করে, তারপর তাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা ছড়িয়ে পড়ে নবীনদের মধ্যে, এবং অবশেষে জনমতের মধ্যে স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে এই মানবতাবোধ।

নৈতিক কৃষ্টির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছলে আমরা বুঝতে পারি যে নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, আর 'যে-সব পাপ আমাদের অতীতকে মনোরম করে তুলেছিল, সেগুলিকে এমনকী একেবারে অন্তরতম চিন্তাতেও ঠাঁই দেওয়া উচিত নয়।' কোন্‌টা খারাপ কাজ, তা চিনতে যা-কিছু আমাদের সাহায্য করে, তা-ই আবার ওই কাজটাকে সহজও করে তোলে। মার্কাস অরেলিয়াস বহুদিন আগেই বলেছিলেন, 'আপনার অভ্যাসগত চিন্তাভাবনা যেমন হবে, আপনার মনের গঠনও হবে তেমনই। কারণ চিন্তাভাবনার রঙেই রঞ্জিত হয় আমাদের আত্মা।'

মহান দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্‌সার সম্প্রতি নৈতিক বোধ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় মানবজাতির সমস্ত অতীত প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে উপযোগিতা সম্বন্ধে যে-অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে, সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে, তা আমাদের মধ্যে নানান সময়ে নানান পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। আর এই পরিবর্তন, অবিরাম চলতে চলতে ও নানা কিছু সঞ্চয় করতে করতে, আমাদের নৈতিক স্বজ্ঞার কিছু বিশেষ ক্ষমতা, বিশেষ আবেগ গড়ে তুলেছে, যা আমাদের জানিয়ে দেয় কোন্‌টা বেঠিক। উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আপাতভাবে তার ভিত্তিতে কিন্তু এই সজ্ঞা বা আবেগ গড়ে ওঠে না।' বিভিন্ন গুণমণ্ডিত প্রবণতাগুলি

বেশ কিছুটাই উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তায় বলে আমার মনে হয়। আমাদের গৃহপালিত পশু-পাখিরা তাদের বিভিন্ন ঝোঁক ও অভ্যাস যে নিজেদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে চারিয়ে দেয়, সে কথা না-হয় বাদই দিচ্ছি। কিন্তু এমন অনেক প্রামাণ্য ঘটনার কথাও আমি শুনেছি, যেখানে উচ্চশ্রেণির অনেক পরিবারের মধ্যে চুরি করার ইচ্ছা আর মিথ্যা কথা বলার একটা প্রবণতা বংশপরম্পরাক্রমে চালু থাকতে দেখা গেছে। সম্পদশালী শ্রেণির মধ্যে চুরি করা একটা নেহাতই বিরল অপরাধ। কাজেই, একই পরিবারের দুই বা তিনজনের মধ্যে চুরি করার ঝোঁক থাকাটা নিছক কোনও আকস্মিক সমাপতন হতে পারে না। খারাপ প্রবণতাগুলি যদি উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হতে পারে, তাহলে ভাল প্রবণতাগুলির পক্ষেও ওইভাবে সঞ্চারিত হওয়া একান্তই সম্ভব। হজম কিংবা যকৃৎ-সংক্রান্ত গন্ডগোলে যাঁরা দীর্ঘদিন ভুগছেন, তাঁরা ভাল করেই জানেন যে শরীরের অবস্থা ছাপ ফেলে মস্তিষ্কের ওপর, এবং সেটা আমাদের নৈতিক প্রবণতার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে থাকে। 'মানসিক গন্ডগোলের একেবারে প্রাথমিক লক্ষণগুলির অন্যতম হচ্ছে নৈতিক বোধের বিকৃতি বা ভাঙন'—এই ঘটনার মধ্যেও সেই একই সত্যের প্রতিধ্বনি শুনি।'[১৭] মস্তিষ্কবিকৃতিও অনেক সময় বংশপরম্পরাক্রমে বর্তায়। মানবজাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে নৈতিক প্রবণতার ব্যাপারে যে পার্থক্য আছে বলে মনে করা হয়, তাকে বুঝতে হলে নৈতিক প্রবণতার এই বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হওয়ার নিয়মের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে প্রাথমিক আবেগগুলি আমরা অর্জন করে থাকি, সেগুলির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে গুণমণ্ডিত প্রবণতাগুলির এমনকী আংশিক সঞ্চালনও এক অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে গুণমণ্ডিত প্রবণতাগুলিই বংশানুক্রমেই অর্জিত হয়, তাহলে অন্ততপক্ষে সতীত্ব, মিতাচার, জীবজন্তুর ওপর দরদ প্রভৃতি ব্যাপারে একটা বিশেষ ঘটনাকে সম্ভবপর বলেই মনে হয়। ব্যাপারটা এ-রকম—এই গুণগুলি একই পরিবারের বেশ কিছু প্রজন্ম জুড়ে চলে আসা বিভিন্ন অভ্যাস, নির্দেশ ও দৃষ্টান্তের সাহায্যেই কোনও মানুষের মনের ওপর ছাপ ফেলে, আর এইসব গুণবিশিষ্ট যে-সব ব্যক্তি জীবনধারণের সংগ্রামে সব থেকে সফল হতে পেরেছে, তারা অন্য কোনও মানুষের মনে খুব কমই ছাপ ফেলে কিংবা আদৌ কোনও ছাপ ফেলে না। এ ধরনের কোনও উত্তরাধিকার সম্ভব কি না, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। আর সেই সন্দেহের মূল কারণ হল এই যে, তাহলে তো এই নিয়ম অনুযায়ী যে-কোনও অর্থহীন প্রথা, কুসংস্কার আর রুচিও—যেমন অপবিত্র খাবার সম্বন্ধে হিন্দুদের আতঙ্ক—বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারত। কিন্তু কোনও কুসংস্কারমূলক প্রথা কিংবা অর্থহীন অভ্যাসের এইভাবে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হওয়ার সমর্থনে কোনও প্রমাণ আমার চোখে পড়েনি। সাধারণভাবে বিচার করলে অবশ্য মনে হয়, জীবজন্তুরা যেমন বংশানুক্রমে কিছু বিশেষ খাদ্যপ্রীতি বা বিশেষ কিছু শত্রুভীতির শরিক হয়, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও বংশানুক্রমে নানান গুণের অধিকারী হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

১৭। মডস্লে, 'বডি অ্যান্ড মাইন্ড', পৃঃ ৬০।

শেষত, নিম্নশ্রেণির প্রাণীদের মতো মানুষও তার সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি অর্জন করেছিল গোটা সমাজের মঙ্গলের জন্যই, আর একেবারে প্রথম থেকেই এগুলি তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে প্রতিবেশীদের সাহায্য করার একটা আকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতিবোধ, এবং তাকে বাধ্য করেছে প্রতিবেশীদের অনুমোদন বা অননুমোদনকে মান্য করতে। অনেক প্রাচীন যুগে সঠিক-বেঠিক নির্ণয়ের একটা স্থূল নিয়ম হিসেবে এইসব আবেগ মানুষকে সাহায্য করেছে। কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের মননক্ষমতার উন্নতি ঘটল, নিজের কার্যকলাপের সুদূরপ্রসারী ফলাফলকে সে বুঝতে শিখল, ক্ষতিকর প্রথা ও কুসংস্কার বর্জন করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করল, অন্যান্য মানুষদের মঙ্গলের কথাই শুধু নয় বরং তাদের সুখের কথাও বেশি করে ভাবতে শুরু করল। কল্যাণদায়ী অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে ওঠা অভ্যাস, বিভিন্ন নির্দেশ ও দৃষ্টান্ত তার সহানুভূতিকে আরও কোমল, আরও প্রসারিত করে তুলল, তার মধ্যে সহানুভূতি সৃষ্টি হল সমস্ত জাতির মানুষের জন্য, জড়বুদ্ধি, বিকলাঙ্গ ও সমাজের অন্যান্য অকর্মণ্য সদস্যদের জন্য, এমনকী নিম্নতর প্রাণীদের জন্যও—আর এইসব গুণ অর্জন করার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার নৈতিক বোধের মানও অনেক উন্নত হয়ে উঠল। সিদ্ধান্তমূলক চিন্তার অনুগামী নীতিবাদীরা এবং কিছু স্বজ্ঞাবাদীও স্বীকার করেন যে মানব-ইতিহাসের আদি যুগ থেকেই মানুষের নৈতিক বোধের মান উন্নত হতে শুরু করেছে।[১৮]

নিম্নতর শ্রেণির প্রাণীদের বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে মাঝেমাঝে একটা পারস্পরিক সংঘাত বাধতে দেখা যায়। কাজেই মানুষের ক্ষেত্রেও যে তার নানান সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে সংঘাত বাধবে, সংঘাত বাধবে তার আহৃত গুণাবলি আর নিম্নতর (কিন্তু সেই মুহূর্তে শক্তিশালী) আবেগ বা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে—তা আর আশ্চর্য কী! মিঃ গ্যালটন বলেছেন[১৯]—ব্যাপারটার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কেননা তুলনামূলক বিচারে মানুষ বর্বর অবস্থা থেকে উন্নীত হয়েছে যথেষ্টই সাম্প্রতিক কালে। কোনও প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে পড়ার পর আমরা একটা অসন্তুষ্টি, লজ্জা, অনুশোচনা বা অনুতাপ বোধ করি, আর এই অনুভূতিটা হচ্ছে অন্য কোনও শক্তিশালী প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকলে বা ব্যাহত হলে যেমন অনুভূতি হয়, ঠিক তেমনই। অতীতের কোনও উত্তেজনার ফিকে-হয়ে-আসা স্মৃতিকে আমরা তুলনা করে থাকি আমাদের সদ্য-কৈশোরে অর্জিত ও সারাজীবন ধরে সুদৃঢ় হয়ে ওঠা সদা-বর্তমান সামাজিক প্রবৃত্তি অথবা অভ্যাসগুলির সঙ্গে, এবং যতক্ষণ না এগুলি প্রায় সহজাত প্রবৃত্তির মতোই শক্তিশালী হয়ে ওঠে, ততক্ষণ এ-রকম তুলনা আমরা করেই চলি। ওই একই প্ররোচনা সামনে থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা তাতে

১৮। একজন লেখক এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন (দ্রঃ, 'নর্থ ব্রিটিশ রিভিউ', জুলাই ১৮৬৯, পৃঃ ৫৩১)। মিঃ লেকি-ও তাঁর সঙ্গে কিছুটা মতের মিল খুঁজে পেয়েছেন। (দ্রঃ, 'হিস্ট. অফ মর‍্যালস', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩)।

১৯। তাঁর বিশিষ্ট রচনা 'হেরিডিটারি জিনিয়াস', পৃঃ ৩৪৯ দ্রষ্টব্য। আর্জিলের ডিউক-ও মানব-প্রকৃতির মধ্যে ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। (দ্রঃ, 'প্রিমিভ্যাল ম্যান', পৃঃ ১৮৮)।

আর উত্তেজিত না হই, তাহলে তার কারণ হচ্ছে হয় আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তি কিংবা কোনও প্রথা সেই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে তীব্রভাবে জেগে উঠেছে, অথবা আমরা জেনে গেছি যে কিছুদিন পর ওই প্ররোচনার ফিকে-হয়ে-আসা স্মৃতির সঙ্গে আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তি বা প্রথাটির তুলনা করলে প্রবৃত্তি বা প্রথাটিকেই বেশি জোরদার বলে মনে হবে, আর সেইসঙ্গেই বুঝতে পেরেছি যে ওই প্রবৃত্তি বা প্রথাকে লঙ্ঘন করলে তা আমাদের মধ্যে যন্ত্রণার জন্ম দেবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে, এমন আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। আমরা আশা করতে পারি যে গুণমণ্ডিত অভ্যাসগুলি তাদের মধ্যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এবং সম্ভবত উত্তরাধিকারসূত্রে মনের গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যাবে। তখন মানুষের উচ্চতর আর নিম্নতর আবেগগুলির মধ্যেকার সংঘাতের তীব্রতা অনেক কমে যাবে, এবং সদ্‌গুণাবলিই নেবে বিজয়ীর ভূমিকা।

শেষ পরিচ্ছেদ দু'টির সংক্ষিপ্তসার

নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে নিম্নতম পর্যায়ে থাকা মানুষের মন আর উচ্চতম পর্যায়ের জীবজন্তুদের মন—এ দুটোর মধ্যে বিস্তর তফাত রয়েছে। কোনও বনমানুষ যদি তার নিজের অবস্থাকে নির্মোহভাবে বিচার করতে পারত, তাহলে সে অবশ্যই স্বীকার করত যে, কোনও বাগান লুঠ করার একটা সুকৌশলী পরিকল্পনা হয়তো সে তৈরি করতে পারে, লড়াই করা কিংবা বাদাম ভাঙার জন্য পাথরও হয়তো ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু পাথর দিয়ে অস্ত্র বা যন্ত্র বানানোর কথা চিন্তা করার মতো ক্ষমতা তার নেই। আর কোনও অধিবিদ্যক যুক্তিধারা অনুসরণ করা, কিংবা কোনও গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা, বা ঈশ্বর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা অথবা কোনও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা—এ-সব ক্ষমতা তো আদৌ নেই তার। তবে হ্যাঁ, কোনও কোনও বনমানুষ অবশ্য দাবি করতে পারে যে বিয়ের সময় তাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের রঙবাহারি ত্বক আর লোমের সৌন্দর্যের মর্যাদা দিতে তারা জানে, এবং দিয়েও থাকে! সেইসঙ্গেই বনমানুষদের স্বীকার করতে হবে যে, কোনও কিছু দেখলে বা খুব সাধারণ কোনও জিনিস দরকার হলে তারা অনেক সময় চিৎকার করে সেটা অন্য বনমানুষদের জানাতে পারলেও, নির্দিষ্ট শব্দ দিয়ে প্রকাশ করার ধারণা কখনওই তাদের মাথায় আসেনি। নিজের দলের অন্য বনমানুষদের নানাভাবে সাহায্য করতে, তাদের জন্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে কিংবা বাপ-মা মরা সন্তানদের দায়িত্ব নিতে আমরা রাজি—এমন দাবি হয়তো বনমানুষেরা করতেও পারে। কিন্তু তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে সমস্ত সজীব প্রাণীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসার ব্যাপারটা, যা মানুষের মহত্তম গুণ, তা তাদের সমস্ত বোধ-বুদ্ধির বাইরে।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও, মানুষ আর উচ্চতর জীবজন্তুদের মনের পার্থক্যটা (তা সে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন) হচ্ছে মাত্রার পার্থক্য, উভয়ের মনের গড়নে কোনও পার্থক্য নেই। আমরা আগেই দেখেছি যে বিভিন্ন বোধ, স্বজ্ঞা, নানান আবেগ আর

মানসিক ক্ষমতা, যেমন ভালবাসা, স্মরণশক্তি, কোনও বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া, কৌতূহল, অনুকরণ প্রবণতা, বিচারশক্তি প্রভৃতি যে-সব গুণের জন্য মানুষ গর্ববোধ করে, সেগুলি নিম্নতর জীবজন্তুদের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায়, এমনকী কখনও কখনও বেশ উচ্চ মাত্রাতেও দেখা যায়। উত্তরাধিকারগত কিছু কিছু উন্নতি ঘটাতেও তারা সক্ষম, যেমনটা আমরা দেখেছি নেকড়ে বা শিয়ালের সঙ্গে গৃহপালিত কুকুরের তুলনা করার সময়। যদি প্রমাণ করা যেত যে কিছু কিছু উঁচুমানের মানসিক ক্ষমতা, যেমন সাধারণ ধারণা গড়ে তোলা, আত্মসচেতনতা প্রভৃতি মানসিক ক্ষমতা শুধুমাত্র মানুষেরই একচেটিয়া ব্যাপার (যে সম্বন্ধে আদৌ নিঃসংশয় হওয়া যায় না), তাহলে আমরা ধরেই নিতে পারতাম যে এই গুণগুলি হচ্ছে আসলে অন্যান্য অত্যুন্নত মননগত ক্ষমতারই স্বাভাবিক ফল মাত্র, আবার ওই মননগত ক্ষমতাগুলিও হচ্ছে মূলত একটা উন্নত ভাষাকে অবিরামভাবে ব্যবহার করারই ফল। ঠিক কোন্ বয়সে পৌঁছনোর পর একটি নবজাত শিশু বিভিন্ন বিষয়ের মূল জিনিসটা বুঝতে পারে অর্থাৎ বিমূর্তীকরণের ক্ষমতা অর্জন করে, অথবা আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে শেখে? আমাদের জানা নেই। ক্রমে ক্রমে উন্নত হয়ে ওঠার জৈবিক বিন্যাসের ব্যাপারেও সঠিক উত্তর জানা নেই আমাদের। ভাষার আধা-কৌশল ও আধা-সহজাত প্রবৃত্তিমূলক চরিত্রের মধ্যে এই ক্রমান্বয় বিবর্তনের ছাপ আজও রয়ে গেছে। সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি মহৎ বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় না, আর অপ্রাকৃত শক্তিসমূহের প্রতি বিশ্বাসটা একান্ত স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার সাহায্যেই। মানুষ ও নিম্নতর শ্রেণির প্রাণীদের মধ্যেকার সবথেকে বড় পার্থক্যটা সম্ভবত নৈতিক বোধের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করছি না, কেননা কিছুক্ষণ আগেই আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে সক্রিয় মননগত ক্ষমতা এবং অভ্যাসের প্রভাবের সাহায্যে সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি—যা মানুষের নৈতিক কাঠামোর মুখ্য নীতি[২০]—স্বভাবতই উপনীত হয় সেই অমূল্য নিয়মে, 'তুমি যেমন ব্যবহার করবে, অন্য মানুষেরাও তোমার সঙ্গে ঠিক তেমন ব্যবহারই করবে। অতএব তুমিও তাদের প্রতি একই আচরণ করো।' আর এটাই হচ্ছে নৈতিকতার ভিত্তি।

সম্ভাব্য যে-সমস্ত পদক্ষেপ ও উপায়ের সাহায্যে মানুষের বিভিন্ন মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা। এই ধরনের বিবর্তন যে সম্ভব তা মোটেই অস্বীকার করা যায় না, কারণ প্রতিটি শিশুর মধ্যে এইসব ক্ষমতার অভিব্যক্তি প্রতিদিনই চোখে পড়ে আমাদের। আর নিম্নতর জীবজন্তুদের থেকেও নিম্নমানের কোনও চরম নির্বোধের মন থেকে শুরু করে কীভাবে ধাপে ধাপে নিউটনের মতো মনও গড়ে উঠেছে, তা-ও আমরা খুঁজে দেখতে পারি।

২০। 'দ্য থট্‌স অফ মার্কাস অরেলিয়াস', পৃঃ ১৩৯।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আদিম এবং সভ্য যুগে মননগত নৈতিক ক্ষমতার বিকাশ প্রসঙ্গে

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মননগত ক্ষমতার অগ্রগতি—অনুকরণের গুরুত্ব—সামাজিক ও নৈতিক কার্যক্ষমতা—একই গোষ্ঠীর মধ্যে এইসব ক্ষমতার বিকাশ—প্রাকৃতিক নির্বাচন যেভাবে সুসভ্য জাতিগুলিকে প্রভাবিত করেছে—সুসভ্য জাতিগুলিও যে একদা বর্বর অবস্থায় ছিল তার প্রমাণাবলি।

এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এ-বিষয়ে আমি কিছু অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত আলোচনাই শুধু করতে পারি। আমরা আগে মিঃ ওয়ালেসের যে মূল্যবান রচনাটির কথা উল্লেখ করেছি, সেই রচনায় তিনি বলেছেন—যে-সব মননগত এবং নৈতিক গুণ মানুষকে নিম্নতর শ্রেণির জীবজন্তুদের থেকে পৃথক করে তুলেছে, সেই গুণগুলি আংশিকভাবে অর্জন করার পর প্রাকৃতিক নির্বাচন বা অন্য কোনও উপায়ে মানুষের আর কোনও শারীরিক পরিবর্তন ঘটে না। কারণ, নিজের মানসিক ক্ষমতার সাহায্যে 'পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজের শরীরকে অপরিবর্তিত অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে' মানুষ সক্ষম। নতুন নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজের অভ্যাসকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে মানুষের। খাদ্য সংগ্রহ ও নিজেকে রক্ষা করার জন্য নানান অস্ত্র, যন্ত্রপাতি এবং বহুবিধ কৌশল উদ্ভাবন করেছ সে। কোনও শীতপ্রধান অঞ্চলে গিয়ে পড়লে সে গরম পোশাক ব্যবহার করে, আচ্ছাদন বানায়, আগুন জ্বালায়। আগুনের সাহায্যে সে এমন সব খাদ্য রান্না করে নেয় যে খাদ্যগুলি কাঁচা অবস্থায় দুষ্পাচ্য থাকে। নিজের প্রতিবেশীদের সে নানাভাবে সাহায্য করে, এবং ভবিষ্যতে কী কী ঘটতে পারে তা অনুমান করার চেষ্টা করে। এমনকী বহু প্রাচীন যুগেও কিছু কিছু শ্রম-বিভাজন চালু করেছিল মানুষ। অন্যদিকে, অবস্থার বিপুল পরিবর্তনের মধ্যে টিকে থাকার জন্য নিম্নতর শ্রেণির জীবজন্তুদের শারীরিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। নতুন শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হয় কিংবা আরও তীক্ষ্ণ দাঁত-নখের দরকার হয়, অথবা, ধরা পড়া আর বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আয়তনে ছোট হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। শীতলতর আবহাওয়ায় গিয়ে পড়লে দরকার হয় শরীরজোড়া আরও ঘন রোমরাজি কিংবা শারীরিক ধাত পরিবর্তন। এইসব পরিবর্তন না ঘটলে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মিঃ ওয়ালেস অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন, মানুষের মননগত ও নৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। এই ক্ষমতাগুলি পরিবর্তনশীল, এবং এই পরিবর্তনগুলি যে বংশপরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত হয়, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট

কারণ আছে। কাজেই প্রাচীন যুগের মানুষ এবং তাদের বানর-সদৃশ পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে যদি এই গুণগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত যথাযথ বা উন্নত হয়ে উঠেছে। মননগত গুণগুলি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই, কেননা এই গুণগুলির জোরেই মানুষ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেয়েছে। সমাজের একেবারে আদিম অবস্থায় যে-সব লোক সবথেকে বিচক্ষণ ছিল, যারা সবথেকে ভাল হাতিয়ার বা ফাঁদ তৈরি করতে ও তা ব্যবহার করতে পারত, এবং যারা সবথেকে ভালভাবে নিজেদের রক্ষা করতে পারত, তারাই সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তান লালনপালন করতে সক্ষম ছিল। যে-সব গোষ্ঠীর মধ্যে এ-রকম গুণী লোক প্রচুর থাকত, তারা সংখ্যায় বেড়ে উঠত এবং ছাপিয়ে যেত অন্য গোষ্ঠীগুলিকে। কোনও জায়গার জনসংখ্যা কত হবে, সেটা প্রধানত নির্ভর করে জীবনধারণের উপকরণের ওপর, আর সেটা আবার নির্ভর করে আংশিকভাবে সেই দেশের প্রাকৃতিক চরিত্রের ওপর এবং তার থেকেও অনেক বেশি নির্ভর করে ওই দেশে যে-সব কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়, তার ওপর। গোষ্ঠীগুলির জনসংখ্যা এভাবেই বেড়ে চলে। তারা অন্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করলে সেই গোষ্ঠীর সদস্যরাও তাদের সঙ্গে মিশে যায়, ফলে গোষ্ঠীটির জনসংখ্যা আরও বেড়ে ওঠে।[১] কোনও গোষ্ঠীর সদস্যদের দৈহিক উচ্চতা কত, শরীরের শক্তি কেমন—এগুলি গোষ্ঠীর সাফল্যের ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি আংশিকভাবে নির্ভর করে ওই এলাকায় কী ধরনের ও কত পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায়, তার ওপর। ইউরোপের ব্রোঞ্জ যুগের মানুষরা অন্য একটি অধিকতর শক্তিশালী জাতির দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। ওই শেষোক্ত জাতিটির তরবারির হাতল ছিল অনেকটা বেশি লম্বা, অর্থাৎ তাদের হাতের দৈর্ঘ্যও ছিল বড়। এটা তাদের কিছুটা সুবিধা নিশ্চয়ই দিয়েছিল, কিন্তু সম্ভবত তাদের সাফল্যের অনেক বড় কারণ ছিল কলাকৌশলের উৎকর্ষতা।

বন্যদের সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানি অথবা তাদের বিভিন্ন প্রথা ও প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভগুলি থেকে যেটুকু অনুমান করতে পারি—আজকের বাসিন্দারা যেগুলির ইতিহাস প্রায় ভুলেই গেছে—তা থেকে বোঝা যায় যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই সমৃদ্ধ গোষ্ঠীগুলি অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিকে ছলে-বলে-কৌশলে দখল করে আসছে। পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য অঞ্চলে, আমেরিকার বনময় সমতলে, প্রশান্ত মহাসাগরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিতে আবিষ্কৃত হয়েছে বিলুপ্ত বা বিস্মৃত বহু গোষ্ঠীর নানান নিদর্শন। আজকের দিনে সভ্য জাতিগুলি সর্বত্রই বর্বর জাতিগুলির উপর কৌশলে প্রভুত্ব কায়েম করছে—শুধু যে-সব জায়গায় জলবায়ু একটা সাঙ্ঘাতিক বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেইসব জায়গা

১। স্যর হেনরি মেইন বলেছেন ('এনসিয়েন্ট ল্য,' পৃঃ ১৩১), কোনও গোষ্ঠী অপর কোনও গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর থেকে ওই প্রথম গোষ্ঠীর সদস্যরা মনে করতে শুরু করে যে বিজয়ী গোষ্ঠীটির পূর্বপুরুষরাই তাদেরও আদিপুরুষ।

বাদে। এ-কাজে সভ্য জাতিগুলি পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই সফল হতে পারছে তাদের কলাকৌশলের সাহায্যেই, যা একান্তভাবে উন্নত মননশক্তিরই ফসল। কাজেই এটা খুবই সম্ভব যে মানবজাতির ক্ষেত্রে মননগত ক্ষমতাগুলি যথাযথ হয়ে উঠেছে মূলত প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে এবং তা ঘটেছে ধীরে ধীরে। আমাদের আলোচনার পক্ষে এই সিদ্ধান্তটুকুই যথেষ্ট। প্রতিটি পৃথক পৃথক ক্ষমতা নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে যে-অবস্থায় থাকে, তার থেকে অনেক উন্নত অবস্থায় থাকে মানুষের মধ্যে। প্রতিটি ক্ষমতার এই উত্তরণের ধারাকে খুঁজে বার করতে পারলে যে খুবই ভাল হত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-কাজ করার মতো সামর্থ্য বা জ্ঞান আমার নেই।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, মানুষের পূর্বপুরুষরা সামাজিক জীব হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে (সম্ভবত তা ঘটেছিল বহুকাল আগেই) তাদের অনুকরণের নীতি, চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা আর অভিজ্ঞতাও অনেক উন্নত হয়ে উঠেছিল, আর তার ফলে তাদের মননগত ক্ষমতাতেও দেখা দিয়েছিল বিরাট পরিবর্তন। নিম্নতর শ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে এই ক্ষমতার কিছু সূক্ষ্ম ছাপ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। নিম্নতম স্তরের বন্য মানুষদের মতোই বনমানুষরাও অনুকরণের ব্যাপারে খুব পারদর্শী হয়ে থাকে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর একই জায়গায় একই ফাঁদ পেতে কোনও জন্তুকেই আর ধরা যায় না। এ থেকে বোঝা যায় জীবজন্তুরা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয় এবং অন্যদেরকেও সতর্কতার সঙ্গে অনুকরণ করে। কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় বিচক্ষণ কোনও লোক যদি একটা নতুন ধরনের ফাঁদ কিংবা হাতিয়ার অথবা আক্রমণ বা আত্মরক্ষার জন্য কোনও নয়া উপায় উদ্ভাবন করে, তাহলে গোষ্ঠীর বাকি সদস্যরাও তার অনুকরণ করতে শুরু করে এবং তাতে প্রত্যেকেই লাভবান হয়। এই অনুকরণের জন্য খুব বেশি চিন্তাশক্তির দরকার হয় না, নিছক আত্মস্বার্থই তাদেরকে ঠেলে নিয়ে যায়। নতুন নতুন প্রতিটা কলাকৌশলের অভ্যাসগত অনুশীলনের ফলে মননশক্তিও একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। নতুন উদ্ভাবনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হলে গোষ্ঠীটির লোকসংখ্যা বাড়ে, ছড়িয়ে পড়ে তারা এবং অন্য গোষ্ঠীদের স্থানচ্যুত করে তাদের এলাকা দখল করে নেয়। এইরকমভাবে সংখ্যায় বেড়ে ওঠা কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে আরও উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ও উদ্ভাবনক্ষম মানুষ জন্মানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের মানুষদের সন্তান থাকলে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে তার এই মানসিক উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে আর সেক্ষেত্রে আরও বেশি উদ্ভাবনশীল মানুষ জন্মানোর সম্ভাবনাও অনেক জোরদার হয়ে ওঠে। খুব ছোট কোনও গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তো এই সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। মানসিক উৎকর্ষযুক্ত ওইসব মানুষদের কোনও সন্তান যদি না-ও থাকে, তাহলেও গোষ্ঠীর মধ্যে তার জ্ঞাতিরা তো থাকেই, আর তাদের মধ্যেও এ-সব উৎকর্ষতার স্ফুরণ ঘটা সম্ভব। জীবতত্ত্ববিদরা জানিয়েছেন—যখন কোনও জন্তুকে জবাই করার সময় জানা যায় জন্তুটি সবদিক দিয়ে উৎকর্ষযুক্ত, তখন তার পরিবারের অন্যান্যদের

দ্বারা বংশবৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা হয় যাতে সেই বাচ্চাটিকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্য দিয়ে তার জন্মদাতার গুণগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে।

এবার সামাজিক ও নৈতিক গুণগুলির কথায় আসা যাক। সামাজিক জীব হয়ে ওঠার জন্য আদিম মানুষকে অথবা তার বানর-সদৃশ পূর্বপুরুষকে সেই সহজাত অনুভূতি অবশ্যই অর্জন করতে হয়েছিল, যে-অনুভূতির প্রভাবেই অন্যান্য জীবজন্তুরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। নিঃসন্দেহেই বলা যায়, ওইসব জীবজন্তুদের মতো প্রবণতা তাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই দেখা গিয়েছিল। নিজের সঙ্গীসাথীদের প্রতি কিছুটা ভালবাসা দেখা গিয়েছিল মানুষের মধ্যেও, তাদের থেকে কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সে অস্বস্তি অনুভব করত। বিপদের গন্ধ পেলে একে অপরকে সতর্ক করত, আক্রমণ বা আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করত পরস্পরকে। এই সবকিছুর মধ্যে সহানুভূতি, বিশ্বস্ততা ও সাহসের একটা চিত্রই ফুটে ওঠে। নিম্নতর প্রাণীদের জীবনে এইসব সামাজিক গুণ যে চরম গুরুত্বপূর্ণ, সে-কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য। নির্দ্বিধায় বলা চলে, মানুষের আদি পূর্বপুরুষরাও জীবজন্তুদের মতো একইভাবে, অর্থাৎ, উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত অভ্যাসের সাহায্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফতই এইসব সামাজিক গুণ অর্জন করেছিল। ধরা যাক আদিম মানুষদের দুটি গোষ্ঠী একই অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করে। কোনও-এক সময় তাদের মধ্যে দেখা দিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ধরা যাক গোষ্ঠী দুটির অন্য সব অবস্থা একইরকম, কিন্তু একটা গোষ্ঠীর মধ্যে সাহসী, সহানুভূতিশীল ও বিশ্বস্ত সদস্যের সংখ্যা অপর গোষ্ঠীটির চেয়ে বেশি এবং তারা বিপদ সম্বন্ধে পরস্পরকে সতর্ক করার জন্য, পরস্পরকে সাহায্য ও রক্ষা করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে ওই গোষ্ঠীটিই জয়লাভ করবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। মনে রাখা দরকার, বন্যদের অবিরাম যুদ্ধের আঙিনায় বিশ্বস্ততা আর সাহসের গুরুত্ব অপরিসীম। কোনও বিশৃঙ্খল দলের তুলনায় কোনও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর সৈনিকরা যে অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে থাকে, তার মূল কারণ হল—সৈন্যবাহিনীর প্রতিটি সদস্য তার সাথীদের ওপর আস্থা রাখে। মিঃ বেগ্‌হট চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন, যে-কোনও ধরনের সরকারের ক্ষেত্রেই আনুগত্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বার্থপর ও কলহপ্রিয় লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করতে পারে না, আর মিলে-মিশে কাজ করতে না পারলে কোনও-কিছুই অর্জন করা যায় না। এইসব গুণে সমৃদ্ধ কোনও গোষ্ঠী সহজেই বিস্তার লাভ করে এবং অন্যান্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কালের গতিপথে অন্য কোনও আরও বেশি গুণসমৃদ্ধ গোষ্ঠীর কাছে এদেরকেও একদিন-না-একদিন মাথা নোয়াতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক ও নৈতিক গুণগুলি ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে ওঠে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েও পড়তে পারে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে—কোনও একটাই গোষ্ঠীর মধ্যেকার বেশ কিছু মানুষ প্রথমে কীভাবে এইসব সামাজিক ও নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, এবং সেগুলির উৎকর্ষতার মানই বা কীভাবে উন্নত হয়ে উঠেছিল? সহানুভূতিপ্রবণ

ও পরোপকারী নারী-পুরুষের সন্তান, অথবা সাথীদের প্রতি সবথেকে বিশ্বস্ত নারী-পুরুষের সন্তানদের সংখ্যা ওই একই গোষ্ঠীভুক্ত স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক নারী-পুরুষের সন্তানদের চেয়ে বেশি হত কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। নিজের সাথীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার বদলে যারা তাদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিত (বন্যদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়), তারা প্রায়শই নিজেদের মহান চরিত্রের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কোনও সন্তান রেখে যেতে পারত না। যে-সব সাহসী মানুষ সবসময়েই এগিয়ে যেত যুদ্ধের সামনের সরিতে, অন্যদের জন্য স্বেচ্ছায় বিপন্ন করত নিজেদের জীবন, স্বাভাবিকভাবেই তাদের গড়পড়তা মৃত্যুর হার অন্যদের তুলনায় বেশি হত। কাজেই প্রাকৃতিক নির্বাচন অর্থাৎ যোগ্যতমের টিকে থাকার নীতি অনুযায়ী এই ধরনের গুণসম্পন্ন মানুষদের সংখ্যা অথবা তাদের উৎকর্ষতার মান ক্রমেই বেড়ে চলবে, এটা মোটেই সম্ভব নয়। কেননা এখানে আমরা কোনও-একটি গোষ্ঠী কর্তৃক অপর কোনও গোষ্ঠীকে পরাজিত করার বিষয়ে আলোচনা করছি না।

একই গোষ্ঠীর মধ্যে এইরকম গুণসমৃদ্ধ মানুষদের সংখ্যা কোন্ কোন্ পরিস্থিতির দরুন বেড়ে চলতে পারে, তা স্পষ্টভাবে খুঁজে বার করা খুবই জটিল ব্যাপার। তবু সম্ভাব্য কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমত, গোষ্ঠীর সদস্যদের চিন্তাভাবনার ক্ষমতা ও দূরদর্শিতা উন্নত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষই বুঝতে শিখেছিল যে সে যদি অন্যদের সাহায্য করে, তাহলে সে নিজেও পালটা সাহায্য পেতে পারবে। এই হীন উদ্দেশ্য থেকেই হয়তো সে ধীরে ধীরে অর্জন করেছিল অন্যদের সাহায্য করার অভ্যাসটা, আর এই পরোপকার করার অভ্যাসটা নিশ্চিতভাবেই জোরদার করে তুলেছিল সহানুভূতিবোধকে। মানুষ যে পরোপকার করতে চায়, তার কারণ হচ্ছে এই সহানুভূতিবোধ। তাছাড়া, কোনও-একটা অভ্যাস বহু প্রজন্ম ধরে অনুশীলিত হতে হতে একসময় উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তাতে শুরু করেছিল, এমনটা হওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু সামাজিক গুণাবলির বিকাশে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে আমাদের প্রতিবেশীদের প্রশংসা ও নিন্দা। আমরা আগেই দেখেছি যে, সহানুভূতি সংক্রান্ত প্রবৃত্তিটির সাহায্যে আমরা সঙ্গতভাবেই অন্যদের প্রশংসা বা নিন্দা করে থাকি, কিন্তু নিজেদের বেলায় প্রশংসা পেতে ভালবাসি আর নিন্দাকে অপছন্দ করি। অন্যান্য সামাজিক প্রবৃত্তির মতো এই সহজাত প্রবৃত্তিটাও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যেই অর্জন করেছিল মানুষ। মানুষের পূর্বপুরুষরা তাদের বিকাশের গতিপথে ঠিক কতদিন আগে অন্য মানুষদের প্রশংসা বা নিন্দাকে অনুভব করতে বা তার দ্বারা আলোড়িত হতে শুরু করেছিল, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু এমনকী কুকুররাও উৎসাহ, প্রশংসা বা নিন্দা উপলব্ধি করতে পারে বলেই মনে হয়। একেবারে অ-সভ্যতম বন্যদের মধ্যেও গৌরব অর্জনের মানসিকতা কাজ করে। এই মানসিকতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই এইসব ঘটনার মধ্যে—নিজেদের শৌর্যের স্মারক তারা রক্ষা করে সযত্নে,

তাদের মধ্যে দেখা যায় অতিরিক্ত দম্ভোক্তি করার প্রবণতা, এমনকী নিজেদের চেহারা ও সাজগোজের ব্যাপারেও তারা অতীব মনোযোগী। নিজের সঙ্গীসাথীদের মতামতকে গুরুত্ব না দিলে এ-সব অভ্যাসের কোনও অর্থই থাকে না।

নিজেদের কোনও গৌণ নিয়ম ভঙ্গ করলে এরা লজ্জা তো অনুভব করেই, সম্ভবত অনুতাপেও দগ্ধ হয়। জনৈক অস্ট্রেলিয়ান তার মৃতা স্ত্রীর আত্মাকে প্রসন্ন করার জন্য অপর একটি স্ত্রীলোককে হত্যা করতে চেয়েছিল। কাজটা করতে দেরি হওয়ার দরুন লোকটি অস্থির হয়ে উঠেছিল এবং কৃশকায় হয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের আর কোনও ঘটনার কথা আমার জানা না থাকলেও এ-কথাটা জোর দিয়েই বলা চলে যে, যে-বন্যরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে তবু গোষ্ঠীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না, বন্দীত্ব মেনে নেয় তবু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না, তারা তাদের ধারণামতো কোনও পবিত্র কর্তব্য সমাধা করতে না পারলে অন্তরের অন্তঃস্থলে কোনওরকমে অনুশোচনা বোধ করবে না, তা হতেই পারে না।

কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, খুব প্রাচীনকালে আদিম যুগের মানুষরা তাদের সঙ্গীসাথীদের প্রশংসা ও নিন্দার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা যায়, একই গোষ্ঠীর সদস্যরা সেইসব আচরণকেই অনুমোদন করবে যেগুলি তাদের সবার পক্ষে মঙ্গলজনক, এবং সেইসব আচরণের নিন্দা করবে যেগুলি তাদের পক্ষে ক্ষতিকর। নৈতিকতার বনিয়াদ হচ্ছে অন্যদের উপকার করা—অন্যদের সঙ্গে তুমি যেমন আচরণ করবে, তারাও তোমার সঙ্গে তেমন আচরণই করবে। তাই আদিম যুগের মানুষের পক্ষে প্রশংসা-প্রীতি আর নিন্দা-ভীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করাটা মোটেই অতিরঞ্জন নয়। কোনও মানুষ যদি কোনও গভীর, সহজাত অনুভূতির দ্বারা চালিত হয়ে অন্যদের উপকারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার বদলে কোনও গৌরব অর্জনের তাড়নায় তার জীবন উৎসর্গ করে, তাহলে তার সেই কাজটাও অন্য মানুষদের মধ্যে ওই গৌরব অর্জনের স্পৃহা জাগিয়ে তোলে আর নানাজনের এই ধরনের কাজের ফলে অন্যদের সম্মান জানানোর মহৎ অনুভূতিটিও জোরদার হয়ে ওঠে। নিজের মহৎ গুণাবলির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কোনও সন্তান রেখে না গিয়েও সে এইভাবে তার গোষ্ঠীর অনেক বেশি উপকার করতে পারে।

অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার শক্তি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার কাজকর্মের সুদূরপ্রসারী ফলাফলকে বুঝতে শেখে, আর মিতাচার, সতীত্ব প্রভতির মতো যে-সব আত্মসংযমমূলক গুণকে একসময় কোনওরকম মর্যাদাই দেওয়া হত না, সেগুলি বিপুল মর্যাদা পেতে শুরু করে, এবং এ-রকম কোনও কোনও গুণকে এখনও পবিত্র ব্যাপার হলে মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে চতুর্থ পরিচ্ছেদে যা বলে এসেছি, তার আর পুনরাবৃত্তি করছি না। আমাদের নীতিবোধ বা বিবেকবোধ শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় এক অত্যন্ত জটিল অনুভূতিতে, যার উদ্ভব হয় সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে, বহুলাংশে পরিচালিত হয় আমাদের সঙ্গীসাথীদের অনুমোদন-অননুমোদনের দ্বারা, যার দিকনির্দেশ

করে চিন্তাশক্তি, আত্মস্বার্থ এবং পরবর্তীকালে গভীর ধর্মীয় অনুভূতি, আর যা সুদৃঢ় হয়ে ওঠে নির্দেশ ও অভ্যাসের সাহায্যে।

কোনও ব্যক্তি ও তার সন্তানদের নৈতিকতার মান খুব উঁচু হলেও তার দরুন তারা নিজেদের গোষ্ঠীর অপর সদস্যদের তুলনায় খুব-একটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে না, এ-কথা সত্য। কিন্তু কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ গুণসমন্বিত মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ও তাদের নৈতিকতার মান উন্নত হলে সেই গোষ্ঠীটি যে অন্য গোষ্ঠীগুলির তুলনায় অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে, এ-কথাটা জোর দিয়েই বলা যায়। দেশপ্রেম, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, সাহস, সহানুভূতি, পরস্পরকে সাহায্য করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা—এইসব মহৎ গুণে সমৃদ্ধ মানুষ যে-গোষ্ঠীতে বেশি থাকত তারা সহজেই অন্যান্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে পারত, তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে পারত। আর এটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। দেখা যায়, পৃথিবীর সব দেশে সব কালেই এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করেছে। যেহেতু এইসব গোষ্ঠীর সাফল্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নৈতিকতা, তাই সর্বত্রই এই নৈতিকতার মান উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ গুণসমৃদ্ধ মানুষদের সংখ্যা বেড়ে যেতে দেখা গেছে। তবে, কোনও বিশেষ গোষ্ঠী কেন সফল হতে এবং সভ্যতার স্তরে উন্নীত হতে পারল, আর অপর একটি গোষ্ঠী কেন তা পারল না, সেটা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। বেশ কয়েক বছর আগে যখন বিভিন্ন বন্য জাতির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়, তখন তারা অনেকেই একইরকম অবস্থায় ছিল। মিঃ বেগ্‌হট সঠিকভাবেই বলেছেন, মানবসমাজের অগ্রগতির ব্যাপারটাকে আমরা নিতান্ত স্বাভাবিক বলেই মনে করে থাকি, কিন্তু ইতিহাস তাতে সায় দেয় না। প্রাচীনকালের মানুষেরা এ নিয়ে ভাবতই না, আজকের প্রাচ্য জাতিগুলিও ভাবে না। আর-এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ স্যর হেনরি মেইন বলেছেন, 'মানবজাতির অধিকাংশের মধ্যে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত করার সামান্যতম আকাঙ্ক্ষাও কখনও দেখা যায়নি।' নানা ধরনের আনুষঙ্গিক অনুকূল অবস্থার ওপরেই অগ্রগতি নির্ভর করে, যেগুলিকে খুঁজে বার করা একান্তই দুরূহ। তবে, একটা শান্ত, নিরুদ্বেগ পরিবেশ যে অগ্রগতি ও বিকাশের পক্ষে খুবই অনুকূল এবং সেটা যে মানুষের মধ্যে এনে দেয় শিল্প গড়ে তোলার ক্ষমতা, নানান চারু ও কারু শিল্পের দক্ষতা, এ-কথা বহুজনই স্বীকার করেছেন।

নিদারুণ প্রয়োজনের তাগিতে এস্কিমোরা সুদক্ষ কৌশলে বহু কিছু উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু তাদের অঞ্চলের জলবায়ু মোটেই ধারাবাহিক অগ্রগতির অনুকূল নয়। যাযাবরসুলভ অভ্যাসও সর্বক্ষেত্রেই অত্যন্ত ক্ষতিকারক—তা সে বিস্তৃত সমতল অঞ্চল জুড়েই হোক, বা উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের ঘন অরণ্যানীর মধ্যেই হোক, কি সমুদ্রের উপকূল বরাবরই হোক। টিয়েরা দেল্ ফুয়েগো-র বর্বর অধিবাসীদের পর্যবেক্ষণ করার সময় আমার মনে হয়েছিল, কিছু অস্থাবর সম্পত্তি, একটা স্থায়ী আবাস, এবং একজন প্রধানের অধীনে বেশ কিছু পরিবারের একএবাস—এগুলিই সভ্যতার

অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এই ধরনের অভ্যাস-সমূহ কৃষিকাজকে প্রায় অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। অন্যত্র আমি দেখিয়েছি, সম্ভবত কোনও-না-কোনও আকস্মিক ঘটনা থেকেই কৃষিকাজের সূত্রপাত হয়েছিল। যেমন, হয়তো কোনও আবর্জনাস্তূপের ওপর কোনও ফলের বীজ পড়ল, কিছুদিন পর সেই আবর্জনাস্তূপের মধ্যে মানুষ দেখল এক আশ্চর্য জিনিস : গাছ! শুরু হল কৃষিকাজ। তবে বন্য মানুষরা প্রথমে সভ্যতার দিকে ঠিক কীভাবে পা বাড়িয়েছিল, সেটা আজ নির্দিষ্ট করে বলা খুবই কঠিন।

প্রাকৃতিক নির্বাচন কীভাবে সুসভ্য জাতিগুলিকে প্রভাবিত করে

এখনও পর্যন্ত আমি শুধু অর্ধ-মানবীয় অবস্থা থেকে মানুষ কীভাবে আধুনিক বন্য অবস্থায় এসে পৌঁছল, তা নিয়েই আলোচনা করেছি। সুসভ্য জাতিগুলির ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচন কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, সে-প্রসঙ্গে এবার কিছু বলা দরকার। মিঃ ডব্লিউ. আর. গ্রেগ এবং তার আগে মিঃ ওয়ালেস ও মিঃ গ্যাল্টন এ-বিষয়ে বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এই তিনজনের রচনা থেকেই আমি আমার অধিকাংশ বক্তব্য সংগ্রহ করেছি। শারীরিক বা মানসিকভাবে দুর্বল লোকদের বন্যরা বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখে না। আর যারা টিকে থাকে, তাদের শরীর-স্বাস্থ্য সাধারণত দারুণ হয়। অন্যদিকে, আমরা অর্থাৎ সভ্য মানুষেরা আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি দুর্বলদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে। জড়বুদ্ধি, বিকলাঙ্গ ও অসুস্থদের জন্য আমরা গড়ে তুলি নানান সেবা-প্রতিষ্ঠান, দরিদ্রদের ত্রাণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য রচনা করি আইন, প্রতিটি মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের যাবতীয় দক্ষতা উজাড় করে দেন আমাদের চিকিৎসকরা। অতীতে শারীরিক দুর্বলতার দরুন যারা গুটি-বসন্তে আক্রান্ত হত, এমন হাজার হাজার মানুষ যে গুটি-বসন্তের-টিকা নেওয়ার ফলে রক্ষা পেয়েছে, তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সভ্য সমাজে দুর্বল সদস্যরাও এইভাবে টিকে থাকে এবং বংশবিস্তার করে। গৃহপালিত পশুদের প্রসব-দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একমত হবেন যে ওইরকম প্রসব-প্রক্রিয়া মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরিচর্যার অভাব কিংবা ভুল পরিচর্যা অল্পদিনের মধ্যেই যে-কোনও গৃহবাসী প্রজাতির বিপুল ক্ষতি করতে পারে। তবে শুধু নিজেদের ব্যাপারটা (অর্থাৎ মানুষের বংশবিস্তার) বাদে, কোনও মানুষই নিকৃষ্টতম শারীরিক গঠন ও গুণসম্পন্ন জন্তু-জানোয়ারদের বংশবিস্তার করতে দিতে চায় না।

অসহায়দের সাহায্য করার যে-তাড়না আমরা মনের মধ্যে অনুভব করে থাকি, তা আসলে আমাদের সহানুভূতি বিষয়ক প্রবৃত্তিটিরই একটি স্বাভাবিক ফল। এই প্রবৃত্তিটি মানুষ প্রথম অর্জন করেছিল তার সামাজিক প্রবৃত্তির অংশ হিসাবেই। কিন্তু পরবর্তীকালে (পূর্বোল্লিখিত প্রক্রিয়ায়) তা আরও কোমল, আরও বহুবিস্তৃত হয়ে ওঠে। আমাদের চরিত্রের মহত্তম অংশের অবনতি না ঘটিয়ে আমরা আমাদের সহানুভূতিকে রুদ্ধ রাখতে পারি না, এমনকী তা রুদ্ধ করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ

থাকলেও নয়। শল্যচিকিৎসার সময় কোনও শল্যচিকিৎসক নিজের মনকে কঠোর, নির্মম করতে তুলতে পারেন, কারণ তাতেই রোগীর মঙ্গল। কিন্তু দুর্বল ও অসহায়দের কি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই অবহেলা করতে পারি? ভীষণরকম ক্ষতিকর কোনও আশু বিষয়ের হাত থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য হয়তো করতে পারি, অন্যথায় নয়। অক্ষম, দুর্বল মানুষদের টিকে থাকা ও বংশবিস্তার করার সন্দেহাতীত ক্ষতিকর ফলাফলের কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। তবে এইসব মানুষদের দ্রুত বংশবিস্তারের পথে অন্তত একটা প্রতিবন্ধক আছে: সমাজের দুর্বল ও অক্ষম মানুষরা সুস্থ সবল মানুষদের মতো সহজে বিবাহ করতে পারে না। শারীরিক বা মানসিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিরা আদৌ বিবাহ না করলে এই প্রতিবন্ধকটা সবথেকে বেশি কার্যকরী হতে পারত। তবে সেটা শুধু আশাই করা যায়, বাস্তবে তা ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। যে-সব দেশে প্রচুর সৈন্যবিশিষ্ট নিয়মিত সৈন্যবাহিনী আছে, সেখানে সবথেকে সুস্থ-সবল যুবকদের বাধ্যতামূলকভাবে অথবা স্বেচ্ছায় সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলত যুদ্ধের ময়দানে তারা অকালে প্রাণ দেয়, প্রায়শই নানান কদভ্যাসে লিপ্ত হয়, এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে বিবাহ করতে পারে না। অন্যদিকে, দুর্বল, রুগ্ন মানুষদের যুদ্ধে যেতে হয় না, নিজেদের ঘরেই থাকতে পারে তারা, ফলে বিবাহ ও বংশবিস্তার করার সম্ভাবনাও তাদের অনেক বেশিই থাকে।

জীবন মানুষ যে-সব সম্পদ বা সম্পত্তি অর্জন করে, সেগুলি সে রেখে যায় তার সন্তানদের জন্য। ফলে সাফল্যের প্রতিযোগিতায় দরিদ্রদের সন্তানদের তুলনায় ধনীদের সন্তানরা সবসময়ই এগিয়ে থাকে, আর তার জন্য শারীরিক বা মানসিক উৎকৃষ্টতার কোনও প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে, ক্ষীণজীবী ও অল্প বয়সে মৃত পিতা-মাতার সন্তানদের শরীর-স্বাস্থ্যও সাধারণত দুর্বল হয়, এবং তাদের বয়সী অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের তুলনায় তারা অনেক আগেই পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে বসে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা অন্যদের থেকে অল্প বয়সে বিবাহও করে এবং নিজেদের দুর্বলতার উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে যায় অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যাপারটা এমনিতে মোটেই ক্ষতিকর নয়, কারণ পুঁজির সঞ্চয় না হলে শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। আর মূলত এই শিল্পোদ্যোগের জোরেই সভ্য জাতিগুলি নিজেদের এলাকা বাড়াতে পেরেছে, আজও বাড়িয়ে চলেছে আর দখল করে চলেছে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতিগুলির এলাকা। পরিমিত পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করলে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াও কোনওভাবে ব্যাহত হয় না। কোনও দরিদ্র মানুষ মোটামুটি ধনী হয়ে উঠলে তার সন্তানরা এমনসব ব্যবসা বা পেশায় হাত দেয় যেখানে সংগ্রাম বেশ তীব্র, আর তার ফলে দেহে-মনে সক্ষম ব্যক্তিরাই সেখানে সবচেয়ে বেশি সাফল্যলাভ করে। দৈনন্দিন রুজি-রুটির জন্য যাদের পরিশ্রম করতে হয় না, এমন কিছু সুশিক্ষিত ব্যক্তির উপস্থিতি সমাজে একান্তই দরকার। যে-সব কাজে উচ্চ মননশীলতার প্রয়োজন, সে-সব কাজ এঁরাই করে থাকেন, আর এইসব কাজের ওপরেই নির্ভর করে সমস্ত ধরনের বস্তুগত অগ্রগতি—এছাড়াও

অন্যান্য উচ্চতর সুযোগ-সুবিধার কথা আর না-ই বা বললাম। সুপ্রচুর সম্পদ অবশ্য মানুষকে অকর্মণ্য ও অলস করে তোলে, তবে এ-রকম সম্পদশালী মানুষের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। আর এক্ষেত্রেও একটা ঝাড়াই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলমান। প্রতিদিনই আমরা অনেক বোকা বা অপব্যয়ী ধনী ব্যক্তিকে নিজেদের সম্পদ বেহিসেবিভাবে উড়িয়ে দিতে দেখে থাকি।

বিক্রয়-অযোগ্য সম্পত্তির ওপর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারও একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর ব্যাপার, আর এটা সমস্ত যুগেই দেখা গেছে। অবশ্য এ-রকম উত্তরাধিকারের ফলে একটা প্রভাবশালী শ্রেণি সৃষ্টি হয়, এবং একসময় সেটা হয়তো সমাজের পক্ষে সুবিধাজনকই ছিল। শারীরিক বা মানসিকভাবে দুর্বল হলেও অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ পুত্রই বিবাহ করে, আর দেহে-মনে শ্রেষ্ঠতর হলেও তার পরের ভাইরা অনেক সময়েই বিবাহ করতে পারে না। বিক্রয়-অযোগ্য সম্পত্তিকে অপদার্থ জ্যেষ্ঠ পুত্ররা নানান বদখেয়ালে উড়িয়ে দিতেও পারে না। কিন্তু অন্যান্য সব ব্যাপারের মতো এক্ষেত্রেও সভ্য জীবনের সম্পর্কগুলি এত জটিল যে এই অসুবিধাটা এড়ানোর কিছু উপায়ও তারা হাতে পেয়ে যায়। জ্যেষ্ঠত্বের দাবিতে যারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তারা পুরুষানুক্রমে নিজেদের স্ত্রী হিসেবে সমাজের সুন্দরী নারীদের বেছে নিতে পারে। এইসব নারীরা সাধারণত স্বাস্থ্যবতী ও মানসিকভাবে সক্রিয় হয়ে থাকে। যোগ্যতা বিচার না করে এইভাবে একই বংশধারায় উত্তরাধিকার বর্তাতে থাকে। এর অশুভ ফলাফলকে (যা একান্তই স্বাভাবিক) প্রতিহত করতে পারে এমন কিছু ব্যক্তি যারা সবসময়ই নিজেদের সম্পদ ও প্রতিপত্তি বাড়াতে উৎসুক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনীদের বিবাহ করেই তারা নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধি করে। কিন্তু, মিঃ গ্যাল্টন দেখিয়েছেন, যে-সব মেয়ে তাদের পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, তারা সাধারণত বন্ধ্যা হয়ে থাকে। ফলে উচ্চবংশীয় পরিবারগুলির সরাসরি বংশধারা ক্রমাগত ছিন্ন হয়, আর তাদের সম্পদ হস্তান্তরিত হয় বংশের অন্য কোনও শাখার লোকজনদের হাতে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, এইভাবে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ার সময় যারা তা পাচ্ছে, তারা কে কতটা যোগ্য, সে ব্যাপারে কোনওরকম বিচার-বিবেচনা করা হয় না।

সভ্যতা এইভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাজকে নানাভাবে বাধা দিলেও, ভাল খাদ্য জুগিয়ে ও বিভিন্ন কষ্টকর কাজ লাঘব করে শরীরের উন্নতি ঘটাতেও সাহায্য করে সে। এ-কথার সমর্থনে আমরা দেখতে পাই, বন্যদের তুলনায় সভ্য মানুষরা শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী হয়। বহু দুঃসাহসিক অভিযানে দেখা গেছে সভ্য মানুষদের সহ্য ক্ষমতা বন্যদের চেয়ে মোটেই কম নয়। এমনকী ধনীদের প্রচুর বিলাস-ব্যসনও খুব-একটা ক্ষতিকর কিছু নয়, কেননা দেখা গেছে আমাদের অভিজাতদের মধ্যেকার সকল বয়সের নারী-পুরুষের আয়ুষ্কাল নিম্নশ্রেণির স্বাস্থ্যবান ইংরেজদের চেয়ে এমন কিছু কম নয়।

এবার মননশীল ক্ষমতার বিষয়টিতে আসা যাক। সমাজের সকল স্তরের সমস্ত সদস্যকে উচ্চ মননশীলতাসম্পন্ন ও নিম্ন মননশীলতাসম্পন্ন—এই দু'ভাগে সমানভাবে

ভাগ করা গেলে নিঃসন্দেহেই দেখা যেত যে প্রথমোক্তরাই সমস্ত কাজে সফল হচ্ছে এবং শেষোক্তদের চেয়ে অনেক বেশি সন্তানসন্ততির জন্ম দিচ্ছে। জীবনের একেবারে সাদামাটা ব্যাপারগুলিতেও দক্ষতা ও সামর্থ্য কিছু সুবিধা দিয়েই থাকে। অবশ্য কোনও কোনও বৃত্তিতে চূড়ান্ত শ্রম-বিভাজনের দরুন এই সুবিধা খুবই অল্প হয়ে থাকে। তাই সমস্ত সভ্য জাতির উচ্চ মননশীলতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সংখ্যা ও গুণগত মান বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু তাই বলে আমি এ-কথা বলতে চাইছি না যে এই প্রবণতার বিপরীত চিত্রটা একেবারেই অনুপস্থিত। যেমন, বেপরোয়া ও অদূরদর্শী ব্যক্তিদেরও অনেক সন্তানসন্ততি জন্মায়। তা সত্ত্বেও, দক্ষতার কিছু বিশেষ সুবিধা থাকেই।

উপরোক্ত ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে প্রায়শই বলা হয়—পৃথিবীর বিশিষ্টতম ব্যক্তিরা তাঁদের সুমহান মননশীলতার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কোনও সন্তান রেখে যাননি। মিঃ গ্যাল্টন বলেছেন, 'বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন নারী-পুরুষরা সন্তানের জন্মদানে অক্ষন হন কি না, বা তাঁদের মধ্যে কতজন এ-রকম অক্ষম হন—সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তবে, আমি দেখিয়েছি যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সন্তানের জন্মদানে মোটেই অক্ষম হন না।' মহান আইনপ্রণেতারা, মঙ্গলময় ধর্ম-প্রবর্তকরা, মহান দার্শনিকরা এবং বিজ্ঞান জগতের আবিষ্কারকরা তাঁদের কাজের সাহায্যেই মানবসমাজের প্রগতিতে অনেক বড় অবদান রেখে যান। প্রচুর সন্তানসন্ততি রেখে যেতে পারলেন কি না, সেটা তাঁদের ক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। কোনও প্রজাতির শারীরিক কাঠামোর অগ্রগতি ঘটে কিছুটা-উন্নত কাঠামোবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নির্বাচন আর কিছুটা-কমজোরি কাঠামোবিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাতিল হয়ে যাওয়ার সাহায্যে, সুস্পষ্ট ও বিরল ব্যতিক্রমগুলিকে রক্ষা করার সাহায্যে নয়। মননগত ক্ষমতার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য, কেননা সমাজের সকল স্তরেই কিছুটা-বেশি সক্ষম ব্যক্তিরা কিছুটা-কম সক্ষম ব্যক্তিদের থেকে অধিক সাফল্য পেয়ে থেকে, এবং ফলস্বরূপ, অন্য কোনওভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হলে তাদের বংশবিস্তারও দ্রুততর হয়। কোনও দেশে মননশীলতার মান ও মননশীল ব্যক্তিদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হয়ে উঠলে, গড়পড়তা হিসেব থেকে বিচ্যুতির নিয়ম অনুসারে (মিঃ গ্যাল্টন যেমন দেখিয়েছেন) সে দেশে আগের থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে।

নৈতিক বোধের ব্যাপারে বলা যায়, এমনকী সবথেকে সুসভ্য দেশগুলিতেও মানুষের চরিত্রের খারাপ উপাদানগুলি বিলুপ্ত করার একটা প্রক্রিয়া সারাক্ষণই চলে। কুখ্যাত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় বা দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখা হয়, ফলে তারা নিজেদের খারাপ দিকগুলিকে অন্যদের মধ্যে অবাধে ছড়িয়ে দিতে পারে না। বিষাদ-রোগাক্রান্ত ও উন্মাদ ব্যক্তিদের উন্মাদ-আশ্রমে অন্তরীণ রাখা হয়, কিংবা তারা আত্মহত্যা করে। হিংসাপ্রবণ ও কলহপরায়ণ ব্যক্তিরা প্রায়শই এক ভয়ঙ্কর পরিণতির শিকার হয়। যে-সব অস্থিরচিত্ত মানুষ কোনও নির্দিষ্ট বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে রাজি

নয়, বর্বর অবস্থার সেইসব স্মারকরা সভ্যতার পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক রূপে দেখা দেয়। কোনও সদ্য-গড়ে-ওঠা দেশে চলে যায় তারা এবং সেখানে খুবই কার্যকরী পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে থাকে। অসংযম ব্যাপারটা মানুষকে দারুণভাবে ক্ষইয়ে দেয়। এটা এতদূর ক্ষতিকর যে ত্রিশ বছর বয়সের সময় অসংযমী ব্যক্তিদের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল থাকে মাত্র ১৩.৮ বছর, আর ওই একই বয়সকালে ইংল্যান্ডের গ্রামীণ শ্রমজীবীদের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল থাকে আরও ৪০.৫৯ বছর। অসচ্চরিত্র নারীরা খুব বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারে না, আর অসচ্চরিত্র পুরুষরা প্রায়শই বিবাহ করে না। এই ধরনের নারী-পুরুষ উভয়েই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। গৃহপালিত পশুদের বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে, স্পষ্টতই নিকৃষ্টতর পশুগুলির বাতিল হয়ে যাওয়াটা তাদের অগ্রগতির পথে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে-সব ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য পূর্বানুবৃত্তির সাহায্যে বারবার ফিরে আসে, সেগুলির ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে সত্য, যেমন ভেড়াদের গায়ের কালো রঙ। অনেকসময় মানুষের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু খারাপ স্বভাব কোনওরকম নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই কোনও কোনও পরিবারের মধ্যে দেখা দেয়, আর তা এক বন্য দশার পূর্বানুবৃত্তির দ্যোতকও হয়ে উঠতে পারে—বন্যদশা থেকে আমরা তো এখনও খুব বেশি এগিয়ে আসিনি! এই ভাবনাটাই ফুটে ওঠে চালু প্রবচনের মধ্যে। চালু প্রবচনে বলা হয়—এ-সব লোক হচ্ছে পরিবারের কালো ভেড়া (অর্থাৎ কলঙ্ক)। সুসভ্য জাতিগুলির ক্ষেত্রে নৈতিকতার উচ্চ মান আর বেশি সংখ্যক যথেষ্ট ভাল মানুষ থাকার ব্যাপারে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তেমন কোনও ভূমিকা নেই। অবশ্য একেবারে বুনিয়াদি সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি মানুষ প্রথম অর্জন করেছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যেই। কিন্তু কোন্ কোন্ কারণ আমাদের নৈতিক বোধকে উন্নত করে তোলে, সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করে এসেছি নিম্নতর জাতিগুলির কথা বলবার সময়। যে কারণগুলির কথা আমি উল্লেখ করেছি সেগুলি হল—অন্যান্য মানুষদের অনুমোদন, দৃষ্টান্ত ও অনুসরণ, চিন্তাশক্তি, অভিজ্ঞতা, এমনকী আত্মস্বার্থ, অল্প বয়সে প্রাপ্ত বিভিন্ন নির্দেশ ও ধর্মীয় অনুভূতি।

সুসভ্য দেশগুলিতে সব দিক থেকে উন্নতশ্রেণির মানুষদের সংখ্যা বেড়ে চলার পথে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাধার কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন মিঃ গ্রেগ এবং মিঃ গ্যাল্টন। বাধাটা হল এই যে, অতি দরিদ্র ও বেপরোয়া লোকেরা, যারা প্রায়শই নানান কদভ্যাসে লিপ্ত থাকে, তারা প্রায় সবসময়েই অল্প বয়সে বিবাহ করে, অন্যদিকে সাবধানী ও মিতব্যয়ী লোকেরা, যারা সাধারণত নীতিপরায়ণ হয়, তারা বিবাহ করে একটু বেশি বয়সে যাতে করে নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের ভরণপোষণ ভালভাবে চালানো যায়। ডঃ ডান্‌কান দেখিয়েছেন, যারা অল্পবয়সে বিবাহ করে, তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুধু যে বেশি সংখ্যক প্রজন্ম বা পুরুষ (পুত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি) সৃষ্টি করে তা-ই নয়, তারা অনেক বেশি সন্তানেরও জন্ম দেয়। তাছাড়াও, মায়েদের পরিপূর্ণ যৌবনকালের সন্তানদের থেকে অল্প বয়সের সন্তানরা বেশি হৃষ্টপুষ্ট ও আয়তনে বড় হয়, ফলে সম্ভবত তাদের জীবনীশক্তিও বেশি হয়।

তাই সমাজের বেপরোয়া, মর্যাদাহীন ও অনেক সময় অসৎ ব্যক্তিরা বিচক্ষণ ও সুনীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করে। মিঃ গ্রেগ ব্যাপারটাকে এইভাবে বলেছেন : 'অসতর্ক, দারিদ্র্যপীড়িত, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন আইরিশরা খরগোশের মতো বংশবৃদ্ধি করে চলে, আর মিতব্যয়ী, দূরদর্শী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্কটরা, যারা নৈতিকতায় অবিচল, উচ্চস্তরের চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসী, বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমত্তার সুশৃঙ্খল, তারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটায় সংগ্রাম করে, কৌমার্য বজায় রেখে, বিবাহ করে দেরিতে, এবং খুব বেশি সংখ্যক সন্তানসন্ততির জন্ম দেয় না। কোনও-একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে যদি এক হাজার স্যাক্সন আর এক হাজার কেল্ট থাকে, তাহলে দেখা যাবে দশ-বারো প্রজন্মের মধ্যেই ওই এলাকার মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ হয়ে গেছে কেল্টরা, কিন্তু যাবতীয় সম্পত্তি, ক্ষমতা ও মননশক্তির ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ চলে গেছে ওই এক-ষষ্ঠাংশ স্যাক্সনদের হাতে। চিরন্তন সেই 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে' নিকৃষ্টতর ও কম সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা জাতিরাই টিকে থেকেছে। তবে এই টিকে থাকাটা তাদের গুণাবলির ফল নয়, বরং তাদের দোষত্রুটিগুলিই টিকিয়ে রেখেছে তাদেরকে।'

তবে এই নিম্নমুখী প্রবণতার কিছু প্রতিরোধক ব্যবস্থাও আছে। আমরা দেখেছি অসংযমীদের মৃত্যুর হার বেশি হয় আর অসচ্চরিত্র ব্যক্তিরা খুব বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। দরিদ্রতম শ্রেণির লোকেরা শহরে এসে জড়ো হয়, এবং স্কটল্যান্ডের দশ বছরের পরিসংখ্যান থেকে ডঃ স্টার্ক প্রমাণ দেখিয়েছেন—যে-কোনও বয়সেই গ্রামের থেকে শহরের মৃত্যুর হার অনেক বেশি, 'এবং জীবনের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত্যুর হার গ্রামের তুলনায় শহরে প্রায় দ্বিগুণ।' ধনী ও দরিদ্র উভয়ের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য। ফলে, নিজেদের লোকসংখ্যার হার বজায় রাখার জন্য শহরের অতি-দরিদ্র বাসিন্দাদের গ্রামের অতি-দরিদ্র বাসিন্দাদের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি সন্তানের জন্ম দিতে হবে। মেয়েদের খুব কম বয়সে বিবাহ হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর ব্যাপার। ফ্রান্সে দেখা গেছে, 'এক বছরে যতজন অবিবাহিতা নারী মারা গেছে, তার থেকে দ্বিগুণ সংখ্যক বিবাহিতা রমণীর মৃত্যু হয়েছে।' কুড়ি বছরের কম বয়সী বিবাহিত পুরুষদের মৃত্যুর হারও 'অত্যন্ত বেশি'।[২] তবে এর কারণ ঠিক কী, তা বলা মুশকিল। শেষত, যে-সব পুরুষ স্বচ্ছন্দে নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করার অবস্থায় না-আসা পর্যন্ত সুচিন্তিতভাবেই বিবাহ করে না, তারা যদি পূর্ণ যৌবনবতী মেয়েদের বিবাহ করত (যা তারা প্রায়শ করেও থাকে), তাহলে উন্নততর শ্রেণির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যদের চেয়ে খুব-একটা কম হত না।

২। হ্যাকেল্-ও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। দ্রষ্টব্য, ভারচৌ-এর 'Sammlung. gemein. wissen. vortage'. ১৮৬৮, পৃঃ ৬১-তে 'ueber die Entstehung des Menschenges chlechts'। এছাড়াও দ্রষ্টব্য তাঁর 'Naturliche Schopfungs geschichte' ১৮৬৮, যেখানে তিনি মানুষের বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৮৫৩ সালে সংগৃহীত প্রাচুর পরিমাণ তথ্য থেকে দেখা যায়, সারা ফ্রান্সে কুড়ি থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত লোকদের মৃত্যুর হার বিবাহিত লোকদের মৃত্যুর হারের চেয়ে অনেক বেশি। যেমন, কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর বয়সী প্রতি ১০০০ জন অবিবাহিতের মধ্যে এক বছরে মারা গিয়েছিল ১১.৩ জন, আর ওই বয়সী বিবাহিতদের মধ্যে মারা গিয়েছিল মাত্র ৬.৫ জন।[৩] ১৮৬৩ এবং ১৮৬৪ সালে স্কটল্যান্ডের কুড়ি বছরের বেশি বয়সী সমস্ত লোকেদের মধ্যেও এই একই নিয়ম চোখে পড়েছিল। যেমন, কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর বয়সী প্রতি ১০০০ জন অবিবাহিতের মধ্যে এক বছরে মারা গিয়েছিল ১৪.৯৭ জন, আর ওই বয়সী বিবাহিতদের মধ্যে মারা গিয়েছিল মাত্র ৭.২৪ জন, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম।[৪] ডঃ স্টার্ক এ-ব্যাপারে বলেছেন, 'কোনও অস্বাস্থ্যকর কাজে নিযুক্ত থাকা, অথবা নিকাশী-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যেখানে কোনওদিন কোনওরকম চেষ্টা করা হয়নি এমন কোনও অস্বাস্থ্যকর বাড়ি বা অঞ্চলে বসবাস করার চেয়েও অবিবাহিত থাকা জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর।' তাঁর মতে, মৃত্যুর হার কমে যাওয়াটা হচ্ছে 'বিবাহ এবং তার ফলস্বরূপ গড়ে ওঠা বিভিন্ন নিয়মিত অভ্যাসেরই' প্রত্যক্ষ ফলাফল। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে অসংযমী, অসচ্চরিত্র ও অপরাধী শ্রেণির লোকেদের আয়ুষ্কাল কম হয় এবং তারা সাধারণত বিবাহ করে না। এইসঙ্গেই আমরা মেনে নিতে পারি যে, ক্ষীণজীবী, অসুস্থ কিংবা দেহ বা মনের কোনও দারুণ দুর্বলতায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই বিবাহে গররাজি হয় অথবা প্রত্যাখ্যাত হয়। ডঃ স্টার্ক সম্ভবত এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন যে, বিবাহ হচ্ছে দীর্ঘ জীবনলাভের একটি সাধারণ প্রধান কারণ, কারণ তিনি দেখেছিলেন অবিবাহিতদের চেয়ে বিবাহিতরা বেশিদিন বাঁচে। কিন্তু আমরা সকলেই এমন অনেক মানুষের কথা জানি, যারা তাদের দুর্বল স্বাস্থ্যের দরুন যৌবনকালে বিবাহ না করেও দীর্ঘকাল বেঁচে থেকেছে। অবশ্য সারা জীবন তারা হয়তো দুর্বলই থেকেছে, ফলে বেঁচে থাকার বা বিবাহ করার সম্ভাবনাও তাদের সবসময় কমই থেকেছে। আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও আপাতভাবে ডঃ স্টার্কের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। ঘটনাটি হল—ফ্রান্সে বিবাহিতদের চেয়ে বিধবা ও বিপত্নীকদের মৃত্যুর হার অনেক বেশি। কিন্তু ডঃ ফার-এর মতে এই ঘটনার কারণটা এ-রকম : স্বামী বা স্ত্রী-র মৃত্যুতে পরিবারে ভাঙন ধরে, দেখা দেয় দারিদ্র্য, নানান কু-অভ্যাস, ঘনিয়ে আসে বিষাদ, ফলে বিধবা নারী বা বিপত্নীক পুরুষটির মৃত্যুও এগিয়ে আসে কয়েক কদম। মোটের ওপর ডাঃ ফার-এর সঙ্গে একমত হয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিতদের মৃত্যুর হার কম হওয়া, যাকে এক সাধারণ নিয়ম বলেই মনে হয়, 'তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে

৩। ডঃ ফার, পূর্বোল্লিখিত রচনা। উদ্ধৃত কথাগুলি ওই চমৎকার রচনাটি থেকেই নেওয়া হয়েছে।

৪। এখানে আমি 'দ্য টেন্থ অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ বার্থস, ডেথস এট্‌সেট্‌রা ইন স্কটল্যান্ড' রচনায় প্রদত্ত পঞ্চবার্ষিক গড় হিসাব থেকেই এই হিসাবটি গ্রহণ করেছি।

ত্রুটিপূর্ণ মানুষরা পৃথিবী থেকে প্রতিনিয়তই বাতিল হয়ে যায়, আর প্রতিটি প্রজন্মের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিরাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে সবথেকে ভালভাবে টিকে থাকে।' এই নির্বাচন শুধু বিবাহিত জীবনের সঙ্গেই সম্পর্কিত, এবং তা সমস্তরকম দৈহিক, মননগত ও নৈতিক গুণাবলিকেও প্রভাবিত করে।[৫] কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি—যে-সব সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান মানুষ তাদের দূরদর্শিতার কারণে বেশ কিছুদিন অবিবাহিত থাকে, তাদের মৃত্যুর হার মোটেই খুব বেশি নয়।

শেষ দুটি অনুচ্ছেদে যে-সব প্রতিবন্ধকের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলি এবং সম্ভবত আরও কিছু আজও-অজানা প্রতিবন্ধক যদি সমাজের উৎকৃষ্টতর মানুষদের তুলনায় বেপরোয়া, দুশ্চরিত্র ও নিকৃষ্টতর ব্যক্তিদের দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধিকে প্রতিহত না করত, তাহলে যে-কোনও জাতির অধঃপতন ঘটত—পৃথিবীর ইতিহাসে যা প্রায়শই ঘটেছে। মনে রাখা দরকার, প্রগতি কোনও অপরিবর্তনীয় নিয়ম নয়। কোনও-একটি সভ্য জাতি কেন অপর একটি জাতির তুলনায় বেশি উন্নত হয়, বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে বা অনেক বড় অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, কিংবা কোনও-একটা সময়ে কীভাবেই বা তারা অন্য একটি জাতির থেকে অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে ওঠে, তা বলা খুবই কঠিন। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, এই গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করে তাদের প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর, উঁচু মানের মননগত ও নৈতিক গুণসমৃদ্ধ মানুষদের সংখ্যার ওপর, এবং তাদের উৎকর্ষতার ওপর। শারীরিক শক্তি মানুষের মানসিক শক্তির ওপর যেটুকু প্রভাব ফেলে, সেটুকু ছাড়া শারীরিক কাঠামোর আর কোনও ভূমিকা এক্ষেত্রে থাকে না।

বেশ কিছু লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, যদি সত্যিই কোনও ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে প্রাচীনকালের গ্রিকদের পক্ষে আরও উন্নত হওয়া, সংখ্যায় আরও বেড়ে ওঠা এবং গোটা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ পৃথিবীর যে-কোনও জাতির তুলনায় মনশীলতার দিক থেকে গ্রিকরা ছিল অনেক উন্নত। দৈহিক গঠনের ব্যাপারে একটা কথা প্রায়শই শোনা যায়—মন আর শরীরের মধ্যে নাকি অবিরাম বিকশিত হয়ে চলার একটা প্রবণতা থাকে। পূর্বোক্ত লেখকদের বক্তব্যে এই অনুমানেরই অব্যক্ত ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু যে-কোনও ধরনের বিকাশই আনুষঙ্গিক বিভিন্ন অনুকূল অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক নির্বাচন কেবলমাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য করে তাতে। কোনও কোনও ব্যক্তি বা জাতি কিছু কিছু বিরাট সুবিধা অর্জন করা সত্ত্বেও অন্যান্য গুণ অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার দরুন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। গ্রিকদের পিছিয়ে পড়ার অনেক কারণই থাকতে পারে, যেমন বহু ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের অভাব, গোটা দেশটার আয়তন খুব ছোট হওয়া, দাসপ্রথার

৫। এ ব্যাপারে ডঃ ডানকান বলেছেন (দ্রষ্টব্য, 'ফেকানডিটি, ফার্টিলিটি' ইত্যাদি, পৃঃ ৩৩৪), 'সমস্ত যুগেই স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর মানুষরা বিবাহিতদের দলে নাম লেখায়, আর দুর্বল ও দুর্ভাগারা পড়ে থাকে অবিবাহিতদের সারিতে।'

কুফল, কিংবা অত্যধিক যৌনলালসা। কেননা, 'একেবারে শক্তিহীন ও মজ্জায় মজ্জায় কলুষিত' না-হওয়া পর্যন্ত তাদের পতন ঘটেনি। আজকের ইউরোপের পশ্চিমী জাতিগুলি, যারা তাদের বন্য পূর্বপুরুষদের থেকে বহুগুণ উন্নত হয়ে সভ্যতার শিখরে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা তাদের এই উৎকৃষ্টতার জন্য প্রাচীন গ্রিকদের উত্তরাধিকারের কাছে আদৌ ঋণী নয় (বা সে-ঋণের পরিমাণ নিতান্তই সামান্য)। অবশ্য গ্রিকদের লিখিত সাহিত্যের কাছে তাদের ঋণ অপরিসীম।

যে স্পেনীয় জাতি একদা অত শক্তিশালী ছিল, তারা কেন সময়ের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ল—তা কি জোর দিয়ে কেউ বলতে পারেন? অন্ধকার যুগের বুক চিরে ইউরোপীয় জাতিগুলির অভ্যুদয়ও এক জটিল সমস্যা। মিঃ গ্যাল্টন বলেছেন, সেই যুগে যে-সব শান্ত-ভদ্র মানুষ গভীরভাবে চিন্তাভাবনা বা মানসিক চর্চা করত, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই চার্চের শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকত না, আর প্রত্যেক চার্চই তার শরণাগতদের কাছে চিরকৌমার্য দাবি করত।[৬] প্রতিটি পরম্পরাগত প্রজন্মের ওপর এ-ঘটনা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। ওই সময়ের 'পবিত্র ইন্‌কুইজিশন' (ধর্মীয় বিচার) সবথেকে স্বাধীনচেতা ও সাহসী মানুষদের খুঁজে বার করে তাদের পুড়িয়ে মারত বা কারারুদ্ধ করত। শুধুমাত্র স্পেনেই তিনশো বছরের মধ্যে প্রতি বছর হাজার জন করে শ্রেষ্ঠ মানুষকে এভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে আমি বোঝাতে চাইছি তাদেরকে যারা বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করত, প্রশ্ন তুলত, এবং সন্দেহই মানুষকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়। এইভাবে ক্যাথলিক চার্চ সভ্যতার অপরিমেয় ক্ষতি করেছিল, যদিও সে-ক্ষতি নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও উপায়ে অনেকটাই পূরণও হয়ে গিয়েছিল। সে ক্ষতি সত্ত্বেও কিন্তু ইউরোপ এক তুলনাহীন প্রগতির পথ বেয়ে অগ্রসর হতে পেরেছে।

ইউরোপের অন্যান্য জাতিগুলির তুলনায় উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে ইংরেজদের বিপুল সাফল্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের 'নির্ভীক ও অবিচল কর্মশক্তি'-কে। ইরেজদের, কানাডিয়ানদের এবং ফরাসিদের অগ্রগতির তুলনা করলেই এ-কথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কীভাবে ইংরেজরা তাদের এই কর্মশক্তি অর্জন করেছিল, তা কি কেউ বলতে পারেন? বরং এ-কথাটার আপাত-সত্যতা অনেক বেশি যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং সেখানকার লোকেদের চরিত্রগত উৎকর্ষতা হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল। কেননা ইউরোপের সমস্ত দেশ থেকে বিগত দশ-বারো প্রজন্মের উদ্দীপনাময়, কর্মচঞ্চল ও সাহসী

৬। 'হেরিডিটারি জিনিয়াস', পৃঃ ৩৫৭-৩৫৯। বিপরীত যুক্তি দিয়েছেন রেভারেন্ড এফ. ডব্লিউ. ফারার (দ্রষ্টব্য, 'ফ্রেজার'স্ ম্যাগ', ১৮৭০, পৃঃ ২৫৭)। স্যার সি. লায়েল একটি চিত্তাকর্ষক রচনায় (দ্রষ্টব্য, 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অফ জিওলজি', খণ্ড ২, পৃঃ ৪৮১) 'পবিত্র ইন্‌কুইজিশন' এর কুফলের দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণ করে বলেছেন যে, ওই ঘটনা প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথ বেয়ে ইউরোপে বুদ্ধিমত্তার সাধারণ মানকে অনেক নিচু করে দিয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

লোকেরা আমেরিকায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে ও নানান কাজে দারুণ সফল হয়েছে। সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপারে রেভারেন্ড মিঃ জিঙ্কের কথাটা মোটেই কোনও অতিশয়োক্তি নয়। তিনি বলেছিলেন : 'পশ্চিমের দিকে প্রচুর পরিমাণ অ্যাংলো-স্যাক্সনের দেশান্তরী হওয়ার সঙ্গে...সম্পর্কিত করে অথবা তার সহায়ক হিসেবে অন্য সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করলে—যেমন গ্রিসে চিন্তাভাবনার চর্চার বা রোমে যা ঘটেছিল—সেগুলিকে শুধুমাত্র কিছু উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের সমষ্টি বলেই মনে হয়।' সভ্যতা কীভাবে অগ্রসর হয়েছে, তা আমাদের কাছে আজও অস্পষ্ট। কিন্তু এটুকু অন্তত বোঝা যায়, বেশ দীর্ঘ একটা সময়ের মধ্যে যে-জাতি সবথেকে বেশি সংখ্যক উন্নত মননসম্পন্ন, কর্মচঞ্চল, সাহসী, দেশপ্রেমিক ও পরোপকারী মানুষের জন্ম দিতে পেরেছে, তারা স্বাভাবিকভাবেই এ-সব ব্যাপারে তাদের থেকে নিকৃষ্ট জাতিগুলির তুলনায় প্রবল হয়ে উঠেছে।

টিকে-থাকার জন্য যে-সংগ্রাম, তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। আবার, এই টিকে-থাকার সংগ্রাম সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলার ফল হিসেবেই। মানুষের সংখ্যা যে-হারে বেড়ে চলে, তা অনেক দুঃখজনক পরিণতি ডেকে আনে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য বর্বর গোষ্ঠীগুলি তাদের সদ্যোজাত শিশুদের হত্যা ও আরও কিছু ক্ষতিকর কাজ করে থাকে, আধা-সুসভ্য জাতিগুলির মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেখা দেয় চরম দারিদ্র্য, আজীবন কৌমার্য, এবং সংযমী লোকেদের বিলম্বে বিবাহ। কিন্তু নিম্নতর শ্রেণির প্রাণীদের মতো একই শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি মানুষের মধ্যেও কাজ করে, তাই টিকে-থাকার সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত ক্ষয়ক্ষতি তাকেও আক্রমণ করবে না—এমন আশা সে করতে পারে না। প্রাচীন যুগে মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন যদি না করত, তাহলে সে কখনওই আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারত না। পৃথিবীর অনেক জায়গায় এমন প্রচুর উর্বর জমি আছে যা স্বচ্ছন্দে বহু পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু এ-রকম অনেক জায়গাতেই কিছু ভ্রাম্যমাণ বন্য জাতি ছাড়া আর কেউ বসবাস করে না। এ থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, টিকে-থাকার সংগ্রাম মানুষকে তার সর্বোচ্চ মানে উঠে আসতে বাধ্য করার মতো তীব্র কখনওই ছিল না। মানুষ এবং নিম্নতর শ্রেণির প্রাণীদের সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি, তা থেকে বলা যায়—প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সুদৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদের মননগত ও নৈতিক ক্ষমতায় সর্বদাই নানান পরিবর্তন ঘটে চলত। এ-রকম অগ্রগতির জন্য যে বেশ কিছু অনুকূল আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি দরকার হয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে না চললে এবং তার ফলস্বরূপ টিকে-থাকার সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র হয়ে না উঠলে, সবথেকে অনুকূল পরিস্থিতিও অগ্রগতির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে কি না— সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। ধরা যাক, দক্ষিণ আমেরিকার কোনও কোনও জায়গায় বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে যাদের সুসভ্য বলা যায় (যেমন স্পেনীয় ঔপনিবেশিকরা), তাদের সম্বন্ধে আমরা যা

জানি তা থেকে এমনকী এ-ও মনে হতে পারে যে, জীবনযাপনের অবস্থা খুব সহজ হয়ে গেলে তারা পরিশ্রমবিমুখ হয়ে যায় আর পিছিয়ে পড়ে। অত্যন্ত সুসভ্য জাতিগুলির অবিরাম অগ্রগতি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ওপর খুব-একটা নির্ভর করে না, কারণ বন্য গোষ্ঠীগুলির মতো এইসব জাতিরা একে অপরকে উচ্ছেদ ও ধ্বংস করে না। তা সত্ত্বেও কোনও জাতির অধিকতর বুদ্ধিমান সদস্যরা তুলনায় নিকৃষ্টদের চেয়ে জীবনে বেশি সফল হয়, অনেক বেশি সংখ্যক সন্তানসন্ততি রেখে যায় আর এটা আসলে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই একটা রূপ। প্রগতির সবথেকে কার্যকরী কারণগুলি হল অল্প বয়স থেকে (যখন মানুষের মস্তিষ্কে যে-কোনও জিনিস সবথেকে বেশি ছাপ ফেলে) শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আর উচ্চমানের চিন্তাভাবনা। এই শিক্ষার উদ্‌গাতা হন সমাজের সবথেকে সক্ষম ও শ্রেষ্ঠ মানুষেরা, তা মূর্ত হয়ে ওঠে জাতির আইন, প্রথা ও ঐতিহ্যের মধ্যে, এবং জনমত তাকে বাস্তবে রূপ দেয়। তবে, মনে রাখা দরকার, এই জনমতের ব্যাপারটা নির্ভর করে অন্যদের অনুমোদন ও অননুমোদনকে আমরা কতখানি উপলব্ধি করতে পারি, তার ওপরেই। এই উপলব্ধি আবার গড়ে ওঠে আমাদের সহানুভূতিবোধের ওপর ভিত্তি করে, আর আমাদের এই সহানুভূতিবোধ যে আদতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই সামাজিক প্রবৃত্তির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গড়ে উঠেছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সমস্ত সুসভ্য জাতিই যে একসময় বর্বর অবস্থায় ছিল, তার প্রমাণ প্রসঙ্গে

এই বিষয়টি নিয়ে স্যর জে. লুবক, মিঃ টাইলর, মিঃ ম্যাক্‌লেনান ও অন্যান্যরা যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গ এবং চমৎকার আলোচনা করছেন। তাই এখানে আমি শুধু তাঁদের গবেষণার একটা ছোট্ট সারসংক্ষেপ করার চেষ্টা করছি। সাম্প্রতিককালে ডিউক অফ আর্জিল এবং এর আগে আর্কবিশপ হোয়েট্‌লি বলেছেন—মানুষ সুসভ্য হয়েই পৃথিবীতে এসেছে, আর আজ যারা বন্য অবস্থায় রয়েছে তারা আসলে নানান অধঃপতনের ফলেই ওই দশায় গিয়ে পৌঁছেছে। এই অনুমানের বিপরীত কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁদের তুলনায় এঁদের যুক্তিকে বেশ দুর্বল বলেই মনে হয়েছে আমার। এটা সত্যি যে অনেক জাতি তাদের সভ্য অবস্থা বজায় রাখতে পারেনি, এমনকী কোনও কোনও সভ্য জাতিও হয়তো চূড়ান্ত বর্বরতার অন্ধকারেও তলিয়ে গিয়ে থাকতে পারে, যদিও এই শেষোক্ত ঘটনাটির কোনও প্রমাণ আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। কিছু বিজয়ী গোষ্ঠীর চাপে পড়েই সম্ভবত ফুজিয়ানরা এক কঠিন ও দুর্গম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তারা যে ব্রাজিলের সবথেকে সমৃদ্ধ অঞ্চলে বসবাসকারী বোটো-কিউডোদের চেয়েও নীচে নেমে গিয়েছিল, তা প্রমাণ করা মোটেই সহজ নয়।

সমস্ত সুসভ্য জাতি যে বর্বরদের উত্তরপুরুষ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দু'ভাবে। একদিকে, সভ্য জাতিগুলির মধ্যে আজও চালু থাকা বিভিন্ন প্রথা, বিশ্বাস, ভাষা

ইত্যাদির মধ্যে এমন অনেক চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়, যেগুলি সাক্ষ্য দেয় কোনও-এক সময় তারা নিম্ন অবস্থাতেই ছিল। অন্যদিকে, বন্যরা যে নিজেদেরকে সভ্যতার পথে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং নিয়ে গেছেও, তার নানান প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। প্রথমোক্ত বিষয়টির প্রমাণগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, তবে সে-সবের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের গণনা-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যায়। কোনও কোনও জায়গায় আজও ব্যবহার করা হয় এমন কিছু শব্দের উল্লেখ করে মিঃ টাইলর স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, এই পদ্ধতিটা প্রথমে শুরু হয়েছিল আঙুল গোনা দিয়ে। প্রথমে গোনা হত এক হাতের আঙুল, তারপর অপর হাতের, আর সবশেষে পায়ের আঙুল। আমাদের দশমিক পদ্ধতির মধ্যে এবং রোমানদের সংখ্যা লেখার পদ্ধতিতে আজও এর ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। রোমান সংখ্যামালার V (অর্থাৎ ৫) চিহ্নটিকে মানুষের হাতের একটা সংক্ষিপ্ত বা সাঙ্কেতিক চিত্র বলেই মনে করা হয়। এই V-এর পরে আসে VI (অর্থাৎ ৬) ইত্যাদি, যেখানে নিঃসন্দেহেই একটা হাতের পর অপর হাতটাকে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। আবার, 'তিন-কুড়ি দশ বলার সময় আমরা ভাইজেসিম্যাল (vigesimal) পদ্ধতিই অনুসরণ করি, যেখানে এক-কুড়ি বলতে ২০ বোঝানো হয়। কোনও মেক্সিকান বা ক্যারিবিয়ান হলে এটাকে "একজন মানুষ" বলেই উল্লেখ করতে।'[৭] বেশ কিছু ভাষাতত্ত্ববিদ বলেছেন, প্রতিটা ভাষার মধ্যেই তার ধীর ও ক্রমান্বয় বিবর্তনের নিদর্শন থেকে যায়। লিখনশৈলীর ব্যাপারেও এই একই কথা প্রযোজ্য, কেননা একসময় ছবির সাহায্যে যে-কোনও জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করত মানুষ, আর তারই পরিণতিতে সৃষ্টি হয়েছে এক-একটা অক্ষর। মিঃ ম্যাক্‌লেনানের রচনা[৮] পড়ার পর আর কোনওমতেই অস্বীকার করা যায় না যে গায়ের জোরে স্ত্রী-সংগ্রহ করার মতো নানান আদিম অভ্যাসের ছাপ আজও প্রায় প্রতিটি সভ্য জাতির মধ্যে রয়ে গেছে। ম্যাক্‌লেনান প্রশ্ন তুলেছেন—প্রাচীনকালে এমন কোনও জাতি ছিল কি, যাদের মধ্যে আদতে একবিবাহ প্রথা চালু ছিল? যুদ্ধের নিয়ম ও অন্যান্য প্রথা, যার নিদর্শন আজও চোখে পড়ে, তা থেকে বোঝা যায় ন্যায় সংক্রান্ত আদিম ধারণাও অত্যন্ত অমার্জিত ধরনের ছিল। আজকের দিনের অনেক কুসংস্কার আসলে অতীতের ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাসেরই অবশেষ মাত্র। ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন এবং ন্যায়পরাণতাকে ভালবাসেন—এই চমৎকার ভাবনাটা, ধর্মের এই সর্বোচ্চ রূপটা, আদিম যুগে চালু ছিল না।

৭। 'রয়্যাল ইনস্টিটিউশন অফ গ্রেট ব্রিটেন', ১৫ মার্চ, ১৮৬৭। এছাড়াও দ্রষ্টব্য, 'রিসার্চেস ইনটু দ্য আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যান্‌কাইন্ড', ১৮৬৫।

৮। 'প্রিমিটিভ ম্যারেজ'। দ্রষ্টব্য, 'হোমারের রচনায় এবং ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রাপ্ত নরবলি সংক্রান্ত সাক্ষ্য' প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যাফহউসেন-এর মন্তব্য ('অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল রিভিউ', অক্টোবর ১৮৬৯, পৃঃ ৩৭৩)।

এবার অন্য ধরনের প্রমাণের দিকে তাকানো যাক। স্যার জে. লুবক দেখিয়েছেন, কোনও কোনও বন্য গোষ্ঠীর কিছু কিছু সাদামাটা কলাকৌশল সাম্প্রতিককালে খানিকটা উন্নত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বন্যদের মধ্যে চালু থাকা হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলের যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা থেকে নিঃসন্দেহেই বলা যায়, সম্ভবত একমাত্র আগুন জ্বালানোর কৌশলটা বাদে এ-রকম আর সব জিনিস প্রতিটা বন্য গোষ্ঠী আলাদা আলাদা ভাবেই আবিষ্কার করেছিল। এ-রকম স্বাধীন আবিষ্কারের একটা চমৎকার নমুনা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ব্যুমেরাং। বাইরের লোকেরা যখন প্রথম তাহিতিতে যায়, তখন অন্যান্য পলিনেশীয় দ্বীপের অধিবাসীদের চেয়ে তাহিতির লোকেরা বহু ব্যাপারেই অনেক এগিয়ে ছিল। পেরু বা মেক্সিকোর অ-সভ্য অধিবাসীদের উন্নত কৃষ্টি বিদেশ থেকে আমদানি করা, এমনটা মনে করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। ওইসব জায়গায় অনেক দেশজ গাছপালার চাষ করা হত এবং কয়েক ধরনের স্থানীয় জীবজন্তুকে পোষ মানাতেও শিখেছিল তারা। অধিকাংশ ধর্ম-প্রচারকের অত্যল্প প্রভাবের ব্যাপারটা বিবেচনা করে আমাদের মনে রাখা দরকার, কোনও অর্ধ-সভ্য দেশের একদল ভ্রাম্যমাণ লোক আমেরিকার উপকূলে গিয়ে পৌঁছলেও সেখানকার বাসিন্দাদের ওপর তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে না। একমাত্র তখনই এ-রকম প্রভাব ফেলা সম্ভব, যদি তারা আগে থাকতেই কিছুটা উন্নত অবস্থায় থেকে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসের সেই সুপ্রাচীন পথরেখায় চোখ রাখলে দুটি যুগের ছবি দেখি আমরা : প্রত্নপ্রস্তর যুগ আর নব্যপ্রস্তর যুগ (স্যার জে. লুবকের পরিভাষা অনুযায়ী)। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে যন্ত্রপাতিকে ঘষে ঘষে মসৃণ করার কৌশলটা কোনও জাতি অপর কোনও জাতির কাছ থেকে শিখেছিল, এ-রকম দাবি নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। ইউরোপের সর্বত্র, সেই সুদূর পূর্বে গ্রিস পর্যন্ত, ওদিকে প্যালেস্তাইন, ভারতবর্ষ, জাপান, নিউজিল্যান্ড, ইজিপ্ট-সহ সারা আফ্রিকা—সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণ পাথুরে যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ওইসব জায়গার আজকের দিনের বাসিন্দারা আর ও-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না। চীনারা এবং প্রাচীনকালের ইহুদিরাও যে একসময় ও-সব জিনিস ব্যবহার করত, তারও পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, ওইসব দেশের অধিবাসীরা, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র দুনিয়াই, একসময় বর্বর অবস্থায় ছিল। একেবারে প্রথম থেকেই মানুষ সুসভ্য ছিল আর তারপর এতসব জায়গায় তার চূড়ান্ত অধঃপতন ঘটেছিল—এ ধরনের মনোভাব মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক মাত্র। বরং এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই অনেক বেশি সত্য, অনেক বেশি উৎসাহব্যঞ্জক যে মানব-ইতিহাসে প্রগতিই হচ্ছে সার্বজনীন চিত্র, অধোগতি নয়। খুবই হীন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে, কঠিন পথে পা ফেলে ফেলে, মানুষ আজ উঠে এসেছে জ্ঞান, নীতিবোধ, ধর্মের সর্বোচ্চ শিখরে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মানুষের সাদৃশ্য এবং বংশবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে

জীবজগতের ধারাবাহিকতায় মানুষের স্থান—বংশবৃত্তান্তের প্রাকৃতিক নিয়ম—কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির অভিযোজনমূলক চরিত্র—মানুষ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যেকার বিভিন্ন ছোটখাটো সাদৃশ্য—প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় মানুষের স্থান—মানুষের উদ্ভবের স্থান ও মানুষের প্রাচীনত্ব—জীবাশ্মগত সংযোগসূত্রের অনুপস্থিতি—মানুষের বংশবৃত্তান্তের নিম্নতর স্তর, যা জানা যায় প্রথমত অন্যদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থেকে এবং দ্বিতীয়ত তার দৈহিক গঠন থেকে—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আদি উভলিঙ্গ অবস্থা—উপসংহার।

কিছু কিছু প্রাণিবিজ্ঞানী বলেন, মানুষ আর তার সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণীদের শারীরিক কাঠামোর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। এই কথাটা যদি আমরা মেনেও নিই, আর সেইসঙ্গেই যদি মেনে নিই যে মানুষ এবং ওইসব প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে, তাহলেও, পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলির আলোচনার ভিত্তিতে অনায়াসেই বলা যায়—কোনও নিম্নতর জৈবিক রূপ থেকেই মানুষ উদ্ভূত হয়েছে, যদিও তার সংযোগসূত্রগুলি আজও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই থেকে গেছে।

মানুষের মধ্যে নানা ধরনের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যে-সব সাধারণ কারণের দরুন এইসব পরিবর্তন ঘটে থাকে, যে-সব সাধারণ নিয়মের দ্বারা এগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তার নিয়ম-পদ্ধতি মানুষ ও নিম্নতর শ্রেণির প্রাণীদের ক্ষেত্রে একই। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে উঠেছে বলে তাদের জীবনে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম এবং ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক নির্বাচন খুব কঠোর চেহারা নিয়েছে। মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বহু জাতি। এ-রকম কিছু কিছু জাতির পরস্পরের মধ্যেকার পার্থক্য এত বিপুল যে প্রাণিবিজ্ঞানীরা অনেক সময় এদেরকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসেবেও চিহ্নিত করে থাকেন। মানুষের শারীরিক গঠন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতোই সমতাবিশিষ্ট। তার ভ্রূণগত বিকাশও একইরকম দশার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। তার শরীরের মধ্যে এমন অনেক লুপ্তপ্রায় ও অপ্রয়োজনীয় অংশ আছে, যেগুলি একসময় নিশ্চয়ই কার্যকরী ছিল। মানুষের মধ্যে অনেক সময় এমন-কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, যে-সব বৈশিষ্ট্য তার আদি পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল বলে মেনে নেওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। মানুষের উদ্ভবের ইতিহাস অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর উদ্ভবের ইতিহাসের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হলে এইসব ঘটনাকে নিছক কাকতালীয় ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু মানুষের উদ্ভবের ইতিহাসকে অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর

উদ্ভবের ইতিহাসের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে আদৌ মেনে নেওয়া যায় না। অন্যদিকে, অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো মানুষও যদি কোনও অজানা ও নিম্নতর জৈবিক রূপ থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে, তাহলে এইসব ঘটনাকে অনেকটাই উপলব্ধি করা যায়।

মানুষের মানসিক ও আত্মিক শক্তির কথা বিবেচনা করে কোনও কোনও প্রাণি-বিজ্ঞানী সমগ্র সজীব জগৎকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন : মানবজগৎ, জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ। অর্থাৎ, মানুষকে তাঁরা একটা স্বতন্ত্র জায়গা দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রাণীর আত্মিক শক্তির মধ্যে তুলনা করা বা সেগুলিকে শ্রেণিবিন্যস্ত করাটা প্রাণিবিজ্ঞানীদের কাজ নয়। বরং তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করতে পারেন (আমি যেমন করেছি) যে, মানুষ ও নিম্নতর শ্রেণির প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে বিপুল মাত্রাগত পার্থক্য থাকলেও আদতে সেই ক্ষমতার ধরনটা একই। মাত্রাগত পার্থক্য যত বেশিই হোক না কেন, তা মানুষকে একটা স্বতন্ত্র বর্গ হিসেবে চিহ্নিত করাটাকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে পারে না। এই ব্যাপারটাকে সবথেকে ভালভাবে বোঝা যায় দুটি পোকার, যেমন জার-পোকা (Scale-insect homopterous tanily coecus) এবং একটি পিঁপড়ের, মানসিক ক্ষমতার মধ্যে তুলনা করলে। এদের মানসিক ক্ষমতা নিঃসন্দেহে একই জাতের। মানুষ আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে যতটা পার্থক্য থাকে, তার থেকে অনেক বেশি পার্থক্য চোখে পড়ে ওইসব জাব-পোকা আর পিঁপড়েদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে—অবশ্য এই পার্থক্যটা কিছুটা অন্য ধরনের। স্ত্রী-জাবপোকা তরুণাবস্থায় নিজের হুল বা শুঁড়ের সাহায্যে কোনও উদ্ভিদের গায়ে আঁকড়ে ধরে এবং রস শোষণ করে, একদম নড়াচড়া না করে গর্ভবতী হয়ে ডিম পাড়ে। ব্যাস, এই হচ্ছে তাদের সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত। অন্যদিকে, পিয়ের হুবার দেখিয়েছেন, শ্রমিক-পিঁপড়েদের অভ্যাস ও মানসিক ক্ষমতা বর্ণনা করার জন্য একটা বিরাট বই লেখা দরকার, তবে আমি শুধু কয়েকটি বিষয়কে সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। খুব জোর দিয়েই বলা চলে যে পিঁপড়েরা নিজেদের মধ্যে খবরাখবর আদান-প্রদান করে এবং কোনও-একটা কাজ করার জন্য কিংবা খেলা করার জন্য অনেক পিঁপড়ে একজোট হয়। বেশ কয়েক মাস পরে দেখা হলেও তারা তাদের পরিচিত পিঁপড়েদের ঠিকই চিনতে পারে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিও বোধ করে। তারা বড় বড় বাসস্থান বানায়, সেগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, সন্ধ্যাবেলা দরজা বন্ধ করে দেয় এবং প্রহরী মোতায়েন করে। তারা রাস্তা তৈরি করে, নদীর নীচে সুড়ঙ্গ কাটে, এমনকী পরস্পরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নদীর ওপর অস্থায়ী সাঁকোও তৈরি করে। নিজেদের দলের জন্য তারা খাদ্য সংগ্রহ করে। বাসার দরজার থেকে অনেক বড় কোনও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসা হলে তার দরজাটা তখনকার মতো বড় করে নেয়, পরে তা মেরামত করে নেয়। নানা ধরনের শস্যের বীজ সংগ্রহ করে পিঁপড়েরা, তা থেকে অঙ্কুর বেরোতে দেয় না, আর ওইসব বীজ স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেলে মাটির ওপরে তুলে এনে শুকোতে দেয়। কয়েক

জাতের পোকাকে (Aphides & other insects) পিঁপড়েরা ঘরে রাখে, দুধেল-গাই হিসেবে ব্যবহার করে তাদের। সুশৃঙ্খলভাবে দল বেঁধে তারা যুদ্ধ করতে যায়, সকলকার মঙ্গলের জন্য অক্লেশে উৎসর্গ করে নিজেদের জীবন। আগে থেকে পরিকল্পনা করে তারা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় চলে যায়। যুদ্ধের সময় বিপক্ষের পিঁপড়েদের বন্দী করে রাখে দাস হিসেবে। নিজেদের পোষা-পোকাদের ডিমগুলিকে এবং নিজেদের ডিম ও লার্ভাগুলিকে বাসার গরম দিকটায় সরিয়ে দেয়, যাতে করে সেগুলি তাড়াতাড়ি ফুটে যেতে পারে। এ-রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত সাজিয়ে দেওয়া যায়। মোদ্দা কথাটা হল, পিঁপড়ে আর জাব-পোকাদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে, কিন্তু তাই বলে কেউ কখনও এইসব পোকাদের পৃথক পৃথক শ্রেণি বা ভাগ হিসেবে চিহ্নিত করার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। এই পার্থক্যটা পূরণ করে দেয় অন্যান্য পোকারা। মানুষ আর উন্নততর বানরদের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা। কিন্তু এ-কথা বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে মানুষ আর উন্নততর বানরদের মাঝামাঝি অবস্থার বেশ কিছু জৈবিক রূপ নিশ্চিহ্ন হয় গেছে বলেই এই ধারবাহিক শৃঙ্খলার ছেদগুলি দেখা দিয়েছে।

অধ্যাপক ওয়েন মূলত মস্তিষ্কের কাঠামোর ভিত্তিতে সমগ্র স্তন্যপায়ী প্রাণীবর্গকে চারটি উপ-শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে একটি উপ-শ্রেণিতে তিনি স্থান দিয়েছেন মানুষকে, আর-একটিতে রেখেছেন থলি-বাহিত ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণী এবং অণ্ডজ লিপ্তপদ স্তন্যপায়ীদের, এবং মানুষকে তিনি অন্য সমস্ত স্তন্যপায়ীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রের জীব হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে শেষ ভাগ দুটি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। স্বাধীনভাবে বিচার করতে সক্ষম কোনও প্রাণিবিজ্ঞানী এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিয়েছেন বলে আমার জানা নেই, তাই এ প্রসঙ্গে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না।

প্রাণীদের কোনও-একটি বৈশিষ্ট্য বা কোনও অঙ্গ (এমনকী মস্তিষ্কের মতো অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেও) কিংবা মানসিক ক্ষমতার বিপুল উন্নতির ভিত্তিতে তাদের শ্রেণিবিভাগ করা হলেও তা প্রায় কখনওই নিশ্চিতভাবে সন্তোষজনক হয়ে ওঠে না। মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়ে জাতীয় পতঙ্গদের ক্ষেত্রে এইভাবে শ্রেণিবিভাগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের অভ্যাস বা সহজাত প্রবৃত্তির ভিত্তিতে করা এ-ধরনের বিভাজন একান্তই কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাণীদের আকার, গায়ের রং কিংবা তাদের স্বভাব প্রভৃতির মতো যে-কোনও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চয়ই করা যায়, কিন্তু প্রাণিবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই অনুভব করে আসছেন যে এই বিন্যাসের একটা কিছু প্রাকৃতিক প্রণালী আছেই। আজ প্রায় প্রত্যেকেই মেনে নিয়েছেন যে এই প্রণালী অনুযায়ী বিন্যাসটা যতদূর সম্ভব বংশবৃত্তান্ত মাফিক করা দরকার। অর্থাৎ, একই জৈবিক গঠন থেকে উদ্ভূত যাবতীয় প্রাণীদের একই ভাগের মধ্যে রাখতে হবে, অন্য কোনও জৈবিক গঠন থেকে উদ্ভূত প্রাণীদের সঙ্গে তাদের মিশিয়ে ফেলা চলবে না। কিন্তু এইসব প্রাণীদের সেই আদি গঠনগুলি যদি

পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বংশধরদের মধ্যেও একটা সম্পর্ক থাকবে এবং দুটি ভাগ মিলে একটা বৃহত্তর দল গড়ে উঠবে। বিভিন্ন দলের মধ্যেকার পার্থক্যের মাত্রাকে, অর্থাৎ প্রতিটি দলের মধ্যে যে-পরিবর্তন ঘটেছে তার মাত্রাকে প্রকাশ করা হয় বর্গ, কুল, বিন্যাস ও শ্রেণি প্রভৃতি অভিধার সাহায্যে। আমাদের হাতে বংশধারার কোনও নির্দিষ্ট বিবরণ নেই। কাজেই প্রাণীদের বংশতালিকা আবিষ্কার করার একমাত্র উপায় হল—যে-সব প্রাণীকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হবে, তাদের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য আছে তা লক্ষ করা। এ-কাজ করার জন্য কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অসংখ্য বিষয়ের সাদৃশ্যকে লক্ষ করা এবং দুটি ভাষার বহু শব্দ ও বাক্যগঠনের মধ্যে যদি প্রচুর সাদৃশ্য থাকে, তাহলে সকলেই স্বীকার করবেন যে ওই ভাষা দুটির উদ্ভব ঘটেছে একই ভাষা থেকে—এমনকী ওই দুটি ভাষার কিছু শব্দ ও বাক্যগঠন প্রণালীর মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকলেও। কিন্তু সজীব প্রাণীদের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের ব্যাপারটাকে একই ধরনের জীবনযাপন পদ্ধতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে খুঁজলে চলবে না। যেমন, জলে বসবাস করার দরুন দুটি প্রাণীর সমগ্র দেহ-কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক প্রণালীতে তাদের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য না-ও থাকতে পারে। এ-থেকে বোঝা যায় কেন নানান গুরুত্বহীন অঙ্গ, অকেজো ও লুপ্তপ্রায় অঙ্গ, বা বর্তমানে নিষ্ক্রিয় কিংবা একেবারেই ভ্রূণাকারে থাকা অঙ্গগুলির সাদৃশ্যই শ্রেণিবিন্যাসের ব্যাপারে সবথেকে দরকারি। কেননা এইসব অঙ্গ মোটেই পরবর্তীকালের অভিযোজনের ফলে গড়ে ওঠে না, আর তাই এগুলি থেকে বংশধারার বা প্রকৃত সাদৃশ্যের প্রাচীন রূপরেখাটিকে চিনে নেওয়া যায়।

তাছাড়া কোনও-একটি বৈশিষ্ট্যের প্রচুর পরিবর্তনের ভিত্তিতে দুটি প্রাণীকে সম্পূর্ণ পৃথক বর্গের প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী বিচার করলে বোঝা যায়, কোনও প্রাণীর যে-অঙ্গটি একই ধরনের অন্যান্য প্রাণীদের ওই অঙ্গের থেকে অনেকাংশে পৃথক, সেই অঙ্গটির প্রচুর পরিবর্তন ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ঘটে গেছে। ফলস্বরূপ ওই অঙ্গটির একই ধরনের আরও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য (যতদিন ওই প্রাণীটি একই ধরনের অবস্থায় থাকবে, ততদিনই ঘটে চলবে এই পরিবর্তন)। এইসব পরিবর্তন প্রাণীটির পক্ষে সহায়ক হলে সেগুলি টিকে থাকবে এবং ক্রমাগত উন্নত হয়ে উঠবে। অনেক সময় কোনও অঙ্গ ক্রমাগত উন্নত হয়ে চললে—যেমন পাখিদের ঠোঁট কিংবা কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণীর দাঁত—তা তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে অথবা অন্য কোনও কাজে সাহায্য করে না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক ও মানসিক ক্ষমতার ক্রমাগত উন্নতির কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, অর্থাৎ সেগুলির উন্নতির জন্য মানুষের কোনও অসুবিধা হয় না। তাই প্রাকৃতিক বা বংশবৃত্তান্তগত ব্যবস্থায় মানুষের স্থান নির্ধারণ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে—তার মস্তিষ্কের বিপুল উন্নতি যেন অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বা একেবারেই গুরুত্বহীন বিষয়গুলির অজস্র সাদৃশ্যকে চাপা দিয়ে না দেয়।

অধিকাংশ প্রাণিবিজ্ঞানী, যাঁরা মানসিক ক্ষমতা-সহ মানুষের সমগ্র কাঠামোর কথা বিবেচনা করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে ব্লুমেন্‌বাখ ও কুভিয়েরের পথই অনুসরণ করেছেন এবং মানুষকে একটা আলাদা শ্রেণি হিসেবে দেখিয়েছেন, যে-শ্রেণিটিকে তাঁরা নাম দিয়েছেন দ্বিপদী (Bimana)। আর এইভাবে তাঁরা চতুষ্পদী, মাংসাশী প্রভৃতি শ্রেণিগুলির সমান অবস্থানেই স্থান দিয়েছেন মানুষকে। বিচক্ষণতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ লিনিয়াস সর্বপ্রথম যে-মতটি উপস্থাপিত করেছিলেন, সেই মতটিকে সাম্প্রতিককালের বহু শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন এবং মানুষকে বসিয়েছেন চতুষ্পদ প্রাণীদের সঙ্গে একই সারিতে। এই সারিটিকে তাঁরা উন্নত ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণিবর্গ (Primates) নামে চিহ্নিত করেছেন। এই সিদ্ধান্তটিকে ন্যায্য বলে মেনে নেওয়া যায়। কেননা, প্রথমত, মনে রাখা দরকার শ্রেণিবিন্যাসের ব্যাপারে মানুষের মস্তিষ্কের বিপুল উন্নতিটা খুব-একটা তাৎপর্যপূর্ণ কিছু নয়, এবং মানুষ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের করোটির সুস্পষ্ট পার্থক্যটা (যে বিষয়টার ওপর বিশপ, এবি ও অন্যান্যরা সাম্প্রতিককালে গুরুত্ব দিয়েছেন) তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত মস্তিষ্কের দরুনই উদ্ভূত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মনে রাখা দরকার যে মানুষ আর চতুষ্পদীদের মধ্যেকার অন্য প্রায় যাবতীয় ও আরও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি স্পষ্টতই অভিযোজনশীল, এবং সেগুলি মূলত মানুষের ঋজু কাঠামোর সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। যেমন তার হাত পা আর শ্রেণির গঠন, তার মেরুদণ্ডের বক্রতা এবং তার মাথার অবস্থান। শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে অভিযোজনশীল বিষয়গুলির গুরুত্ব যে যথেষ্ট কম, তা ভালভাবে বোঝা যায় সীলমাছের দিকে তাকালে। এই প্রাণীটির শারীরিক গঠন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঠামো অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের থেকে যথেষ্ট আলাদা, উন্নততর জাতের বানর এবং মানুষের মধ্যেও এতটা পার্থক্য দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও, কুভিয়ের থেকে শুরু করে অতি সম্প্রতিকালে মিঃ ফাওয়ার পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকেই সীলমাছেদের মাংসাশী শ্রেণির প্রাণীদের একটি বর্গ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। শ্রেণিবিন্যাসের কাজটা মানুষই করে থাকে, তা নাহলে নিজেকে একটা আলাদা শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই।

উন্নত শ্রেণির অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দৈহিক কাঠামোর সঙ্গে মানুষের যে কত অসংখ্য মিল আছে, তা উল্লেখ করার মতো সাধ্য বা জ্ঞান আমার নেই। প্রখ্যাত শারীরসংস্থানবিদ ও দার্শনিক অধ্যাপক হাক্সলি এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন—নিম্নতর জাতের বানরদের সঙ্গে উচ্চতর জাতের বানরদের দৈহিক গঠনের যতটা পার্থক্য থাকে, উচ্চতর জাতের বানরদের সঙ্গে মানুষের দৈহিক গঠনের কোনও অংশেরই ততটা পার্থক্য থাকে না। ফলস্বরূপ, 'মানুষকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই।'

এই গ্রন্থের প্রথমদিকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমি দেখিয়েছি উন্নততর জাতের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের দৈহিক গঠন যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তার মূল কারণ হল ছোটখাটো অজস্র কাঠামোগত ও জৈবিক গঠনের সাদৃশ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে

আমি তুলে ধরেছিলাম একই ব্যাধিতে এবং একই ধরনের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কথা। তাছাড়াও দেখিয়েছিলাম যে একই ধরনের মাদক বা ওষুধ প্রয়োগ করলে উন্নততর জাতের স্তন্যপায়ী জীব ও মানুষের মধ্যে একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ইত্যাদি।

মানুষ ও চতুষ্পদী প্রাণীদের মধ্যেকার ছোটখাটো সাদৃশ্য নিয়ে যেহেতু প্রায় কোনও প্রণালীবদ্ধ আলোচনা হয়নি, এবং যেহেতু এই ধরনের অজস্র সাদৃশ্য চতুষ্পদীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের স্পষ্ট প্রমাণ হাজির করে, তাই এখানে আমি এ-রকম অল্প কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। যেমন ধরা যাক মুখাবয়বের কথা। স্পষ্টতই এক্ষেত্রে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে এবং মাংসপেশী ও ত্বকের প্রায় একইরকম স্পন্দনে নানান আবেগচিহ্ন প্রকাশ পায়, বিশেষ করে ভ্রূ-র উপরে ও মুখের চারপাশে। কয়েকটি ভঙ্গি তো হুবহু একরকম। কিছু কিছু বানর কাঁদার সময় এবং কয়েক ধরনের বানর আনন্দে চেঁচামেচি করার সময় দেখা যায় তাদের ঠোঁটের দু'কোণ পিছনের দিকে সরে গেছে আর চোখের নীচের পাতা কুঁচকে গেছে। বহিঃকর্ণের গঠনের মধ্যেও আশ্চর্যরকম মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য অধিকাংশ বানরের তুলনায় মানুষের নাক অনেক খাড়া প্রকৃতির। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে হুলুক গিবন জাতীয় বানরদের নাক ঈগলপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো। আর সেম্‌নোপিথেকাস ন্যাসিকা নামক বানরদের নাক অসম্ভবরকম বাঁকা।

অনেক বানরেরই মুখমণ্ডলে গোঁফ, দাড়ি বা জুলপি দেখা যায়। সেম্‌নোপিথেকাস প্রজাতির কিছু বানরের মাথায় বেশ বড় বড় চুল থাকে। বনেট জাতীয় বানরদের (Macacusradiatus) মাথার চাঁদির একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে চারপাশে চুল ছড়িয়ে পড়ে এবং মাঝখানের সিঁথির দুপাশে ঝুলতে থাকে। মানুষের কপাল দেখেই নাকি তাকে সম্ভ্রান্ত আর বুদ্ধিমান বলে চেনা যায়, কিন্তু বনেট জাতীয় বানররাই বা কম কীসে! তাদের মাথার উপরিভাগের ঘন চুল একসময় যেন আকস্মিকভাবে নীচের দিকে নেমে আসে এবং ক্রমশ ছোট হতে হতে এমন সুন্দরভাবে মিলে যায় যে একমাত্র ভ্রূ ছাড়া ভ্রূ-র উপরিস্থ অংশে (কপালে) কোনও রোম থাকে না। আবার অনেক সময়েই বলা হয় যে কোনও বানরেরই ভ্রূ থাকে না—এ-কথা সবসময় সত্যি নয়। এইমাত্র এখানে যে প্রজাতির বানরদের কথা বললাম (বনেট জাতীয় বানর), তাদের কপালের রোমশূন্যতা সকলের ক্ষেত্রে একরকম নয়। এশ্‌রিশ্‌ট বলেছেন, মানব-শিশুদের চুলে-ভরা মাথা আর রোমশূন্য কপালের মধ্যে অনেক সময়েই কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না। এটাকে আমরা পুনরাবর্তনের একটি মামুলি ঘটনা বলেই চিহ্নিত করতে পারি, কেননা মানুষের পূর্বপুরুষের কপাল কখনওই সম্পূর্ণ রোমশূন্য ছিল না।

সকলেরই জানা আছে যে আমাদের হাতের উপরাংশের ও নিম্নাংশের রোম ক্রমশ কনুই-অভিমুখী। অদ্ভুত এই বিন্যাস অধিকাংশ নিম্নশ্রেণির স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা না গেলেও গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং, হাইলোবেত্‌স জাতীয় কোনও

কোনও বানর, এমনকী কয়েক প্রকার আমেরিকান বানরের মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু হাইলোবেত্‌স এজিলিস্‌দের সম্মুখ-বাহুর (কনুই ও কব্জির মধ্যবর্তী অংশ) রোম সাধারণত নিম্নাভিমুখী বা কব্জি-অভিমুখী হয় আর হাইলোবেত্‌স লার্‌-দের হাতের রোম প্রায় খাড়া অবস্থায় থাকে এবং শুধু সামনের দিকে সামান্য বেঁকে থাকে। অর্থাৎ এই শেষোক্ত প্রজাতির ক্ষেত্রে রোমরাজি একটা রূপান্তরকালীন অবস্থায় রয়েছে। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পিঠের লোম ঘন ও নিম্নাভিমুখী হওয়ার কারণ যে শরীর থেকে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলা, সে-ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই। এমনকী কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোনোর সময় কুকুরদের সামনের দুই পায়ের রোম তির্যকভাবে থাকার কারণও একই বলে মনে হয়। মিঃ ওয়ালেস অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ওরাং-ওটাংদের আচরণবিধি লক্ষ করার পর মন্তব্য করেছেন, এদের হাতের রোম কনুই-অভিমুখী হওয়ার কারণ সম্ভবত বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া, কারণ বর্ষাকালে এইসব প্রাণীদের মাথার ওপর কোনও গাছের ডাল মুঠো করে ধরে, কানের দুপাশে কনুই ভেঙে বসে থাকতে দেখা যায়। লিভিংস্টোনের মতে, গরিলারাও 'মুষলধারে বৃষ্টির সময় হাত দিয়ে মাথা আড়াল করে বসে থাকে।' উপরের এই কথাগুলি যদি ঠিক হয়, এবং যা হওয়াই সম্ভব, তাহলে আমাদের হাতের উপস্থিত রোমের অভিমুখকে আমাদের পূর্ব অবস্থার স্মারক বলে মেনে নেওয়া যায়। কারণ এখন তো আর বৃষ্টির জল আটকাতে হাতের রোম আমাদের কাজে লাগে না বা আমাদের শরীরের বর্তমান ঋজু কাঠামোয় রোমের এই অভিমুখ বৃষ্টির জল আটকানোর পক্ষে উপযুক্তও নয়।

তবে মানুষ বা তার আদি পূর্বপুরুষদের শরীরের রোমের অভিমুখ সম্বন্ধে অভিযোজন বা উপযোগবাদের নীতিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়াটা খুব সঙ্গত নয়। কারণ এশ্‌রিশ্‌ট মনুষ্য-ভ্রূণের শরীরে রোমবিন্যাসের যে-চিত্র উপস্থিত করেছেন (পূর্ণবয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রেও এই বিন্যাস একইরকম), তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়, এবং এ-ব্যাপারে অন্যান্য অনেক জটিলতর কারণও যে বাদ সাধে, তাঁর এই কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই। ভ্রূণের শরীরে রোমগুলির একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হওয়াটা সম্ভবত ভ্রূণের সেইসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যেগুলি তার বিকাশের সময় সবথেকে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর রোমবিন্যাসের সঙ্গে মেডুলারি ধমনীর কার্যধারারও কিছু সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়।

আমরা দেখলাম যে রোমশূন্য কপাল, মাথায় দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ইত্যাদি অনেক বিষয়েই মানুষের সঙ্গে কয়েক প্রকার বানরের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এরকম প্রত্যেকটি সাদৃশ্যকে একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত অব্যাহত বংশগতির বা উত্তরকালীন প্রত্যাবর্তনের ফল হিসেবে ভাবলে ভুল হবে। এইসমস্ত সাদৃশ্যের অনেকগুলিই খুব সম্ভবত একইরকম রূপান্তরের ফল, এবং অন্যত্র আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে এই রূপান্তর একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্ট প্রাণীদের একইরকম শারীরিক গঠন ও কার্যকারণ থেকে সৃষ্টি হয়। মানুষ ও কিছু জাতের বানরদের সম্মুখ-বাহুতে রোমের একরকম

অভিমুখ খুব সম্ভবত উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অধিকাংশ অ্যান্থ্রোপমরফাস জাতের বানরদের মধ্যে এটি একটি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু অত্যন্ত স্বতন্ত্র জাতের কিছু আমেরিকান বানর কীভাবে এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হল, তা ঠিক বোধগম্য নয়।

আমরা এতক্ষণ যা দেখলাম তা থেকে বলা যায় যে মানুষ তার নিজের জন্য ভিন্ন কোনও শ্রেণি দাবি করতে পারে না। বড়জোর তাকে একটি উপ-শ্রেণি বা বর্গ বলা যায়। অধ্যাপক হাক্সলি তাঁর শেষ বইটিতে সমস্ত উন্নতশ্রেণির স্তন্যপায়ী প্রাণীকে তিনটি উপ-শ্রেণিতে ভাগ করেছেন : মানুষ—অ্যান্থ্রপিডে (Anthropidae) উপ-শ্রেণি, সমস্ত ধরনের বানর—সিমিয়্যাডে উপ-শ্রেণি, এবং নানারকম লেমুর—লেমুরাইডে উপ-শ্রেণি। তাছাড়া অঙ্গসংস্থানের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মানুষের গঠন অত্যন্ত স্বতন্ত্র বলে সে অতি অবশ্যই ভিন্ন একটি উপ-শ্রেণির পদাধিকার দাবি করতে পারে। কিন্তু তার মানসিক ক্ষমতার কথা বিচার করলে বোঝা যায় এই পদাধিকার অত্যন্ত নিম্নমানের। তা সত্ত্বেও বংশবৃত্তান্তের বিচারে এই পদাধিকার বেশ উঁচু, আর তাই মানুষকে একটা বর্গ বা উপ-বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যদি আমরা একই মূল বংশ থেকে উদ্ভূত তিনটি বংশধারার কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাব তাদের মধ্যে দুটি বংশধারা অনেক বছর পরেও এত স্বল্প পরিবর্তিত হয়েছে যে মূল প্রজাতির সঙ্গে তাদের খুব-একটা তফাত নেই। কিন্তু তৃতীয় বংশধারাটিতে এত বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে যে অনায়াসেই তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র উপ-বর্গ, বর্গ, এমনকী স্বতন্ত্র একটি শ্রেণিও বলা যায়। তবে এই তৃতীয় ধারাটির মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে এমন বহু ছোটখাটো বিষয় থাকে, যেগুলি অন্য দু'টি ধারার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। ফলে এখানে আমরা একটি অমীমাংসিত প্রশ্নের সম্মুখীন হই—শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পার্থক্যের ওপর কতখানি গুরুত্ব দেব আমরা? অর্থাৎ, কতটা গুরুত্ব দেব ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের পরিমাণের ওপর এবং কতটাই বা গুরুত্ব দেব অসংখ্য গুরুত্বহীন বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের ওপর, যেগুলি বংশধারা বা বংশবৃত্তান্তের ইঙ্গিত দেয়। সংখ্যায় অল্প অথচ জোরদার পার্থক্যগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়াটাই বেশি নজর কাড়ে আর নিঃসন্দেহে তাতে ঝুঁকিও কম, কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্যিকারের প্রাকৃতিক শ্রেণিবিভাজন করতে হলে অসংখ্য ছোটখাটো সাদৃশ্যের ওপর জোর দেওয়াটাই বেশি দরকারি।

এ-বিষয়ে মানুষ সম্পর্কে কোনও রায় দেওয়ার আগে আমরা বরং একবার বানরদের উপ-শ্রেণি সিমিয়্যাডেদের দিকে চোখ ফেরাই। প্রায় সমস্ত প্রাণিতত্ত্ববিদই এই উপ-শ্রেণিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগে আছে ক্যাটারহাইন বা পূর্ব-গোলার্ধের বানররা। এই জাতীয় বানরদের বৈশিষ্ট্য হল (নাম থেকেই বোঝা যায়) অদ্ভুত গঠন-আকৃতি বিশিষ্ট নাসারন্ধ্র এবং প্রতি চোয়ালে চারটি করে প্রিমোলার বা উপ-পেষক দাঁত। অন্য ভাগে আছে প্ল্যাটিরহাইন বা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বানররা (দুটি সুনির্দিষ্ট উপ-বিভাগ সমেত)। এই জাতীয় বানরদের নাসারন্ধ্র পূর্ব

গোলার্ধের বানরদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত এবং এদের উভয় চোয়ালে চারটির জায়গায় ছ'টি করে প্রিমোলার বা উপ-পেষক দাঁত থাকে। এছাড়া দু'টি ভাগের মধ্যে আরও কিছু ছোটখাটো পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। মানুষের দাঁত এবং নাসারন্ধ্রের গঠন-প্রকৃতি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, তারা ক্যাটারহাইন গ্রুপ বা পূর্ব গোলার্ধের বানরদের বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি প্রায় গুরুত্বহীন এবং আপাতভাবে অভিযোজনশীল প্রকৃতির কিছু বিষয়ে প্ল্যাটিরহাইন বিভাগের বানরদের সঙ্গে মানুষের মিল থাকলেও বাকি প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষের সঙ্গে ক্যাটারহাইন গোষ্ঠীর সাদৃশ্য প্ল্যাটিরহাইন গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই প্রাচীনকালে ওই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বানররা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল, আর মানবসদৃশ সেই জীবের মধ্যে ফুটে উঠেছিল পূর্ব গোলার্ধের বানরদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য—এটা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং মানুষ যে পূর্ব গোলার্ধের সিমিয়্যান উপ-শ্রেণির একটি প্রশাখা, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই বংশবৃত্তান্তের প্রশ্নে আমরা তাকে নির্দ্বিধায় ক্যাটারহাইন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।[১]

অধিকাংশ প্রাণিতত্ত্ববিদ গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং, হাইলোবেত্‌স প্রভৃতি অ্যান্‌থ্রোপমরফাস জাতের বানরদের পূর্ব গোলার্ধের অন্যান্য বানরদের থেকে স্বতন্ত্র একটি উপ-গোষ্ঠীতে ভাগ করেন। কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের আকারের কথা বিচার করে, এই উপ-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার করতে গ্র্যাটিওলেট রাজি নন। নিঃসন্দেহে এটি একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। মিঃ সেন্ট. জি. মিভার্ট বলেছেন, ওরাংরা হচ্ছে 'ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি বিচিত্র ও বিচ্যুত গঠনাকৃতি।' আবার কোনও কোনও প্রাণিতত্ত্ববিদ পূর্ব গোলার্ধের অ্যান্‌থ্রোপমরফাস শ্রেণি-বহির্ভূত বানরকুলকে দু-তিনটি ছোট ছোট উপগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন। অদ্ভুত থলি-আকৃতির পাকস্থলীবিশিষ্ট সেম্‌নোপিথেকাস জাতের বানররা এ-রকম একটি উপগোষ্ঠীর অন্তর্গত। কিন্তু এম. গড্রি এথেন্স সম্পর্কে খোঁজখবর করতে গিয়ে একটি আশ্চর্য জিনিসের সন্ধান পান। তিনি জানতে পারেন যে মিওসিন যুগে, অর্থাৎ প্রায় ৭০ লক্ষ বছর আগে, পৃথিবীতে সেম্‌নোপিথেকাস ও ম্যাকাকাস জাতের বানরদের মধ্যে সংযোগকারী অন্য এক জাতের বানরের অস্তিত্ব ছিল। একসময় বোধহয় এভাবেই অন্যান্য উচ্চশ্রেণির প্রাণীরা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে টিকে ছিল পৃথিবীতে।

যদি অ্যান্‌থ্রোপমরফাস জাতের বানরদের একটি সাধারণ উপগোষ্ঠী হিসেবে

১। এইরকম শ্রেণি-বিভাজনের সঙ্গে মিঃ সেন্ট. জর্জ মিভার্ট-এর বক্তব্যের প্রায় হুবহু মিল আছে (দ্রঃ, 'ট্রানস্যাকট. ফিলোসফ. সোস.', ১৮৬৭, পৃঃ ৩০০)। তিনি উন্নত শ্রেণির স্তন্যপায়ী প্রাণীদের থেকে লেমুরজাতীয় প্রাণীদের আলাদা করে বাদবাকিদের হোমিনাইডে ও সিমিয়্যাডে (ক্যাটারহাইন গোষ্ঠীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত) এবং সেবিডে ও হ্যাপালাইডে (প্ল্যাটিরহাইন গোষ্ঠীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত) উপ-পর্বে ভাগ করেন। এখনও পর্যন্ত তিনি তাঁর বক্তব্যে অটল।

মেনে নেওয়া হয়, আর মানুষের সঙ্গে যেহেতু তাদের অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে—শুধু ক্যাটারহাইন গোষ্ঠীর সঙ্গে যে-সব বিষয়ে মিল রয়েছে সেগুলিই নয়, তা ছাড়াও বিচিত্র সব বৈশিষ্ট্য, যেমন লেজের অনুপস্থিতি, ত্বকে কড়া না-পড়া, এবং চেহারাগত সাদৃশ্য—এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে তাহলে নিশ্চয়ই অ্যান্থ্রোপমরফাস উপগোষ্ঠীর কোনও প্রাচীন প্রজাতি থেকেই মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল। নিম্নশ্রেণির আরও যে-সব উপগোষ্ঠী রয়েছে, তাদের কারুর পক্ষেই 'সাদৃশ্যযুক্ত জাতিগত পরিবর্তনের' নিয়ম অনুসারে মানব-সদৃশ কোনও জীবের জন্ম দেওয়া সম্ভব ছিল না, কেননা মানুষের সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদৃশ্য রয়েছে উন্নত শ্রেণির অ্যান্থ্রোপমরফাস বানরদের। আবার, তার নিকট সাদৃশ্যযুক্ত বানরদের (উন্নত শ্রেণির বানরদের) অধিকাংশের তুলনায় মানুষের মধ্যে অনেক বেশি পরিবর্তন ঘটে গেছে, যা মূলত তার মস্তিষ্কের বিপুল উন্নতি ও সোজা হয়ে দাঁড়ানোরই ফল। তা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার মানুষ হচ্ছে 'উন্নত শ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেকার একটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী প্রাণী মাত্র।'

বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী যে-কোনও প্রাণিতত্ত্ববিদই মনে করেন যে সিমিয়্যাডে উপ-শ্রেণির দুই মূল গোষ্ঠী ক্যাটারহাইন ও প্ল্যাটিরহাইন বানররা আর তাদের সমস্ত উপ-গোষ্ঠী, সকলে একই সুপ্রাচীন কোনও আদি পূর্বপুরুষের বংশধর। এই পূর্বপুরুষদের একেবারে প্রথম দিকের বংশধরেরা পরস্পরের থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পৃথক হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ততদিনে কোনও কোনও প্রজাতি বা সদ্যসৃষ্ট বর্গের নানামুখী চরিত্রের মধ্যে ক্যাটারহাইন ও প্ল্যাটিরহাইন গোষ্ঠীদ্বয়ের ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্যগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু অবিভক্ত এই প্রাচীন বানরদের মধ্যে দাঁতের বা নাসারন্ধ্রের গঠনাকৃতি এমন ছিল না ঠিক যে-রকম এখন ক্যাটারহাইন গোষ্ঠী বা প্ল্যাটিরহাইন গোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বরং এ-ব্যাপারে তাদের সঙ্গে লেমুরাইডে উপ-শ্রেণির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, যাদের নিজেদের মধ্যে চোখ-মুখের গঠন-সাদৃশ্য খুবই কম এবং দাঁতের গঠনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে বহুল পরিমাণে।

ক্যাটারহাইন ও প্ল্যাটিরহাইন বানরদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য উভয়েই যে প্রশ্নাতীতভাবে একই শ্রেণিভুক্ত—এটাই প্রকাশ করে। যে-সব বৈশিষ্ট্য এদের উভয়ের মধ্যেই রয়েছে, সেগুলো সংখ্যায় এত বেশি যে পৃথক পৃথক প্রজাতি নিজে থেকে সেটা অর্জন করতে পারে না। অর্থাৎ, এই বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকারসূত্রেই অর্জিত। কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদরা এদেরকে চিহ্নিত করবেন বনমানুষ বা বানর হিসেবে, এক পুরনো প্রজাতির প্রাণী হিসেবে, যাদের অনেক লক্ষণ ঠিক ক্যাটারহাইন ও প্ল্যাটিরহাইন বানরদের মতো, কিছু লক্ষণ অন্তর্বর্তী স্তরের, এবং সম্ভবত কিছু লক্ষণ এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে যে-সব লক্ষণ দেখা যায়, তার থেকে আলাদা। আর যেহেতু বংশ-বৃত্তান্তের বিচারে মানুষ হচ্ছে ক্যাটারহাইন বা পূর্ব গোলার্ধের বানরগোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাই, আমাদের আত্মগরিমা ক্ষুণ্ণ করেও স্বীকার করতে হবে

যে আমাদের আদি পূর্বপুরুষদেরও ওই নামেই চিহ্নিত করা উচিত।[২] কিন্তু তাই বলে মানুষ-সহ সমগ্র সিমিয়্যান গোষ্ঠীর আদি পূর্বপুরুষেরা এখনকার কোনও বনমানুষ বা বানরদের মতোই ছিল কিংবা এইসব বনমানুষ বা বানরদের সঙ্গে তাদের প্রভূত সাদৃশ্য ছিল, এমনটা ভাবলে ভুল হবে।

মানুষের উদ্ভবস্থল এবং মানুষের প্রাচীনত্ব

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ক্যাটারহাইন গোষ্ঠী থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রথম কোন্ অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মানুষের উদ্ভব ঘটে। মানুষ যেহেতু একদা এই গোষ্ঠীর (ক্যাটারহাইন) অন্তর্ভুক্ত ছিল, ফলে তাকে পূর্ব গোলার্ধের বাসিন্দা বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে, ভৌগোলিক বিন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী বিচার করলে বোঝা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় বা মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে তারা বসবাস করত না। দেখা গেছে, পৃথিবীর যে-কোনও বৃহৎ অঞ্চলেই বর্তমানে টিকে থাকা স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ওই অঞ্চলের অধুনালুপ্ত কোনও-না-কোনও প্রজাতির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। তাই মনে হয় গরিলা ও শিম্পাঞ্জির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত লুপ্তপ্রায় বানররা প্রথমে আফ্রিকাতেই বসবাস করত। আর যেহেতু এই দুই বানর প্রজাতিই হচ্ছে সাদৃশ্যের দিক দিয়ে মানুষের সবথেকে কাছাকাছি, তাই আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে আফ্রিকা মহাদেশের বাসিন্দা হওয়ার সম্ভাবনা অন্য যে-কোনও অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা অর্থহীন। কারণ মিওসিন যুগে (প্রায় সত্তর লক্ষ বছর আগে) দু-তিন ধরনের অ্যান্থ্রোপমরফাস বানর, দৈর্ঘ্যে প্রায় মানুষের সমতুল ও গঠন-প্রকৃতিতে হাইলোবেত্স বানরদের খুব কাছাকাছি এক প্রকার ড্রায়োপিথেকাস বানর (Dryopithecus of Lartet) ইউরোপে বাস করত বলে জানা গেছে। তাছাড়া সেই সুপ্রাচীনকালের পর থেকে পৃথিবীতে ঘটে গেছে অজস্র বড় বড় পরিবর্তন এবং এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক জায়গার বাসিন্দারাই দলে দলে অন্য জায়গায় চলে গেছে।

কিন্তু, যেখানে এবং যে-সময়েই মানুষের শরীর থেকে বড় বড় রোমরাজি নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করুক না কেন, এ-কথা নিশ্চিত যে সেই সময় তারা কোনও উষ্ণ জলবায়ুর দেশে বসবাস করত। কেননা কাঁচা ফলমূল, মাংস ইত্যাদি খেয়ে হজম করার পক্ষে ওইরকম জলবায়ুই ছিল আদর্শ। অবশ্য আমাদের জানা নেই ঠিক কতদিন আগে মানুষ ক্যাটারহাইন গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র এক সত্তার দিকে পা বাড়িয়েছিল। তবে খুব সম্ভবত ইওসিন বা প্রাক্-প্রত্নপ্রস্তর যুগের মতো সুদূর

২। হ্যাকেল-ও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। দ্রঃ, 'ueber die Entstehung des Menchengeschlechts', in Virchow's, 'Samulung. gemen. wissen, Vorlage', ১৮৬৮, পৃঃ ৬১। এছাড়াও দ্রষ্টব্য তাঁর অপর একটি রচনা 'Naturliche schopfungs geschichte', ১৮৬৮। এখানে তিনি মানুষের বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অতীতেই এ-ব্যাপারটি ঘটেছিল। কারণ মিওসিন যুগের প্রথম দিকে ড্রায়োপিথেকাস জাতের বানরদের অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায়, এই সময়েই অনুন্নত শ্রেণির বনমানুষদের থেকে আলাদা হয়ে একদল উন্নত শ্রেণির বনমানুষের উদ্ভব হয়েছিল। আবার এ-ও আমাদের অজানা যে একই ধারার উন্নত বা অনুন্নত শ্রেণির প্রাণীরা অনুকূল পরিস্থিতি পেলে কত দ্রুত উন্নত হতে পারে। তবে, আমরা জানি যে কোনও কোনও প্রাণী দীর্ঘকাল ধরে একইরকম আছে, তেমন-কোনও পরিবর্তন হয়নি তাদের। গৃহপালিত জীবজন্তুদের লক্ষ করে দেখা গেছে, নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন বংশধরদের কেউ কেউ আদৌ পরিবর্তিত হয় না, কেউ হয়তো নামমাত্র পরিবর্তিত হয়, আবার কারুর হয়তো বিপুল পরিবর্তন ঘটে যায়। মানুষের মধ্যেও হয়তো এইরকম ঘটনা ঘটেছিল, উন্নত শ্রেণির বনমানুষদের তুলনায় বিশেষ কতকগুলি বিষয়ে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছিল তাদের।

মানুষ ও তার নিকট-সদৃশ জীবদের জৈবিক-পরম্পরার মধ্যে যে বিশাল ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনও বিদ্যমান বা বিলুপ্ত প্রাণীর দ্বারা পূরণ করা যাচ্ছে না। আর এই ব্যাপারটা নিম্নশ্রেণির কোনও জৈবিক রূপ থেকে মানুষের উদ্ভূত হওয়ার ধারণার বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য যাঁরা সাধারণ চিন্তাভাবনা থেকে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, তাঁদের কাছে এই আপত্তি কখনওই তেমন গুরুত্ব পায় না। জৈবিক-পরম্পরায় প্রায় সর্বত্রই এই ফাঁক বা আকস্মিক ছেদ রয়েছে। কোথাও কোথাও তা অত্যন্ত ব্যাপক, দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট, আবার কোথাও-বা বিভিন্ন মাত্রায় কম। যেমন, ওরাং-ওটাং ও তার নিকট-সদৃশ উন্নত শ্রেণির বনমানুষদের মধ্যেকার শূন্যস্থান, টার্সিয়াস (পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একপ্রকার বানর) ও লেমুর জাতীয় বানরদের মধ্যেকার শূন্যস্থান, হাতিদের মধ্যেকার শূন্যস্থান, এবং অরনিথর-হাইন্‌চাস (অস্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত একপ্রকার হংসচঞ্চু) বা এচিড্‌নার (নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ার অত্যন্ত প্রাচীন একপ্রকার হংসচঞ্চু) এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেকার শূন্যস্থান। অবশ্য এই শূন্যস্থান তখনই সৃষ্টি হয়, যখন একটি প্রাণীর সঙ্গে অত্যন্ত নিকট সম্পর্কযুক্ত অন্য প্রাণীরা ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে, হয়তো কয়েকশো বছরের মধ্যেই, মানুষের সভ্য জাতিগুলি অ-সভ্য জাতিগুলিকে ধ্বংস করে সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের প্রভুত্ব কায়েম করবে। একই সঙ্গে, অধ্যাপক স্ট্যাফোসেনের মন্তব্য অনুযায়ী বলা যায়, অ্যান্‌থ্রোপমরফাস জাতীয় বানরদের দলও (গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি) নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর তাই যদি হয়, তাহলে মানুষ আর তার নিকট-সদৃশ প্রাণীদের মধ্যেকার ফাঁক আরও বেড়ে যাবে, কারণ তখন এই পরম্পরার এক প্রান্তে থাকবে ককেশিয়ানদের চেয়েও উন্নত শ্রেণির মানুষরা, অন্য প্রান্তে থাকবে বেবুন জাতীয় নিকৃষ্ট বানরকুল। এখন নিগ্রো জাতি বা অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে গরিলাদের যেমন ফারাক রয়েছে।

উপযুক্ত জীবাশ্মের অভাবে মানুষের সঙ্গে তার বানর-সদৃশ পূর্বপুরুষের সম্পর্কের মূলসূত্রটি এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। অবশ্য স্যর সি. লাইয়েলের আলোচনাটি যিনি

মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁর কাছে এ-বিষয়টা খুব-একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি দেখিয়েছেন যে সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রেই জীবাশ্ম আবিষ্কারের ব্যাপারটা এক মন্থর প্রক্রিয়া এবং আকস্মিকভাবেই জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, যে-সব জায়গা মানুষের সঙ্গে কোনও বানরসদৃশ বিলুপ্ত জীবের সম্পর্ক প্রমাণ করার উপযোগী জীবাশ্ম পাওয়ার পক্ষে আদর্শ, এমন অনেক জায়গাই এখনও প্রর্যন্ত ভূতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধানী চোখের বাইরে থেকে গেছে।

মানুষের বংশবৃত্তান্তের নিম্নতর স্তরসমূহ

আমরা দেখতে পেলাম যে সিমিয়্যাডে উপশ্রেণির ক্যাটারহাইন বা পূর্ব গোলার্ধের বানরদের জাতিরা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বানরদের জাতিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরই তাদের থেকে আবার আলাদা হয়ে মানুষ জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এবার আমরা মানুষের বংশবৃত্তান্তের সুদূর অতীতের চিহ্নগুলি খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। আর তা করার জন্য আমরা মূলত নির্ভর করব পারস্পরিক শ্রেণি ও বর্গের সাদৃশ্যের ওপর, এবং আমাদের জাত তথ্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে তাদের পরম্পরাক্রমিক আবির্ভাবের প্রশ্নটাকে একটু ছুঁয়ে যাব। প্রথমেই ধরা যাক উন্নত শ্রেণির বানরদের একটি অংশ লেমুরাইডেদের কথা। বিন্যাস অনুযায়ী এদের অবস্থান সিমিয়্যাডেদের নীচে এবং এদের সম্পর্কও বেশ কাছাকাছি। উন্নত শ্রেণির বানর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে এরা স্বতন্ত্র একটি বর্গ, বা হ্যাকেল ও অন্যান্য প্রাণিতত্ত্ববিদের কথা অনুযায়ী, স্বতন্ত্র একটি বিন্যাস। এই গোষ্ঠীটির শাখা-প্রশাখা অসম্ভবরকম বেশি। ফলে এদের থেকে উদ্ভূত প্রাণীদের সংখ্যাও অনেক। আর সম্ভবত এইসব কারণেই এদের অবলুপ্তিও ঘটেছে বেশিরকম। টিকে-থাকা অধিকাংশেরই আশ্রয়স্থল হল বিভিন্ন দ্বীপ, যেমন ম্যাডাগাস্কার ও মালয় উপদ্বীপসমূহ। এইসব জায়গায় বেঁচে থাকার জন্য এদের নানান জীবজন্তুতে ঠাসা মহাদেশসমূহের মতো কোনও কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। আবার এই গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন স্তর লক্ষ করা যায়, যেগুলি, হাক্সলির ভাষায়, 'সর্বোচ্চ স্তরের জীব থেকে শুরু করে এমন নিম্নস্তরের জীব পর্যন্ত প্রসারিত যার থেকে মাত্র এক ধাপ নীচেই আছে নিম্নতম, ক্ষুদ্রতম ও সবথেকে কম বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্ল্যাসেন্টাল (placental) স্তন্যপায়ী প্রাণীরা।' এ-সব কিছু বিচার করে দেখলে মনে হয় বর্তমানের লেমুরাইডে উপশ্রেণির পূর্বপুরুষদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল সিমিয়্যাডে উপশ্রেণিটি এবং লেমুরাইডেদের উদ্ভব ঘটেছিল স্তন্যপায়ী প্রাণীবর্গের একেবারে নীচের স্তরের কোনও রূপের মধ্যে থেকে।

গুরুত্বপূর্ণ অনেক লক্ষণের দিক দিয়ে মারসুপিয়ালদের (ক্যাঙারু জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী) অবস্থান প্ল্যাসেন্টাল স্তন্যপায়ীদের চেয়ে নীচে। এদের আবির্ভাব ঘটেছিল বহু প্রাচীন কোনও ভূতাত্ত্বিক যুগে। আর এরা যে প্রাচীনকালে আজকের তুলনায় অনেক বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। তাই মনে করা

হয় যে প্ল্যাসেন্টাল প্রাণীর দল ইমপ্ল্যাসেন্টাল প্রাণী বা মারসুপিয়ালদের থেকেই ক্রমবিবর্তনের পথ বেয়ে সৃষ্টি হয়েছে। তবে এখনকার মারসুপিয়ালদের সদৃশ আকারবিশিষ্ট প্রাণীদের থেকে নয়, তাদের আদি পূর্বপুরুষদের থেকে। আবার ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণীদের সঙ্গে হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীদের (Monotremata) সাদৃশ্য দেখা যায় এবং এদের নিয়ে গড়ে ওঠে সুবিশাল স্তন্যপায়ী শ্রেণির এক তৃতীয় ও নিম্নতর বিভাগ। বর্তমানে অরনিথরহার্কাস ও এচিড্নারই হচ্ছে এই বিভাগের একমাত্র প্রতিনিধি। এই দু-ধরনের প্রাণীকে একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর শেষ নিদর্শন বলে ধরে নেওয়া যায় স্বচ্ছন্দেই, যে-গোষ্ঠীর কিছু প্রাণী নানান অনুকূল পরিস্থিতি পাওয়ার ফলে টিকে যেতে পেরেছিল অস্ট্রেলিয়ায়। তাছাড়া প্রাণী হিসেবে হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীরা কিন্তু অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, কারণ এদের শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশই সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মতো।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এবং সেই সূত্রে মানুষের বংশবৃত্তান্তের একেবারে নীচের দিকে কোন্ কোন্ প্রাণী আছে, তা খুঁজে বার করতে গিয়ে আমরা বারবার অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলি। অবশ্য মিঃ পার্কারের মতো একজন সুযোগ্য ব্যক্তির কথায় আমরা আস্থা রাখতে পারি। তিনি বলেছেন, কোনও পাখি বা সরীসৃপ স্তন্যপায়ীদের মূল বংশতালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ যদি উদ্ভাবনী-ক্ষমতা ও জ্ঞানের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে অবহিত হতে চান, তাহলে তিনি অধ্যাপক হ্যাকেলের রচনাগুলি পড়ে দেখতে পারেন।[৩] আমি শুধু কয়েকটি সাধারণ কথা বলতে চাই। বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পাঁচটি বিভাগ, অর্থাৎ স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী ও মাছ, সকলেই একই কোনও আদি জৈবিক আকার থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ব্যাপারেই এদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে, বিশেষ করে ভ্রূণাবস্থায় এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য দেখা যায়। মৎস্যকুলের অবস্থান একেবারে নীচে থাকায় এবং সকলের চেয়ে আগে তাদের উদ্ভব হওয়ায় আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মেরুদণ্ডী শ্রেণির সমস্ত জীবই মৎস্য-সদৃশ কোনও প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। প্রাকৃতিক ইতিহাসের সাম্প্রতিক অগ্রগতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন, তাঁদের কাছে বানর, হাতি, হামিং-বার্ড, সাপ, ব্যাং বা মাছের মতো একেবারে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীদের একই উৎস থেকে সৃষ্টি হওয়ার ধারণাটা একেবারেই কিম্ভূতকিমাকার বলে মনে হবে। এই ধারণা থেকে আমরা

৩। হ্যাকেলের 'জেনারেল মরফোলজি' (B.ii.s.cl iii. এবং পৃঃ ৪২৫) বইটিতে বিস্তৃত সারণী দেওয়া হয়েছে এবং মানুষ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে তাঁর 'Naturliche schioplungs geschichte' রচনায়। অধ্যাপক হাক্সলি এই শেষোক্ত রচনাটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, অধ্যাপক হ্যাকেল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ বা উৎপত্তি সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন। অবশ্য কয়েকটি ব্যাপারে হ্যাকেলের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য আছে। তবে সমগ্র রচনাটির রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভূত প্রশংসা করেছেন তিনি।

জানতে পারি যে এইসব প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যে একসময় ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল, যে-যোগসূত্রের কথা আজ চিন্তাই করা যায় না।

তা সত্ত্বেও এটা ঠিক যে এমন সব প্রাণীদের গোষ্ঠী আগেও ছিল বা এখনও আছে, যারা বেশ কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণীর যোগসূত্রকে চিনে নিতে কম-বেশি সাহায্য করে। আমরা দেখেছি অরনিথরহাইনাস্‌রা ক্রমশ পরিবর্তনের মাধ্যমে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মতো আকার পেয়েছে। তাছাড়া, অধ্যাপক হাক্সলি প্রথমে জানিয়েছিলেন এবং পরে মিঃ কোপ ও অন্যান্যরা আরও নিশ্চিত করে বলেছেন যে, ডাইনোসরিয়ানরা গুরুত্বপূর্ণ অনেক লক্ষণের দিক থেকে কিছু কিছু সরীসৃপ ও কিছু কিছু পক্ষীকুলের মধ্যবর্তী প্রাণী। কিছু পক্ষীকুল বলতে মুখ্যত অস্ট্রিচ্‌গোষ্ঠী (যারা নিজেরাই একটা বৃহত্তর গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন অবশেষ মাত্র) এবং তাছাড়া আকিওপ্‌টেরিক্স নামে এক অদ্ভুত ধরনের গিরগিটি সদৃশ লম্বা লেজওয়ালা পাখির (প্রায় ১৪ থেকে ১৭ কোটি বছর আগেকার প্রাণী; বর্তমানে পাখির জীবাশ্ম) কথাই বলা হয়েছে। আবার, অধ্যাপক ওয়েনের মতে, ইক্‌থিওসরিয়্যান—অর্থাৎ, সাঁতরানোর উপযুক্ত ডানাবিশিষ্ট বৃহদাকার সামুদ্রিক গিরগিটির সঙ্গে মাছেদের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাপক হাক্সলির মতে, এদের সঙ্গে উভচর প্রাণীদেরও প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। উভচর প্রাণী বলতে তিনি বুঝিয়েছেন গ্যানয়েড শ্রেণির মাছেদের (যেমন অ্যাসিপেন্সার, পলিপ্‌টেরাস প্রভৃতি মাছ) সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণীদের, যাদের সর্বোচ্চ ভাগে রয়েছে জলের ব্যাঙ (Frog) ও ডাঙার ব্যাঙ (Toad) জাতীয় জীবেরা। গ্যানয়েড শ্রেণির মাছেদের দেখা মেলে ভূতাত্ত্বিক যুগের সূচনাপর্বে। তাদের গঠন-আকৃতি হল সাধারণ ধরনের, অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে তাদের নানারকম সাদৃশ্য ছিল। লেপিডোসিরেনদের (দক্ষিণ আমেরিকার এক ধরনের মাছ) সঙ্গে উভচর প্রাণী ও মাছেদের এত নিকট-সাদৃশ্য আছে যে প্রাণিতত্ত্ববিদরা বুঝে উঠতে পারেন না এই দুয়ের মধ্যে কোন্ শ্রেণিতে তাদের (লেপিডোসিরেন) ফেলবেন। লেপিডোসিরেন ও কিছু গ্যানয়েড জাতের মাছ একেবারে বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে নদীতে বসবাস শুরু করার দরুন। এই নদীগুলিই হয়ে উঠেছিল তাদের আশ্রয়স্থল, এবং মূল মহাদেশের সঙ্গে দ্বীপগুলি যেভাবে যুক্ত থাকে ঠিক সেইভাবেই এই নদীগুলি যুক্ত ছিল সমুদ্রের সঙ্গে।

শেষত, অসংখ্য শ্রেণিতে বিভক্ত বিশাল মৎস্যকুলের আর-এক সদস্য হল ল্যান্সলেট বা অ্যাম্‌ফিওক্সাস (দৈর্ঘ্যে মাত্র দু' ইঞ্চি; অগভীর সমুদ্রের মাছ; পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়)। অন্য সব মাছেদের থেকে এরা এত স্বতন্ত্র যে, হ্যাকেলের মতে, এরা নিজেরাই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ দাবি করতে পারে। এইসব মাছেরা তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। এদের দেহে মস্তিষ্ক, শিরদাঁড়া বা হৃদযন্ত্র থাকে না বললেই চলে। তাই আগেকার প্রাণিতত্ত্ববিদরা এদের পোকামাকড়ের শ্রেণিভুক্ত করেছিলেন। অনেকদিন আগেই অধ্যাপক গুড্‌স্যার ল্যান্সলেট মাছেদের সঙ্গে অ্যাসিডিয়ান বা সিন্ধুঘোটক জাতীয়

প্রাণীদের কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। এই অ্যাসিডিয়ানরা হচ্ছে একরকম অমেরুদণ্ডী ও উভলিঙ্গবিশিষ্ট সামুদ্রিক জীব, কোনও-কিছুতে ভর না দিয়ে এরা চলাফেরা করতে পারে না। এদেরকে প্রাণী বলাও মুশকিল, কারণ শরীর বলতে সাদাসিধে শক্ত একটা চামড়ার থলি আর তার মধ্যে দুটি ছোট ছোট ফুটো। হাক্সলির মতে এরা মোলাস্‌কোয়াডা শ্রেণিভুক্ত। মোলাস্‌কোয়াডা হল শম্বূকজাতীয় প্রাণীদের (Mollusca) নীচের দিকের একটি বিভাগ। কিন্তু অধুনা কিছু প্রাণিতত্ত্ববিদ এদেরকে কৃমিজাতীয় কীট বা পোকামাকড়ের দলে রাখতে চেয়েছেন। এদের শূককীটের আকার অনেকটা ব্যাঙাচির মতো।[৪] এরা অবাধে জলে ঘুরে বেড়াতেও পারে। এম. কোভালেভ্‌স্কি সম্প্রতি লক্ষ করেছেন যে অ্যাসিডিয়ানের শূককীট মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কারণ শূককীট অবস্থায় এদের বেড়ে ওঠার ধারা, স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থান এবং দৈহিক আকৃতি অনেকটাই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কর্ডা ডরসালি বা ভ্রূণাবস্থার মতো হয়। অধ্যাপক কুফার-ও এ-ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। এম. কোভালেভ্‌স্কি নেপ্‌ল্‌স থেকে আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে তিনি এখন এ-ব্যাপারে আরও পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন এবং সমস্ত বিষয়টা ভালভাবে প্রমাণিত হলে তা এক অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্কার হিসেবে পরিগণিত হবে। কাজেই আমরা যদি শ্রেণিবিভাজনের পক্ষে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক ভ্রূণতত্ত্বের ওপর আস্থা রাখি, তাহলে অবশেষে আমরা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের উদ্ভব সম্পর্কে একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি বলে ধরে নেওয়া যায়।[৫] আর তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে সুদূর অতীতে পৃথিবীতে এমন এক প্রকার জীবের অস্তিত্ব ছিল, যাদের সঙ্গে

৪। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ যে-কোনও প্রাণিতত্ত্ববিদদের থেকে কয়েক বছর আগেই, ফক্‌ল্যান্ড দ্বীপে আমি নিজের চোখে একটি মিশ্রজাতের গমনশীল অ্যাসিডিয়ানের শূককীট দেখেছিলাম, যেটি আকার-প্রকারে অনেকটাই সাইনোয়্যাকামের (synoicum) মতো, অথচ জাত বা শ্রেণির বিচারে একেবারেই আলাদা। শূককীটটির আয়তাকার মাথার থেকে লেজটা দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচগুণ বড়। খুব সূক্ষ্ম একটি তন্তুতে গিয়ে শেষ হয়েছে লেজটা। সাধারণ একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমি যেমন দেখেছি, তাতে মনে হয় এই তন্তুটি আড়াআড়িভাবে অবস্থিত কিছু অস্পষ্ট রেখার দ্বারা বিভক্ত, এবং তা খুব সম্ভবত কোভালেভ্‌স্কি বর্ণিত বৃহৎ কোষেরই অনুরূপ। বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় শূককীটের লেজটি তার মাথার চারপাশে গোল হয়ে গুটিয়ে ছিল।

৫। এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে অত্যন্ত গুণীজনেরাও কেউ কেউ এ-ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ-রকম একজন হলেন বিশিষ্ট প্রাণিতত্ত্ববিদ মিঃ জার্ড (দ্রঃ, 'অ্যারশ্যাভ দ্য জুলজি এক্সপেরিমেঁত্যাল'-এর ১৮৭২ সালের কিছু ধারাবাহিক প্রবন্ধ)। তা সত্ত্বেও, তিনি মন্তব্য করেছেন, 'কোনও তত্ত্ব বা ধারণার দরকার নেই, স্রেফ অ্যাসিডিয়ান শূককীটকে লক্ষ করলেই বোঝা যায় কীভাবে প্রকৃতি শুধুমাত্র অভিযোজনের সজীব অবস্থার সাহায্যে অমেরুদণ্ডী জীবের মধ্যেও মেরুদণ্ডী জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য (ডর্সাল কর্ডের উপস্থিতি) সৃষ্টি করে এবং এক ধরনের জীবের সঙ্গে আর-এক ধরনের জীবের যোগাযোগের এই সম্ভাবনা দুয়ের মধ্যেকার ব্যাপক ফারাককে ঘুচিয়ে দেয়। তবে, ঠিক কোথায় এই যোগাযোগ বাস্তবে সম্পন্ন হয়েছিল, তা আমাদের জানা না-ও থাকতে পারে।

অনেক ব্যাপারেই সাদৃশ্য আছে এখনকার অ্যাসিডিয়ান শূককীটের। পরে তারা দুটি বড় বড় শাখায় বিভক্ত হয়—একটি শাখা বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে এবং অ্যাসিডিয়ানদের বর্তমান শ্রেণিটির জন্ম দেয়, অন্যটি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জন্ম দিয়ে প্রাণীজগতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

এতক্ষণ ধরে আমরা মোটামুটি পারস্পরিক সাদৃশ্যের সাহায্যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বংশবৃত্তান্ত উদ্ধার করার চেষ্টা করলাম। এবার আমরা মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করব। আমার মনে হয় একটু চেষ্টা করলে আমরা আমাদের আদি পূর্বপুরুষের গঠন-আকৃতি সম্বন্ধে কালানুক্রমিক না হলেও এক-এক যুগে তা কেমন ছিল, তার একটা আংশিক খসড়া অন্তত তৈরি করতে পারি। আর তা সম্ভব হতে পারে মানুষের দেহে এখনও টিকে-থাকা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের সাহায্যে, পুনরাবর্তনের মাধ্যমে অতীতের যে-সব বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে আবার প্রকাশ পায় সেগুলির সাহায্যে, এবং অঙ্গসংস্থানতত্ত্ব ও ভ্রূণতত্ত্বের সাহায্যে। এখানে যে-সব তথ্যের কথা আসবে, সেগুলি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের সর্বাঙ্গ একসময় নিশ্চয়ই রোমাবৃত ছিল। স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ের মুখেই দাড়ি ছিল। তাদের কানের গঠন ছিল সম্ভবত ছুঁচোলো বা খাড়াকৃতি, ইচ্ছে করলে তারা কান নাড়াতেও পারত। একটা লেজ থাকত তাদের দেহে আর তা ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পেশীও থাকত। তাদের শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন বেশ কিছু পেশীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত যেগুলি এখন মানবদেহে প্রায় দেখাই যায় না, কিন্তু চতুষ্পদী প্রাণী বা বানর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে আকছার দেখা যায়। যে-সময়ের কথা বলছি তখন বা তারও আগে হাতের ঊর্ধ্বাংশের হাড় হিউমেরাসে প্রধান ধমনী ও স্নায়ুতন্ত্রের প্রবেশপথ ছিল সুপ্রা-কন্ডিলয়েড ফোরামেন নামক ছিদ্রটি দিয়ে। তখন মানুষের অন্ত্রে ডাইভার্টিকুলামের (ইলিয়াম যেখানে শেষ সেখান থেকে মাত্র এক সেমি দূরে অবস্থিত) দৈর্ঘ্য বা সিকামের ব্যাস আরও বড় ছিল। ভ্রূণাবস্থায় পায়ের বুড়ো আঙুল যেমন থাকে, তাদের বুড়ো আঙুলও অনেকটা সে-রকমভাবেই পায়ের অন্যান্য আঙুলের সঙ্গে জুড়ে থাকত। আমাদের পূর্বপুরুষদের আচার-আচরণ যে বৃক্ষবাসীদের মতো ছিল এবং সাধারণত তারা যে উষ্ণ জলবায়ু বিশিষ্ট, ঘন জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বসবাস করত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পুরুষদের বড় বড় কেনাইন দাঁত থাকত, আর তা মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। তার থেকে আরও আগের যুগে মেয়েদের শরীরে দুটি করে জরায়ু থাকত। দেহের বর্জ্যপদার্থ (মলমূত্র) ক্লোয়েকা নামক ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে যেত। চোখের রক্ষক হিসেবে তৃতীয় একটি পর্দা বা নিকটেটিং ঝিল্লি থাকত। অনেক অনেক আগে মানুষের পূর্বপুরুষদের আচার-আচরণ সম্ভবত জলচর প্রাণীদের মতো ছিল। কারণ অঙ্গ সংস্থানতত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি যে মানুষের ফুসফুস হচ্ছে আসলে একটি রূপান্তরিত হাওয়া-ব্লাডার (হাওয়া পেলে প্রসারিত হয় এবং হাওয়া ছাড়লে সংকুচিত

হয়), যা একসময় তাকে জলের ওপর ভেসে থাকতে সাহায্য করত। মানব-ভ্রূণের ঘাড়ে চেরা দাগ থেকে অনুমান করা যায়, নিশ্চয়ই একসময় ওইখানে ফুলকা-র অস্তিত্ব ছিল। আবার, আমাদের শারীরিক কিছু কাজ চন্দ্রপক্ষ অনুযায়ী বা প্রতি সপ্তাহান্তে সংঘটিত হয়। এটা সম্ভবত মানুষের সমুদ্র উপকূলবর্তী আদি বাসস্থানেরই নিদর্শন। তাছাড়া সেই সময়েই মানবদেহে প্রকৃত কিডনির বদলে করপোরা উল্‌ফিয়ানা দেখা দেয়। হৃদ্‌যন্ত্র ছিল একটা সামান্য ধুক্‌ধুকানি যন্ত্র মাত্র। অন্যদিকে, কর্ডা ডরসালিস, যা দেখতে অনেকটা পাকানো দড়ির মতো, তা শিরদাঁড়ার স্থান দখল করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষদের এইসব আদি পূর্বপুরুষদের গঠনাকৃতি তখন বেশ সাদামাটাই ছিল। এমনকী ল্যান্সলেট বা অ্যাম্‌ফিওক্সাস মাছেদের থেকেও সাদামাটা ছিল তাদের গঠনাকৃতি।

আর-একটি বিষয়ের প্রতিও আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। দীর্ঘদিন ধরেই জানা গেছে যে, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কোনও-একটি লিঙ্গের (স্ত্রী বা পুরুষ) মধ্যে জনন সংশ্লিষ্ট যে-সব অপরিহার্য অঙ্গ প্রাথমিক (অবিকশিত) অবস্থায় থাকে, বিপরীত লিঙ্গতে সেগুলিই খুব উন্নত অবস্থায় বিরাজ করে। তাছাড়া, সমস্ত ভ্রূণেরই প্রাথমিক অবস্থায় যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় গ্রন্থিরই অস্তিত্ব থাকে, তা-ও এখন নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। অর্থাৎ সমগ্র মেরুদণ্ডী জীবজগতের কোনও আদি পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই জননের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় বৈশিষ্ট্যই ধারণ করত বা উভলিঙ্গ ছিল।[৬] কিন্তু এক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ স্তন্যপায়ী পুরুষ-প্রাণীদের মূত্রগ্রন্থিতে (vesiculae prostaticae) সন্নিহিত পথবিশিষ্ট অবিকশিত জরায়ু দেখা যায়, যেমন দেখা যায় তাদের স্তনগ্রন্থি। তাছাড়া ক্যাঙারুজাতীয় প্রাণীদের অনেক পুরুষের মধ্যেও অন্ধকদেশে বাচ্চা-বহনকারী থলির সন্ধান মেলে।[৭] এ-রকম আরও অনেক ঘটনার কথাই হয়তো উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। কিন্তু তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, কিছু প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণী একটা আলাদা শ্রেণি হিসেবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করবার পর এবং সেহেতু নিম্নশ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও উভলিঙ্গই থেকে গিয়েছিল? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়, কেননা

৬। এটি হল তুলনামূলক শারীরসংস্থানবিদ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক জিগেন্‌বরের সিদ্ধান্ত (দ্রঃ, 'Grundzuge der vergleich Anat.', ১৮৭০, পৃঃ ৮৭৬)। মূলত উভচর প্রাণীদের লক্ষ করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন তিনি। কিন্তু মিঃ ওয়ালডেয়ারের গবেষণা থেকে মনে হয় (দ্রঃ, 'জার্নাল অফ অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি', ১৮৬৯, পৃঃ ১৬১), প্রাণীদের জনন-অঙ্গ, এমনকী 'উচ্চশ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জনন-অঙ্গও প্রাথমিক অবস্থায় উভলিঙ্গতা সম্পন্ন হয়ে থাকে।' বিভিন্ন গবেষক দীর্ঘদিন ধরেই এই ধারণা পোষণ করে আসছেন, কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই ধারণার কোনও দৃঢ় বনিয়াদ ছিল না।

৭। পুরুষ-আইলাসিনাস এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্রঃ, 'অ্যানাটমি অফ ভার্টিব্রেট্‌স', খণ্ড ৩, পৃঃ ৭৭১।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নীচের তলার প্রাণী মাছেদের মধ্যেও এখন উভলিঙ্গ তার কোনও লক্ষণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।[৮] একটি লিঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনেক আনুষঙ্গিক অংশই তার বিপরীত লিঙ্গতে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে। এই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, প্রথমে কোনও-একটি লিঙ্গ (স্ত্রী বা পুরুষ) এই অংশগুলি ক্রমান্বয়ে অর্জন করেছিল এবং পরে তা বংশগতির মাধ্যমে কম-বেশি অসম্পূর্ণ অবস্থায় অন্য লিঙ্গেও সঞ্চারিত হয়েছিল। এ-রকম সঞ্চারণের ভূরিভূরি নজির আছে। যেমন, পুরুষ-পাখিরা আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে বা তাদের সৌন্দর্যকে মোহময় করে তোলার জন্য যে কাঁটা (পায়ে), পালক ও উজ্জ্বল বর্ণ অর্জন করে থাকে, দেখা যায় সেগুলিই একদিন বংশগতির সাহায্যে স্ত্রী-পাখিরাও পেয়ে গেছে। তবে স্ত্রী-পাখিদের মধ্যে সেগুলি মোটেই যথাযথ বা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

পুরুষ-স্তন্যপায়ীদের দেহে নিষ্ক্রিয় ধরনের স্তন-সদৃশ অঙ্গের উপস্থিতি কয়েকটি দিক থেকে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীদের দেহে যথার্থ দুগ্ধ-উৎপাদক গ্রন্থি দেখা যায়। তাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, কিন্তু কোনও বোঁটা থাকে না। আর এই জাতীয় প্রাণীরা যেহেতু স্তন্যপায়ীদের মধ্যে অত্যন্ত নীচের সারির জীব, তাই মনে হয় তাদের পূর্বপুরুষরাও বোঁটাবিহীন স্তনগ্রন্থির অধিকারী ছিল। তাদের বিকাশধারা থেকে বোঁটাহীন স্তনের ব্যাপারটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। কলিকার ও লেঞ্জারের মতামত সম্পর্কে অধ্যাপক টার্নার আমাকে জানিয়েছেন যে, ভ্রূণের মধ্যে স্তন-বৃন্ত স্পষ্ট হওয়ার আগেই দুগ্ধগ্রন্থিকে স্পষ্টভাবে চেনা যায় এবং প্রাণীর পরম্পরাক্রমিক অংশগুলির বিকাশ সাধারণত তার বংশধারার পরম্পরাক্রমিক বিকাশের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণীদের স্তনে বোঁটা থাকায় স্পষ্টতই তারা হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীদের থেকে পৃথক গোত্রের প্রাণী। সম্ভবত এ-রকম দৈহিক অঙ্গ (বোঁটাযুক্ত স্তন) ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণীরা হংসচঞ্চুদের থেকে বিচ্যুত হয়ে ও তাদের থেকে আরও এগিয়ে যাওয়ার পরই প্রথম লাভ করেছিল, পরে তা বংশগতির নিয়মে বাচ্চা-প্রসবকারী স্তন্যপায়ীদের মধ্যে

৮। বিভিন্ন প্রজাতির সেরানাস-দের (Serranus) মধ্যে এবং অন্যান্য কিছু মাছের মধ্যেও উভলিঙ্গতা দেখা গেছে। এদের মধ্যে এই উভলিঙ্গতা হয় স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা অস্বাভাবিক ও শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ডঃ জুতেভিন্ এ-বিষয়ে আমাকে অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য জানিয়েছেন, আর বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক হ্যালবার্টস্মার একটি গবেষণাপত্রের দিকে (দ্রঃ, 'ট্রান্জাক্শন্স অফ দ্য ডাচ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস', খণ্ড ১৬)। ডঃ গুন্থার এ-ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেও, এত বেশি সংখ্যক সুদক্ষ পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে এর স্বীকৃতি মিলেছে যে এখন আর এ সম্বন্ধে কোনওরকম বিতর্ক করা চলে না। ডঃ এম. লেসোনা আমাকে লিখেছেন যে সেরানাসদের সম্বন্ধে ক্যাভোলিউই-এর পরীক্ষাটি তিনি যাচাই করে দেখেছেন। অধ্যাপক এরকোলানি সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে বানমাছেরা উভলিঙ্গ ('Acad. delle Scienze', বোলোনা, ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৭১)।

সঞ্চারিত হয়েছে।[৯] অথচ কেউই বলতে পারবেন না যে ক্যাঙারু সম্প্রদায় তাদের বর্তমান গঠন-আকৃতি লাভ করার পরও উভলিঙ্গই রয়ে গেছে। তাহলে পুরুষ-স্তন্যপায়ীদের মধ্যে কি কোনও দুগ্ধগ্রন্থির দেখা মিলছে? সম্ভবত এই গ্রন্থি প্রথমে স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে বিকশিত হয়ে পরে পুরুষদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের আলোচনা অনুযায়ী এই ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

এ-প্রসঙ্গে আর-একটি মতবাদের কথা বলা যাক। এই মতবাদ অনুযায়ী মনে করা হয় যে, সমগ্র স্তন্যপায়ী শ্রেণির পূর্বপুরুষদের উভলিঙ্গতার জীবন শেষ হওয়ার দীর্ঘদিন পরেও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই দুগ্ধ উৎপাদন করত এবং তা দিয়ে বাচ্চাদের প্রতিপালন করত। আর ক্যাঙারু-সদৃশ প্রাণীরা, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই, তাদের অঙ্কদেশের থলিতে বাচ্চা বহন করত। এই মতটা একেবারে অসম্ভব নয়, কেননা একরকম পুরুষ-মাছ (sygnathous fishes) সত্যি সত্যিই তাদের পেটের নীচের থলিতে স্ত্রী-মাছের ডিম রেখে বাচ্চা ফোটায়। এমনকী কেউ কেউ মনে করেন যে পরবর্তী সময়ে তারা ডিম-ফোটা বাচ্চাদের লালন-পালন পর্যন্ত করে থাকে।[১০] কোনও কোনও জাতের পুরুষ-মাছ আবার মুখের মধ্যে বা কানকোর মধ্যে ডিম রেখে বাচ্চা ফোটায়। কয়েকপ্রকার পুরুষ-ব্যাঙ স্ত্রী-ব্যাঙের কাছ থেকে মালাকৃতি ডিমগুচ্ছ নিয়ে নেয়, তারপর সেগুলি তাদের উরুতে জড়িয়ে রাখে, যতদিন না ডিম ফুটে ব্যাঙাচির জন্ম হয়। কিছু কিছু পুরুষ-পাখি তো ডিমে তা দেবার সমস্ত দায়িত্ব একাই পালন করে থাকে। পুরুষ এবং স্ত্রী-পায়রারা দানা খুঁটে খুঁটে খাইয়ে দেয় তাদের বাচ্চাদের। উপরোক্ত ধারণাটা আমার মাথায় প্রথম এসেছিল এই থেকে যে, পুরুষ-স্তন্যপায়ীদের শরীরে জনন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়ক অংশের তুলনায় দুগ্ধগ্রন্থি অনেক বেশি বিকশিত হয়ে থাকে, যে-দুগ্ধগ্রন্থি মূলতই নারী-শরীরের নিজস্ব ব্যাপার। পুরুষ-স্তন্যপায়ীদের শরীরে দুগ্ধগ্রন্থি ও স্তনের বোঁটা যে অবস্থায় থাকে, তাতে তাকে আদৌ প্রাথমিক স্তরের লক্ষণ বলা যায় না। বড়জোর বলা যায় যে তা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি

৯। অধ্যাপক জিগেন্‌বর দেখিয়েছেন যে সমগ্র স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে দু-রকম স্তনবৃন্তের সন্ধান মেলে (দ্রঃ, 'Jenaische Zeitschaift'. Bd. vii. পৃঃ ২১২)। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই দু-রকম স্তনবৃন্ত ক্যাঙারুজাতীয় প্রাণীদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল, আর ক্যাঙারুজাতীয় প্রাণীরা নিশ্চয়ই তা অর্জন করেছিল হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীদের থেকে। এই বিষয়ে আরও জানা যায় স্তনগ্রন্থি সম্বন্ধে ডঃ ম্যাক্স হাস্‌-এর স্মৃতিকথা থেকে (দ্রঃ, ঐ, B. viii, পৃঃ ১৭৬)।

১০। মিঃ লক্‌উড হিপ্পোক্যাম্‌পাসদের বিকাশধারা লক্ষ করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন (দ্রঃ, কোয়ার্টার্লি জার্নাল অফ সায়েন্স, এপ্রিল ১৮৬৮, পৃঃ ২৬৯) যে, তাদের পুরুষদের পেটের নীচের থলির (abdominal pauch) গা কয়েক দিক থেকে ভ্রূণ প্রতিপালনের উপযুক্ত। পুরুষ-মাছেদের মুখে ডিম রেখে তা দেওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে অধ্যাপক ভাইম্যান তাঁর গবেষণাপত্রে (দ্রঃ, 'প্রসিডিংস অফ বোস্টন সোসাইটি অফ ন্যাচরাল হিস্ট্রি', ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭) চমৎকার আলোচনা করেছেন। তাছাড়া অধ্যাপক টার্নার (দ্রঃ, 'জার্নাল অফ অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি', ১ নভেম্বর, ১৮৬৬, পৃঃ ৭৮) ও ডঃ গুন্থার এ-বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

এবং কাজের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থেকে গেছে। মেয়েদের মতো পুরুষদেরও এই অঙ্গগুলি (দুগ্ধগ্রন্থি ও স্তনের বোঁটা) বেশ কিছু রোগের শিকার হয়। অনেক সময় জন্মলগ্নে বা বয়ঃসন্ধিকালে তাদের স্তনে কয়েক ফোঁটা দুধ আসতেও দেখা যায়। এই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারটি দেখা গিয়েছিল পূর্বোল্লিখিত সেই যুবকটির মধ্যে, যার শরীরে দু-জোড়া স্তনগ্রন্থি ছিল। কখনও কখনও মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর পুরুষদের মধ্যে এই অঙ্গগুলি বয়ঃপ্রাপ্তির সময় এত চমৎকার বিকাশ লাভ করে যে তা থেকে নিয়মিত দুগ্ধ নিঃসৃত হতে শুরু করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বহুদিন আগে মেয়েদের সঙ্গে পুরুষ-স্তন্যপায়ীরাও নবজাতক প্রতিপালনের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিল,[১১] এবং পরে কোনও কারণে (হয়তো বাচ্চা প্রসবের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায়) পুরুষরা এই কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। ফলে ওইসব অঙ্গের অব্যবহার বয়ঃসন্ধিকালে সেগুলিকে একসময় নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। আর বংশগতির দুটি সুবিদিত নিয়ম অনুসারে এই নিষ্ক্রিয়তা পরবর্তী সমস্ত প্রজন্মের পুরুষদের বয়ঃসন্ধির সময়ে ওই অঙ্গগুলিকে নিষ্ক্রিয় করেই রেখেছে। কিন্তু ওই বয়সের আগে পর্যন্ত এই অঙ্গগুলির ওপর কোনও প্রভাব না পড়ায় মেয়ে বা ছেলে যে-কোনও বাচ্চার ক্ষেত্রেই এগুলি সমান বিকশিত অবস্থায় দেখা যায়।

উপসংহার

ফনবার শরীরের বিভিন্ন অংশের বৈসাদৃশ্য ও বিশেষত্বের ওপর নির্ভর করে জীবের অগ্রগতি বা উন্নতির (এই সঙ্গে আমি যোগ করতে চাই, জীবটি যখন পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠে, তখনকার সম্বন্ধে) যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা অন্য যে-কোনও ব্যাখ্যার থেকে অনেক বেশি নির্ভুল। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে প্রাণীরা যেহেতু জীবনের নানান ধারার সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়, সেহেতু তাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিভিন্ন কাজের জন্য আরও বেশি বেশি করে পৃথকীকৃত ও বিশেষীকৃত হয়ে ওঠে। দৈহিক শ্রম-বিভাজন থেকে প্রাপ্ত সুবিধার দরুনই এটা ঘটে থাকে। সাধারণত প্রথমে যে-অঙ্গটি একটিমাত্র কাজের জন্য পরিবর্তিত হয়, সেটিই বহুদিন পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য একটি কাজের জন্য আবার পরিবর্তিত হয়। এইভাবে শরীরের সমস্ত অংশ বার বার পরিবর্তিত হতে হতে একসময় অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে, কিন্তু প্রতিটি জীবের সঙ্গে তার আদি পূর্বপুরুষের গঠন-আকৃতির একটা সাদৃশ্য থেকেই যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন মেলে ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে। দেখা গেছে পৃথিবীতে সমস্ত জীবই ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে কতকগুলি স্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। সুবিশাল মেরুদণ্ডী জগতে এইভাবে এগোনোর সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে মানুষ। তবে এমন ভাবনা অর্থহীন যে জীবগোষ্ঠীগুলি সর্বত্রই অন্য কোনও গোষ্ঠীকে

১১। মামোয়াজেল সি. রোয়ের-ও তাঁর 'অরিজাইন দ্য লো'ম্', ১৮৭০, গ্রন্থে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন।

হঠিয়ে নিজের জায়গা করে নিয়েছে এবং অন্য এক প্রকার উন্নততর জীবের জন্ম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাই লোপাট হয়ে গেছে। বরং অনেক সময় দেখা যায় নতুন জীবেরা তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে উন্নত হয়ে উঠলেও প্রকৃতির সঙ্গে সব জায়গায় ঠিকমতো খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। কিছু সেকেলে জীব (জন্মসময় হিসেবে পৃথিবীতে যারা তালিকাভুক্ত) তাদের বসবাসের পক্ষে অনুকূল সংরক্ষিত অঞ্চলে টিকে থেকেছে, যেখানে তাদের তীব্র জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়নি। সেইসঙ্গে এই প্রাণীরা আমাদের (মানুষের) বংশবৃত্তান্ত রচনার কাজে সাহায্য করে, কেননা এদের কাছ থেকেই তো আমরা ধারণা করতে পারি আগে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ জীবের অস্তিত্ব ছিল এবং এখন কোন্ কোন্ প্রাণী লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই বর্তমানে জীবিত কোনও অনুন্নত শ্রেণির প্রাণীকে দেখে ধরে নেব না যে এরাই তাদের আদি পূর্বপুরুষদের হুবহু প্রতিচ্ছবি। এ-রকম ভাবাটা নিতান্তই ভুল হবে।

মেরুদণ্ডী জীবজগতের একেবারে আদি পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আমাদের অস্পষ্টতা এখনও কাটেনি। খুব সম্ভবত তারা ছিল বর্তমানের অ্যাসিডিয়ান-শূককীটের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত একপ্রকার সামুদ্রিক জীব।[১২] এদের থেকেই সম্ভবত ল্যান্সলেট জাতীয়

১২। সমুদ্র-উপকূলবর্তী জীবেরা জোয়ার-ভাটার দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়ে থাকে। যে-সব জীব ওপরের ঘোলা জলে থাকে কিংবা যে-সব জীব তলার ঘোলা জলে থাকে, তারা উভয়েই এক পক্ষ কালের মধ্যে পূর্ণ একটি জোয়ার-ভাটাগত পরিবর্তনের আবর্তন শেষ করে। ফলে প্রতি সপ্তাহেই তাদের খাদ্যের তালিকাও বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়। এইরকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে বহু প্রজন্ম অতিবাহিত করে আসার ফলে এই ধরনের জীবদের সাপ্তাহিক প্রধান প্রধান কার্যকলাপের কোনও ব্যতিক্রমই প্রায় হয় না। তবে এটা খুব রহস্যময় ব্যাপার যে বর্তমানে স্থলচর উন্নত শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং অন্যান্য শ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে অনেক স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া এক বা একাধিক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। মেরুদণ্ডী জীবেরা যদি সামুদ্রিক অ্যাসিডিয়ানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনও প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে, একমাত্র তাহলেই এই ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ-রকম পর্যায়বৃত্ত প্রক্রিয়ার আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন স্তন্যপায়ীদের গর্ভধারণকাল, জ্বরের সময়সীমা ইত্যাদি। ডিমে তা দেওয়ার ব্যাপারটাও একটা চমৎকার উদাহরণ, কেননা মিঃ বার্লেট-এর মতে (দ্রঃ, 'ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার' ৭ জানুয়ারি, ১৮৭১), পায়রার ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে দু-সপ্তাহ সময় লাগে, মুরগির ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহ, পাতিহাঁসের চার সপ্তাহ, রাজহংসীর পাঁচ সপ্তাহ এবং অস্ট্রিচ পাখির ক্ষেত্রে সাত সপ্তাহ সময় লাগে। বিচার-বিবেচনা করে আমরা যতটা বুঝতে পারি, তাতে মনে হয় একদা অর্জিত কোনও পুনরাবর্তনমূলক পর্যায়বৃত্ত যদি মোটামুটিভাবে কোনও প্রক্রিয়া বা ক্রিয়ার সঠিক সময় অনুযায়ী ফিরে ফিরে আসে, তাহলে তা বড়-একটা পাল্টায় না। ফলে তা পরবর্তী প্রায় সমস্ত প্রজন্মের মধ্যেই সঞ্চারিত হতে পারে। কিন্তু ক্রিয়াটি যদি পরিবর্তিত হয়, তাহলে নির্দিষ্ট সময়সীমারও পরিবর্তন ঘটে, এবং তা এক সপ্তাহের মধ্যেই অনেকটা হঠাৎই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই সিদ্ধান্তটি যদি সঠিক হয়, তাহলে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চেহারা নেয়। কারণ প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর গর্ভধারণকাল, প্রতিটি পাখির ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানো এবং এ-রকম আরও অনেক অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া এইসব প্রাণীদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে আমাদের প্রায়শই ধন্দে ফেলে দেয়।

কিছু অনুন্নত মাছের সৃষ্টি হয়েছিল। পরে আবার ল্যাঙ্গলেট জাতীয় মাছেদের থেকে সৃষ্টি হয়েছে গ্যানয়েড ও লেপিডসিরেন (দক্ষিণ আমেরিকার একপ্রকার মাছ) জাতীয় অন্যান্য মাছ। হয়তো এ-রকমভাবেই এই ধরনের মাছেরা কিছুটা উন্নত হওয়ার পর সৃষ্টি হয়েছে উভচর প্রাণী। পাখিদের সঙ্গে সরীসৃপদের যে একসময় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। তারপর সরীসৃপদের সঙ্গে স্তন্যপায়ীদের মোটামুটি একটা সংযোগ ঘটিয়েছে হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীরা। কিন্তু বর্তমানে কারোর পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি উচ্চশ্রেণির প্রাণী, অর্থাৎ স্তন্যপায়ী, পক্ষী ও সরীসৃপরা নিম্নশ্রেণির দুই মেরুদণ্ডী অর্থাৎ উভচর প্রাণী ও মৎস্য থেকে ঠিক কোন্ বংশধারা অনুযায়ী জন্ম নিয়েছিল। অবশ্য স্তন্যপায়ী শ্রেণির বিকাশের স্তরগুলি একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। যেমন, অতি প্রাচীনকালের হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীদের থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ক্যাঙারু-সদৃশ প্রাণী, আর ক্যাঙারু-সদৃশ প্রাণীদের থেকে বাচ্চা-প্রসবকারী স্তন্যপায়ীদের আদি পূর্বপুরুষদের উদ্ভব হয়েছিল। এখান থেকে অগ্রগতি ঘটেছে লেমুরাইডে শ্রেণিতে। আবার লেমুরাইডে থেকে সিমির‍্যাডেতে পৌঁছতে খুব বেশি দেরি হয়নি। তারপর এই সিমিয়্যাডেরা দুটি বড় বড় শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বানর গোষ্ঠী এবং পূর্ব গোলার্ধের বানর গোষ্ঠী। অবশেষে, কোনও-এক সুদূর অতীতে, পূর্ব গোলার্ধের বানরকুল থেকে জন্ম নেয় জগতের বিস্ময় ও গৌরব—মানুষ।

আমরা এখানে মানুষের বংশ-বিবরণের একটি দীর্ঘ তালিকা পেলাম। তবে এই বংশবিবরণ হয়তো খুব রাজসিক নয়। অনেকে বলেন পৃথিবী যেন মানুষের আবির্ভাবের জন্য দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলেছিল। কথাটা একদিক থেকে খুবই সত্য, কারণ মানুষের উদ্ভবের পিছনে রয়েছে বহু ধরনের পূর্বপুরুষের অবদান। এই জৈবিক শৃঙ্খলের মধ্যে কোনও একটিমাত্র সূত্রও যদি গরহাজির থাকত, তাহলে মানুষ বোধহয় ঠিক আজকের চেহারায় এসে পৌঁছতে পারত না। ইচ্ছে করে চোখ বুজে না থাকলে, বর্তমান জ্ঞানের নিরিখেই সম্ভবত আমরা চিনে নিতে পারব কারা আমাদের আদি পিতৃপুরুষ। আর তার জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। অত্যন্ত নিকৃষ্ট জীবেরাও আমাদের পায়ের নীচের নিষ্প্রাণ ধূলিকণার থেকে অনেক বেশি সম্মানের অধিকারী। পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন যে-কোনও ব্যক্তি কোনও প্রাণীর সম্বন্ধে—তা সে প্রাণীটি যতই নিকৃষ্ট মানের হোক না কেন—অনুসন্ধান করতে বসে তার চমৎকার গঠন-কাঠামো এবং বিশেষ গুণ দেখে উদ্দীপনায় চঞ্চল হয়ে উঠবেনই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মানুষের বিভিন্ন জাতি প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি ও গুরুত্ব

মানুষের বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়—মানুষের তথাকথিত জাতিগুলিকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবে ভাগ করার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—উপপ্রজাতি—একপ্রজাতির প্রবক্তা ও বহুপ্রজাতির প্রবক্তা—বৈশিষ্ট্যে সহধর্মিতা—একেবারে পৃথক পৃথক মানবজাতিগুলির মধ্যেও অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য—পৃথিবীতে প্রথম ছড়িয়ে পড়ার সময় মানুষের অবস্থা—প্রত্যেকটি জাতি একটিমাত্র জোড়া থেকে সৃষ্টি হয়নি—বিভিন্ন জাতির বিলুপ্তি—বিভিন্ন জাতির গঠন—বিভিন্ন জাতির সদস্যদের মধ্যে যৌনমিলনের ফল—জীবনের বিভিন্ন অবস্থাগত প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার সামান্য প্রভাব—প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাব খুবই সামান্য বা একেবারেই নেই—যৌন নির্বাচন।

তথাকথিত বিভিন্ন মানবজাতিকে নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হল, শ্রেণিবিভাজনগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে এদের মধ্যেকার তারতম্যের গুরুত্ব কতখানি আর কীভাবেই বা এই তারতম্যের সৃষ্টি হল, তা অনুসন্ধান করে দেখা। দুই বা ততোধিক সমগোত্রীয় জীবকে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হবে নাকি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হবে, প্রাণিতত্ত্ববিদরা তা নির্ধারণ করেন কতকগুলি বিষয়ের ভিত্তিতে। এগুলি হল—তাদের মধ্যে তারতম্যের পরিমাণ কতটা, এই তারতম্যগুলি শারীরিক কাঠামোর অল্প কয়েকটি অংশের ক্ষেত্রে দেখা যায় নাকি বহু অংশেই দেখা যায়, এগুলির কোনও শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব আছে কি না, আর সবচেয়ে বড় কথা, এগুলি অপরিবর্তনীয় কি না। জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অপরিবর্তনীয়তাকে প্রাণিতত্ত্ববিদরা অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করেন এবং সেটাই তাঁরা খোঁজার চেষ্টা করেন। যখনই দেখানো যায় বা এমন সম্ভাবনা থাকে যে কোনও জীব দীর্ঘসময় ধরে একইরকম রয়ে গেছে, তখন প্রজাতি হিসেবে তাকে প্রমাণ করতে অনেক সুবিধে হয়। আবার যে-কোনও দু-রকম জীব যদি প্রথম মিলনের পর প্রজননক্ষমতা এতটুকুও হারিয়ে ফেলে বা তাদের সন্তানদের মধ্যে প্রজননক্ষমতার অভাব দেখা দেয়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে সেটা আসলে তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যেরই নিশ্চিত প্রকাশ। তাছাড়া একই অঞ্চল নিয়মিত বসবাস করা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের জীব অবিমিশ্রিত থাকলে তা তাদের কিছুটা পরিমাণ পারস্পরিক প্রজননক্ষমতার অভাব কিংবা জন্তুদের ক্ষেত্রে পরস্পর জোড়বাঁধার ব্যাপারে বিমুখতার প্রমাণ হিসেবেই গণ্য হয়।

দুটি প্রজাতির মধ্যে যৌনমিলনের ফলে মিশ্রণের ব্যাপারটা ছাড়া, কোনও একটা অঞ্চলে ভালভাবে অনুসন্ধান করে যদি দেখা যায় যে দুটি নিকট সাদৃশ্যযুক্ত জীবের

সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনও ধরনের জীবের অস্তিত্ব সেখানে আদৌ নেই, তাহলে সেটা সম্ভবত তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে প্রতিভাত হয়। আর এটা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অপরিবর্তনীয়তার থেকেও স্বতন্ত্র একটি বিবেচনার বিষয়, কারণ দুটি জীব অত্যন্ত পরিবর্তনশীল হলেও তাদের উভয়ের মধ্যবর্তী কোনও জীব তারা না-ও সৃষ্টি করতে পারে। আবার, ভৌগোলিক সীমা-বিভাজনের কাজটি সবসময় যে সচেতনভাবে করা হয় তা নয়, বরং বেশিরভাগ সময়েই অসচেতনভাবে তা করা হয়ে থাকে। ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি অঞ্চলে বসবাসকারী জীবদের যেখানকার অন্য সব বাসিন্দাদের অধিকাংশই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত—দেখা হয় আলাদা প্রজাতি হিসেবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এটা তথাকথিত উন্নত বা উৎকৃষ্ট প্রজাতিদের থেকে ভৌগোলিক অঞ্চলগত জাতিগুলিকে পৃথক করার ব্যাপারে কোনও সাহায্যই করে না।

সাধারণভাবে স্বীকৃত এই নীতিগুলিকে এবার মানুষের বিভিন্ন জাতিগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা যাক। একজন প্রাণিতত্ত্ববিদ যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও প্রাণীকে দেখে থাকেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই মানুষকে দেখব আমরা। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ফারাক কতটা, তা বোঝার জন্য নিজেদের পর্যবেক্ষণ করার দীর্ঘদিনের অভ্যাস থেকে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করার যে চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করেছি আমরা, তার ওপর কিছুটা ভরসা রাখতেই হবে। এল্‌ফিন্‌স্টোন বলেছেন, ভারতবর্ষে গিয়ে প্রথম দর্শনেই কোনও ইউরোপিয়ানের পক্ষে সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলিকে আলাদা করে চেনা সম্ভব না হলেও, কিছুদিন পর থেকেই তিনি বুঝতে পারেন যে তাদের মধ্যে বিপুল বৈসাদৃশ্য আছে।[১] একইভাবে, কোনও হিন্দুর (ভারতীয়র) পক্ষেও ইউরোপিয়ান জাতিগুলির মধ্যেকার বৈষম্য প্রথম দর্শনেই বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। এমনকী অত্যন্ত স্বতন্ত্র মানবজাতিগুলির চেহারার মধ্যেও আশাতিরিক্ত সাদৃশ্য দেখা দেয়। ডঃ রল্‌ফ্‌স আমাকে লিখে জানিয়েছেন, তাছাড়া আমি নিজেও দেখেছি যে নিগ্রোদের কয়েকটি গোষ্ঠী বাদে বাকি প্রায় সব গোষ্ঠীর লোকদের দেখতে অনেকটা ককেশিয়ানদের মতো। প্যারিসের নৃতত্ত্ব বিষয়ক জাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন জাতির মানুষদের ছবি দেখে সহজেই এই সাদৃশ্য নির্ণয় করা যায়। এই ছবিগুলির অধিকাংশকেই ইউরোপিয়ানদের ছবি বলে মনে হয়। ছবিগুলি আমি যতজনকে দেখিয়েছি, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ জন তা-ই বলেছেন। কিন্তু ছবির ওইসব মানুষকে চোখের সামনে দেখলে তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্যই চোখে পড়বে। অর্থাৎ চামড়া ও চুলের রঙ, মুখাবয়বের সামান্য পার্থক্য এবং অভিব্যক্তি—এইসব বিষয় আমাদের বিচারকে অনেকটাই প্রভাবিত করে থাকে।

তবে এতে কোনও সন্দেহ নেই যে বিভিন্ন জাতিগুলিকে খুঁটিয়ে বিচার বা তুলনা

১। 'হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া', খণ্ড ১, পৃঃ ৩২৩। চৈনিকদের সম্বন্ধে ফাদার রিপা-ও একই কথা বলেছেন।

করলে তাদের একের সঙ্গে অপরের প্রচুর প্রভেদ চোখে পড়ে। যেমন, কেশবিন্যাসের ধরনে, শরীরের সমস্ত অংশের আপেক্ষিক অনুপাতের ক্ষেত্রে[২], ফুসফুসের ক্ষমতার ব্যাপারে, করোটির আকার ও আয়তনের ব্যাপারে, এমনকী মস্তিষ্কের ভাঁজের ক্ষেত্রেও।[৩] কিন্তু এইসব অসংখ্য পার্থক্যকে চিহ্নিত করা এক দুঃসাধ্য কাজ। তাছাড়া এই জাতিগুলি প্রত্যেকেই শারীরিক ক্ষমতা, নতুন জল-হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং নির্দিষ্ট কিছু রোগে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারেও পরস্পরের থেকে পৃথক। একইভাবে, তাদের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিও পৃথক। এই মানসিক তারতম্য মুখ্যত তাদের আবেগমূলক কাজের ক্ষেত্রেই দেখা যায় বটে, কিন্তু তাদের একের সঙ্গে অপরের বুদ্ধিমত্তারও কিছুটা পার্থক্য থাকে। যদি কারোর পক্ষে তুলনা করে দেখার সুযোগ ঘটে, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন দক্ষিণ আমেরিকার স্বল্পভাষী, বিষণ্ণ প্রকৃতির আদিবাসীদের সঙ্গে স্ফূর্তিবাজ, বাক্‌পটু নিগ্রোদের পার্থক্য কী বিপুল। ঠিক একইরকম পার্থক্য রয়েছে মালয়দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে পাপুয়ানদের, কিন্তু উভয়েই একই প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের বাসস্থানের মধ্যে ব্যবধান শুধু একফালি সমুদ্রের।

প্রথমে আমরা সেইসব যুক্তিকে পরখ করে দেখব যেগুলি বিভিন্ন মানব-জাতিকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবে ভাগ করার পক্ষে। তারপর বিচার করা যাবে বিপরীত যুক্তিগুলিকে। যদি কোনও প্রাণিতত্ত্ববিদ কখনও কোনও নিগ্রো, হটেন্‌টট, অস্ট্রেলীয় বা মঙ্গোলিয়ানকে না দেখে থাকেন এবং সেই না-দেখা অবস্থাতেই তাদের তুলনা করতে বসেন, তাহলে তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারবেন যে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে, তার মধ্যে কোনও কোনওটি হয়তো সামান্য, আবার কয়েকটি যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধান করলে তিনি হয়তো জানতে পারবেন যে তারা প্রত্যেকে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত এবং দৈহিক গঠন ও মানসিক ক্ষমতার ব্যাপারেও তারা একে অপরের থেকে আলাদা। এরপর যদি তাঁর সামনে ওইসব দেশ থেকে নমুনা হিসেবে কয়েকটি লোককে হাজির করা হয়, তাহলে তিনি নির্দ্বিধায় বলে দেবেন যে এরা হচ্ছে অন্য অনেক প্রজাতির মতোই এক-একটি প্রজাতি, এবং নিজের অভ্যাসমতো তাদের এক একটা নামকরণও করে ফেলবেন। যখন তিনি শুনবেন এইসব লোকজন বেশ কয়েকশো বছর ধরে একইরকম বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে, তখন তাঁর ওই সিদ্ধান্ত আরও জোরদার হয়ে উঠবে। ৪০০০

২। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ ও ইন্ডিয়ানদের সম্বন্ধে বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, 'ইন্‌ভেস্টিগেশন্‌স ইন দ্য মিলিটারি অ্যান্ড অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স অফ আমেরিকান সোল্‌জারস', লেখক—বি. এ. গোল্ড, ১৮৬৯, পৃঃ ২৯৮-৩৫৮; এবং 'অন দ্য ক্যাপাসিটি অফ দা লাংস', পৃঃ ৪৭১।

৩। উদাহরণস্বরূপ, মিঃ মার্শাল বর্ণিত জনৈক বুশ্‌ম্যান স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কের বিবরণ (দ্রষ্টব্য, 'ফিল. ট্রান্সাক্‌ট.', ১৮৬৪, পৃঃ ৫১৯)।

বছর আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে।[৪] ডঃ লুন্ড-এর মতো একজন চমৎকার গবেষকের কাছ থেকে তিনি আরও জানতে পারবেন যে ব্রাজিলের পার্বত্যগুহায় অনেক বিলুপ্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর করোটির সঙ্গে মানুষের যে-করোটি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আজকের দিনের গোটা আমেরিকা মহাদেশের মানুষদের করোটির অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে।

এবার হয়তো আমাদের এই প্রাণিতত্ত্ববিদটি বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় মানুষের ছড়িয়ে পড়ার দিকে মনোযোগ দেবেন, আর সম্ভবত বলে উঠবেন যে ওইসব মানুষেরা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির লোক, তাদের চেহারা আলাদা আলাদা রকম, এবং তারা প্রত্যেকেই গরম, স্যাঁতসেঁতে বা শুষ্ক অঞ্চলে ও উত্তর মেরুতে বাস করতে সক্ষম। তিনি হয়তো এ-কথাও বলতে পারেন যে মানুষের ঠিক পরের ধাপের প্রাণী, অর্থাৎ বনমানুষেরা, যেমন শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি চতুষ্পদীরা, কম উষ্ণতা বা জল-হাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না, আর মানুষের সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণীরা কখনওই খুব বয়স্ক হয়ে ওঠে না, অর্থাৎ বেশিদিন বাঁচে না, এমনকী ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতেও নয়। আগাসি-র জানানো তথ্যে তিনি হয়তো যথেষ্ট প্রভাবিতও হতে পারেন। আগাসি লক্ষ করেছিলেন যে বিভিন্ন মানব-জাতি পৃথিবীতে প্রাণীদের বসত-উপযোগী সেইসব অঞ্চলেই (zoological provinces) ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যেগুলি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রজাতি ও বর্গের বাসস্থান। মানব-জাতিগুলির মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান, মঙ্গোলিয়ান ও নিগ্রো জাতিকে দেখলে এই ধারণা স্পষ্ট হয়। হটেন্‌টটদের মধ্যেও এর কিছুটা ছাপ দেখা যায়। কিন্তু পাপুয়ান আর মালয়দেশের অধিবাসীদের বেলায় ঘটনাটা

৪। আবো-সিম্বেলের বিখ্যাত মিশরীয় গুহাগুলি থেকে প্রাপ্ত মনুষ্য-আকৃতি (figures) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মঁসিয়ে পাউসেট বলেছেন—অনেকেই দাবি করেন যে তাঁরা এখানে বারো কি তারও বেশি মানব-জাতির অস্তিত্বের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি (পাউসেট) তেমন কিছুই পাননি (দ্রঃ, 'দ্য প্লুর‍্যালিটি অফ দ্য হিউম্যান রেসেস', ইংরেজি অনুবাদ, ১৮৬৪, পৃঃ ৫০)। এমনকী অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনও কোনও জাতিকেও ততটা নিঃসন্দেহে সনাক্ত করা যায় না, যতখানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে ভেবে নেওয়া হয়। মিঃ নট ও মিঃ গ্রিডন জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বা দ্য গ্রেট র‍্যামেসিস-এর চেহারা ছিল অনেকটাই ইউরোপীয়দের মতো (দ্রঃ, 'টাইপ্‌স অফ ম্যান্‌কাইন্ড', পৃঃ ১৪৮)। অন্যদিকে, মানুষের বিভিন্ন জাতির পৃথক পৃথক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আর-এক প্রবক্তা মিঃ নক্স-ও তরুণ মেম্‌নন (মিঃ বার্চ-এর কাছ থেকে যতদূর শোনা, তাতে মনে হয় ইনিই পরে দ্বিতীয় র‍্যামেসিস হয়েছিলেন) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ঠিক অ্যানতোর্পের ইহুদিদের মতো। আবার আমি নিজে যখন তৃতীয় অ্যামুনক-এর মূর্তিটি পরিদর্শন করি, তখন সেখানকার যথেষ্ট অভিজ্ঞ দুজন কর্মকর্তার সঙ্গে এ-ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম যে তৃতীয় অ্যামুনকের চেহারা অনেকটাই নিগ্রোদের মতো। কিন্তু মিঃ নট ও মিঃ গ্রিডন তাঁকে একজন বর্ণসংকর বলে মনে করলেও তাঁর মধ্যে 'নিগ্রোরক্ত' ছিল বলে মনে করেন না।

সহজেই চোখে পড়ে। মিঃ ওয়ালেস দেখিয়েছেন যে এরা প্রায় সেভাবেই বিভক্ত যেভাবে বিভক্ত মালয় আর অস্ট্রেলিয়ার জীবজন্তুদের বসত-উপযোগী অঞ্চল। কিন্তু আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা (রেড ইন্ডিয়ান) সারা মহাদেশ জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাপারটা আমাদের উপরোক্ত প্রতিপাদ্যের বিরোধী। কেননা উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যে ফারাক অনেকটাই। তথাপি, আমেরিকার বৃক্ষবাসী অপোসাম্-দের মতো কিছু জীব এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় অবাধে, অতীতে যেমনভাবে ঘুরে বেড়াত বিশালাকৃতি কিছু দন্তহীন স্তন্যপায়ী প্রাণী। উত্তর মেরুর অন্যান্য প্রাণীদের মতো এস্কিমোরাও সারা মেরুপ্রদেশ জুড়ে তাদের বসতি স্থাপন করেছে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, প্রাণীদের বসত-উপযোগী বিভিন্ন অঞ্চলের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেকার পার্থক্যের পরিমাণ এস্কিমোদের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার মাত্রার অনুরূপ নয়। কাজেই আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের যতটা পার্থক্য, মানুষের অন্যান্য জাতিগুলির থেকে নিগ্রোদের পার্থক্য যে তার চেয়ে বেশি এবং আমেরিকানদের পার্থক্য যে অনেক কম—এটা মোটেই কোনও আশ্চর্য ঘটনা নয়। এর সঙ্গে আরও বলা যায় যে মানুষ তার আদিম অবস্থায় কোনও সামুদ্রিক দ্বীপে বসতি গড়ে তোলেনি এবং এ-ব্যাপারে তার শ্রেণিভুক্ত অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের কোনও পার্থক্য নেই।

একই প্রকার গৃহপালিত জীবজন্তুদের যে বিভিন্ন রূপের কথা ভাবা হয়, সেগুলিকে সেইভাবেই শ্রেণিবিন্যস্ত করা হবে নাকি পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হবে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ কোনও স্বতন্ত্র বন্য প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে কিনা, তা নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রত্যেক প্রাণিতত্ত্ববিদই এইসব প্রাণীদের শরীরে পৃথক পৃথক ধরনের বহিঃস্থ-পরজীবী আছে কি না, তার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন। এই ব্যাপারটার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কেননা এটা খুবই জরুরি বিষয়। মিঃ ডেনি আমাকে জানিয়েছেন যে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ধরনের কুকুর, মুরগি ও পায়রারা একই প্রজাতির পরজীবী কীট (pediculi) বা উকুনের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মিঃ এ. ম্যুরে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতের মানুষের শরীর থেকে সংগৃহীত পরজীবী কীট নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন—তারা শুধু বর্ণের দিক দিয়েই আলাদা আলাদা নয়, তাদের বহিরাবরণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। নানা ধরনের পরজীবীদের নিয়ে বারবার পরীক্ষা করে দেখা গেছে সব ক্ষেত্রেই তাদের পার্থক্য একইরকম। প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি মাছ ধরার একটি জাহাজের শল্যচিকিৎসক আমাকে জানিয়েছিলেন, একবার স্যান্ডউইচ দ্বীপের কিছু অধিবাসী জাহাজে উঠলে তাদের শরীরের পরজীবী কীটেরা ইংরেজ নাবিকদের শরীরেও ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং তিন-চার দিনের মধ্যেই তাদের মৃত্যু হয়েছিল। এই পরজীবী কীটেরা ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এবং দক্ষিণ আমেরিকার চিলির অধিবাসীদের শরীরে যে-সব পরজীবী কীট দেখা যায়, তাদের

থেকে এদের চেহারা আলাদা রকমের ছিল। চিলির এই পরজীবী কীটের কিছু নমুনা আমাকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে এরা ইউরোপের উকুনদের থেকে আয়তনে অনেক বড় এবং এদের দেহ অনেক নরম। মিঃ ম্যুরে আফ্রিকা থেকে চার রকমের পরজীবী কীট (বা উকুন) সংগ্রহ করেছেন। এদের মধ্যে দু-রকম উকুন পাওয়া গেছে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের নিগ্রোদের শরীর থেকে আর বাকি দু-রকম পাওয়া গেছে হটেন্‌টেট ও কাফ্রি জাতির মানুষদের শরীর থেকে। তাছাড়া তিনি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের শরীর থেকে দু-রকম, উত্তর আমেরিকা থেকে দু'রকম এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে দু-রকম পরজীবী কীটও সংগ্রহ করেছেন। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রটিতে ধরে নেওয়া যায়, পরজীবী কীটের দল বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকেই জন্ম নিয়েছে। পোকামাকড়দের ক্ষেত্রে সামান্য আকৃতিগত তারতম্য যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পরজীবী কীটের দ্বারা মানব-জাতিগুলির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা থেকে এই যুক্তি দাঁড় করানো যায় যে মানব-জাতিগুলি আসলে এক-একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি।

আমাদের কল্পিত প্রাণিতত্ত্ববিদ মহাশয় নিশ্চয়ই এই অবধি অনুসন্ধান করার পর খুঁজতে শুরু করবেন মানুষের বিভিন্ন জাতির একের সঙ্গে অপরের যৌনমিলনের পর তারা কিছুটা বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে কি না। তিনি সম্ভবত অধ্যাপক ব্রকা-র মতো একজন সুবিবেচক ও দার্শনিকের রচনাপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন, আর তাহলে জানতে পারবেন যে কিছু কিছু মানব-জাতি অন্য মানব-জাতিদের সঙ্গে যৌনমিলনে অটুট প্রজননক্ষমতার অধিকারী হলেও বাকিদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা ঠিক বিপরীত। জানা গেছে, অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়ার আদিবাসী স্ত্রীলোকরা ইউরোপীয় পুরুষদের সঙ্গে মিলনে ক্বচিৎ সন্তান প্রসব করে। অবশ্য এ-বিষয়ের প্রমাণগুলি এখন প্রায় অর্থহীন বলেই প্রতিভাত হয়েছে। কারণ বিশুদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গরা মিশ্রবর্ণের শিশুদের মেরে ফেলে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিবরণ থেকে জানা গেছে, এগারোটি মিশ্রবর্ণের শিশুকে একই সঙ্গে হত্যা করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং পুলিশ তাদের মৃতদেহের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছে।[৫] আবার অনেক সময় বলা হয় যে শ্বেতকায় ও নিগ্রোদের সংসর্গজাত ব্যক্তিরা (mulattoe) অসবর্ণ বিবাহ করলে বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। অন্যদিকে,

---

৫। দ্রঃ, মিঃ টি. এ. ম্যুরে-র চিঠি, 'অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল রিভিউ', এপ্রিল ১৮৬৮, পৃঃ ৫৩। এই চিত্তাকর্ষক চিঠিটিতে কাউন্ট স্ট্রেজেলেকির বক্তব্যকে ভুল বলে প্রমাণ করেছেন তিনি। কাউন্ট স্ট্রেজেলেকি বলেছিলেন, যে-সব অস্ট্রেলিয়ান স্ত্রীলোক শ্বেতাঙ্গদের সন্তান ধারণ করত, তারা পরে স্বজাতের সঙ্গে মিলনের সময় তাদের প্রজননক্ষমতা হারিয়ে ফেলত। মঁসিয়ে এ.দা কাত্রেফাজ-ও প্রচুর তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে অস্ট্রেলিয়ান ও ইউরোপিয়ানদের মিলনে কারোরই প্রজননক্ষমতা নষ্ট হয় না (দ্রঃ, 'রেভ্যু দে কুর সাঁইতিফিক', মার্চ ১৮৫৯, পৃঃ ২৩৯)।

চার্লস্টনের ডঃ বাখ্ম্যান সুনিশ্চিত ভাবে বলেছেন যে তিনি শ্বেতকায় ও নিগ্রোর সংসর্গজাত এমন কিছু পরিবারের কথা জানেন যারা কয়েক পুরুষ ধরে অসবর্ণ বিবাহ করে আসছে এবং বিশুদ্ধ সাদা (ইউরোপীয়) বা বিশুদ্ধ কালো মানুষদের (নিগ্রো) সমান হারেই সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। এর আগে স্যর সি. লাইয়েলও এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং আমাকে জানিয়েছিলেন।[৬] ডঃ বাখ্ম্যানের মতে, ১৮৫৪ সালে আমেরিকায় যে লোকগণনা হয়েছিল, তাতে শ্বেতকায় ও নিগ্রোদের সংসর্গজাত ৪০৫৭৫১ জন ব্যক্তির নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল। প্রকৃত ঘটনার তুলনায় সংখ্যাটা নেহাতই কম। এর আংশিক কারণ হয়তো তাদের মর্যাদাহীন ও বিশৃঙ্খল অবস্থা, এবং আর-একটা কারণ হয়তো স্ত্রীলোকদের অসৎ চরিত্র। নিগ্রোদের মধ্যে কিছুসংখ্যক সংকর জাতির অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলে। ফলে তাদের সংখ্যা আপাতভাবে হ্রাস পায়। এই সংকর জাতিদের প্রাণশক্তি অপেক্ষাকৃত কম হওয়াটাকে একটি নির্ভরযোগ্য রচনায় একটা সুবিদিত ব্যাপার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ব্যাপারটা যদিও তাদের দুর্বল প্রজননশক্তির থেকে স্বতন্ত্র একটা ব্যাপার, তথাপি এটাকে তাদের বাবা-মায়ের জাতির বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ বলে মনে করা যায়।[৭] সংকর প্রাণী ও সংকর উদ্ভিদরা যখন একবারে পৃথক পৃথক প্রজাতির মিলনের ফলে সৃষ্টি হয়, তখন সাধারণত অকালমৃত্যুর শিকার হয় তারা। কিন্তু এই সংকর জাত মুলাটোদের বাবা-মাদের একেবারে পৃথক পৃথক প্রজাতির সদস্য বলে মনে করা যায় না। সাধারণ জাতের খচ্চররা দীর্ঘ জীবন ও অটুট প্রাণশক্তির জন্য বিখ্যাত, অথচ তাদের জননক্ষমতা খুবই কম। এ থেকে বোঝা যায় যে সংকর জাত প্রাণীদের দুর্বল প্রজননক্ষমতা ও জীবনীশক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক নিতান্তই ক্ষীণ। এ-রকম অনেক ঘটনাই দৃষ্টান্তস্বরূপ হাজির করা যায়।

এমনকী যদি পরে প্রমাণ করা যায় যে সমস্ত মানব-জাতিগুলিরই যথেষ্ট প্রজনন-ক্ষমতা ছিল, তাহলে অন্যান্য কারণের ভিত্তিতে যিনি তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বলে

৬। ডঃ রল্ফ্স আমাকে জানিয়েছেন, তিনি সাহারায় যে-সব সংকর জাতি দেখেছিলেন, তারা আরব, বার্বার ও তিনটি গোষ্ঠীর নিগ্রো জাতির মিলনে উৎপন্ন, অথচ প্রতিটি জাতিই অসম্ভবরকম প্রজননক্ষমতা সম্পন্ন। অন্যদিকে, মিঃ উইন্উড রিড আমাকে জানিয়েছেন, গোল্ড কোস্টের নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গ ও সংকরজাত লোকেদের পছন্দ করলেও, প্রবাদবাক্যের মতো মেনে চলে যে সংকরজাত লোকেদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করা উচিত নয়, তাহলে ছেলেমেয়ে কম হবে এবং তারা দুর্বল হবে। মিঃ রিড-এর মতে, নিগ্রোদের এই বিশ্বাস একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়, কারণ শ্বেতাঙ্গরা গোল্ড কোস্ট-এ দীর্ঘ চারশো বছর ধরে বসবাস করছে, ফলে নিগ্রোরা তাদের অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট সময় পেয়েছে।

৭। দ্রঃ, 'মিলিটারি অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল স্ট্যাটিসটিকস অফ আমেরিকান সোলজারস', বি. এ. গোল্ড, ১৮৬৯, পৃঃ ৩১৯।

চিহ্নিত করতে চান, তিনি অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বলতে পারেন যে প্রজননক্ষমতা ও বন্ধ্যাত্ব মোটেই সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের উপযুক্ত মাপকাঠি নয়। আমরা জানি যে এই বৈশিষ্টগুলি জীবনের পরিবর্তিত অবস্থার দ্বারা বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে মিলনের ফলে সন্তান উৎপাদনের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় এবং এগুলির পিছনে কাজ করে অত্যন্ত জটিল কিছু নিয়ম। যেমন, দেখা যায় একই ধরনের দুটি প্রজাতির দুটি বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীরা যখন পরস্পরের সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হয়, তখন তাদের উভয় প্রজাতির প্রজননক্ষমতা সর্বদা সমান হয় না। প্রাণীদের মধ্যে যাদেরকে নিঃসন্দেহে প্রজাতি বলা হয়, তাদের মধ্যে এক প্রজাতির সঙ্গে অপর প্রজাতির মিলনে উদ্ভূত প্রাণীদের মধ্যে একেবারে বন্ধ্যা থেকে শুরু করে দারুণ প্রজননশক্তি সম্পন্ন সব ধরনই দেখা যায়। তবে, বন্ধ্যাত্বের মাত্রা বাবা-মায়ের বাহ্য-আকৃতি বা আচার-আচরণের মধ্যেকার তারতম্যের মাত্রার ওপর নির্ভর করে না। অনেক ব্যাপারেই মানুষকে দীর্ঘকাল ধরে গৃহপালিত জীবজন্তুদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এবং প্যালাসিয়ান্ মতবাদের[৮] স্বপক্ষে

৮। দ্রঃ, 'দ্য ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যাল্স অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন', খণ্ড ২, পৃঃ ১০৯। পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই যে অন্যদের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্রে প্রাণীর প্রজনন-বন্ধ্যাত্ব কোনও বিশেষভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্য নয়। এটা অনেকটা কিছু উদ্ভিদের পরস্পরের সঙ্গে কলম বাঁধতে না-পারার অক্ষমতার মতোই একটা ঘটনা, অর্থাৎ অন্যান্য কতকগুলি অর্জিত পার্থক্যের সঙ্গে এর কোনও তফাত নেই। এই পার্থক্যগুলির প্রকৃতি ঠিক কী জানা যায় না, তবে এগুলি শারীরিক বা মানসিক গঠনের পার্থক্যগুলির ক্ষেত্রে ততটা দেখা যায় না, যতটা দেখা যায় জননব্যবস্থার ক্ষেত্রে। সংকর প্রজাতিগুলির প্রজনন-অক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল এই যে, এরা উভয়েই বা এদের মধ্যে কোনও-একটি প্রজাতি দীর্ঘদিন ধরে একই অবস্থার মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত। কারণ আমাদের জানা আছে যে পরিবর্তিত অবস্থা জননক্রিয়ার ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে, এবং যথেষ্ট সঙ্গতভাবেই আগে যেমন বলা হয়েছে তা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে গৃহপালিত জীবনের নানান ওঠা-নামা সেই বন্ধ্যাত্বদশা দূর করে দেয়, যা বনে-জঙ্গলে থাকার সময় বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মিলনের ক্ষেত্রে একান্তই স্বাভাবিক ছিল। অন্যত্র আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি (ওই একই গ্রন্থের ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫ এবং 'অরিজিন অফ স্পিসিস', ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৩১৭), সংকর প্রজাতিগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এই বন্ধ্যাত্ব অর্জন করে না। যখন দুটি প্রাণীর প্রজননক্ষমতা আগে থেকেই খুব কম থাকে, তখন তাদের এই অক্ষমতা যে আরও বেশি বন্ধ্যাত্বযুক্ত প্রাণীদের, অর্থাৎ তাদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে ক্রমাগত বেড়েই চলবে, তা বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রাণীদের বন্ধ্যাত্ব যত বেড়ে চলে, তাদের সন্তানের সংখ্যাও ততই কমে আসে, এবং অবশেষে দীর্ঘ সময় অন্তর ক্বচিৎ একটি-দুটি বাচ্চা হয়। কখনও-কখনও অবশ্য প্রজননক্ষমতা এর চেয়েও তীব্র সঙ্কটের মুখে পড়ে। মিঃ পার্টনার ও মিঃ কলরোটার উভয়েই দেখিয়েছেন যে অনেকগুলি প্রজাতিভুক্ত উদ্ভিদ বর্গের মধ্যে এমন একটা বিন্যাস দেখা যায়, যার মধ্যে অন্য প্রজাতির সঙ্গে মিলনের ফল হিসেবে অতি অল্প সংখ্যক বীজ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ থেকে শুরু একেবারে কোনও বীজের জন্ম দেয় না অথচ অন্য প্রজাতিটির পরাগের দ্বারা প্রভাবিত হয় (যা পরিস্ফুট হয় বীজকোষের স্ফীতির মধ্যে)—এমন উদ্ভিদও আছে। এক্ষেত্রে, ইতিমধ্যেই বীজ উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া কোন্ কোন্ উদ্ভিদ অধিকতর প্রজনন-অক্ষম, তা নির্ধারণ করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই, প্রজনন-অক্ষমতার চূড়ান্ত স্তরটি, অর্থাৎ যখন শুধুমাত্র বীজকোষটিই প্রভাবিত হয়, তা

একরাশ প্রমাণ হাজির করা যায়। এই মতবাদে বলা হয়, প্রকৃতির মধ্যে খোলামেলা অবস্থায় বিভিন্ন প্রজাতির একের সঙ্গে অপরের মিলনের ফলস্বরূপ যে বন্ধ্যাত্বদশা খুবই স্বাভাবিক, গৃহপালিত হওয়ার পর সেটা ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে। সুতরাং এইসব বিচার-বিবেচনা করে সঙ্গতভাবেই বলা যায়—ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যৌনমিলনের ফলে সৃষ্ট মানব-জাতিগুলির মধ্যে পূর্ণ প্রজননক্ষমতা বজায় থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলেও তা তাদেরকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারে না।

প্রজননক্ষমতার কথা ছাড়াও, সংকর জাতের সন্তানসন্ততির মধ্যে যে-সব বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, তা দিয়েই বিচার করা হয় তাদের বাবা-মাকে আলাদা আলাদা প্রজাতির সদস্য বলে ধরা হবে নাকি একই প্রজাতির দু'টি আলাদা বর্গের সদস্য বলে ধরা হবে। কিন্তু এ-বিষয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর আমার মনে হয়েছে এই ধরনের কোনও সাধারণ নিয়ম থাকতে পারে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংকর জাতের ছেলেমেয়েরা হয় বাবার মতো, নয়তো মায়ের মতো দেখতে হয়। এই ব্যাপারটা সাধারণত তখনই দেখা যায়, যখন বাবা-মার বৈশিষ্ট্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই পার্থক্যগুলি গড়ে ওঠে কোনও আকস্মিক রূপান্তর বা অস্বাভাবিকতা হিসেবেই। এখানে এ-কথা বলার কারণ হল, ডঃ রল্‌ফ্‌স আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই দেখেছেন নিগ্রো জাতির মানুষদের সঙ্গে অন্য জাতির মিলনের ফলে জন্ম নেওয়া ছেলেমেয়েরা হয় সম্পূর্ণ কালো, নয়তো সম্পূর্ণ সাদা, এবং ক্বচিৎ মিশ্রবর্ণের হয়। অন্যদিকে, আমেরিকায় সাদা-কালো মানুষদের মিলনজাত ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই দুই বর্ণের মধ্যবর্তী কোনও-একটা বর্ণ ও চেহারাবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে একজন প্রাণিতত্ত্ববিদ সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন মানব-জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে মনে করতে পারেন। কারণ তিনি দেখেছেন তাদের আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে অসংখ্য পার্থক্য, আর এইসব পার্থক্যের মধ্যে কোনও কোনওটি যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এই পার্থক্যগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থাতেই রয়ে গেছে। আবার সমগ্র মানবজাতিকে একটিমাত্র প্রজাতি হিসেবে ধরে নিলে তার বিপুল বিস্তার দেখেও আমাদের প্রাণিতত্ত্ববিদরা কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়বেন, কারণ স্তন্যপায়ী শ্রেণির আর কোনও প্রাণীই এত বিশাল অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তথাকথিত বিভিন্ন জাতির ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়া দেখেও হয়তো তিনি বিস্ময় বোধ করবেন। মানুষের এই ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা ঠিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রজাতিগুলির ছড়িয়ে পড়ার মতোই। আর অবশেষে তিনি হয়তো দাবি করবেন, পারস্পরিক মিলনে সমস্ত জাতিগুলির

প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত অর্জিত হতে পারে না। প্রজনন-অক্ষমতার এই চূড়ান্ত স্তরটি এবং এই অক্ষমতার অন্যান্য ধাপগুলিও হচ্ছে যৌনমিলনে লিপ্ত প্রজাতিগুলির জননব্যবস্থার গঠনের মধ্যেকার কিছু অজানা পার্থক্যেরই স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র।

প্রজননক্ষমতার বিষয়টি এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি প্রমাণিত হয়নি এবং সেটা প্রমাণ করা গেলেও সেটাকে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ বলে ধরা যায় না।

অন্যদিকে, আমাদের এই প্রাণিতত্ত্ববিদ মহাশয় যদি একটু খোঁজখবর করতেন যে একই দেশের মধ্যে নানা ধরনের মানুষরা বিপুল সংখ্যায় মিলেমিশে যাওয়ার পরও মানুষের আকার সাধারণ কোনও প্রজাতির মতো স্বতন্ত্রই থাকে কি না, তাহলে তিনি জানতে পারতেন যে তা আদৌ সম্ভব নয়। ব্রাজিলের দিকে চোখ রাখলে তিনি দেখতে পাবেন সেখানে নিগ্রো ও পর্তুগিজদের থেকে বিশাল এক সংকর-জনতা সৃষ্টি হয়েছে। চিলি এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের প্রায় সমস্ত মানুষই ইন্ডিয়ান ও স্প্যানিশদের সংসর্গজাত সংকর। অবশ্য মিশ্রণের পরিমাণে অনেক তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়।[৯] তাছাড়া ওই মহাদেশের বহু অংশে তিনি এমন এক জটিল সংকর শ্রেণির মানুষের দেখা পাবেন, যারা নিগ্রো, ইন্ডিয়ান ও ইউরোপীয়—এই তিন জাতির মিশ্রণজাত সংকর মানুষ। উদ্ভিদজগৎকে উদাহরণ হিসেবে ধরলে দেখা যাবে, এ-ধরনের ত্রি-সংকরায়ণের মধ্যেই তাদের মূল রূপগুলির পারস্পরিক প্রজননক্ষমতার সবথেকে ভাল প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে তিনি এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাবেন, যা সৃষ্টি হয়েছে পলিনেশীয় ও ইংরেজ রক্তের মিশ্রণের ফলে। ফিজি দ্বীপপুঞ্জে তিনি যে সংকর-জাতির দেখা পাবেন তারা হচ্ছে পলিনেশীয় ও নিগ্রোদের মিশ্রণজাত। এ-রকম ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানব-জাতিগুলি পরস্পরের থেকে এতটা পৃথক নয় যাতে করে তারা একই অঞ্চলে বসবাস করেও পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত না হয়ে থাকতে পারে এবং মিশ্রণ না ঘটলে সেটা তাদের নির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবেই প্রতিভাত হয়।

সমস্ত জাতির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগুলি যে ভীষণরকম পরিবর্তনশীল তা অনুভব করার পর আমাদের প্রাণিতত্ত্ববিদটি আবারও বিব্রত হয়ে পড়বেন। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ব্রাজিলের নিগ্রো দাসদের যিনি প্রথম দেখছেন, তাঁকে এ-ব্যাপারটি নাড়া দিতে বাধ্য। এই একই কথা বলা চলে পলিনেশীয় এবং আরও অনেক জাতি সম্বন্ধে। এমন কোনও বৈশিষ্ট্য আছে কি না, যা শুধু একটি জাতিরই একান্ত নিজস্ব এবং অপরিবর্তনীয়, তাতে সন্দেহ আছে। এমনকী একই গোষ্ঠীভুক্ত বন্য মানুষদের সকলের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না, অথচ অনেকেই জোরগলায় বলে থাকেন যে এদের সকলকার মধ্যে একইরকম বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। হটেন্‌টট জাতির স্ত্রীলোকদের মধ্যে এমন কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেগুলি

৯। ব্রাজিলের পলিস্তা জাতির সাফল্য ও কর্মোদ্দীপনার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন মঁসিয়ে দ্য কাত্রেফাজ (দ্রঃ, 'অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল রিভিউ', জানুয়ারি ১৮৬৯, পৃঃ ২২)। এরা হচ্ছে পর্তুগিজ ও ইন্ডিয়ানদের মিলনের ফলে সৃষ্ট বর্ণসংকর জাতি। সেইসঙ্গে অন্যান্য কিছু জাতির রক্তও এদের শরীরে বিদ্যমান।

ঠিক সেইভাবে অন্য জাতির স্ত্রীলোকদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু তাদের এই বৈশিষ্ট্যও কোনও অপরিবর্তনীয় ব্যাপার নয়। অনেক আমেরিকান গোষ্ঠীর সদস্যদের গাত্রবর্ণ ও শরীরের রোমশতা পরস্পরের থেকে যথেষ্ট আলাদা আলাদা হয়। আবার আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে পরস্পরের থেকে গাত্রবর্ণের ক্ষেত্রে কিছুটা এবং মুখাবয়বের ক্ষেত্রে অনেকটাই পার্থক্য চোখে পড়ে। কোনও কোনও জাতির মধ্যে আবার করোটির গড়নে যথেষ্ট তফাত দেখা যায়।[১০] অন্যান্য নানান বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও এ-রকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সব প্রাণিতত্ত্ববিদই এখন অনেক ঠেকে শিখেছেন যে পরিবর্তনশীল কিছু বৈশিষ্ট্যকে সম্বল করে বিভিন্ন প্রজাতিকে চিহ্নিত করাটা স্রেফ গোঁয়ার্তুমি। তবে, মানব-জাতিগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বলে মনে করার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো যুক্তিটা হচ্ছে এই যে, তারা একে অপরের সঙ্গে মিশে যায় এবং সেই মিশ্রণটা বহু ক্ষেত্রেই তাদের পারস্পরিক যৌনমিলন ব্যতিরেকেই ঘটে থাকে। অন্য যে-কোনও প্রাণীর থেকে মানুষকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা সত্ত্বেও তাকে একটিমাত্র প্রজাতি বা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হবে কি না, তা নিয়ে সুযোগ্য বিচারকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন দুটি (ভিরে), কেউ বলেন তিনটি (জ্যাকিনো), কেউ বলেন চারটি (কান্ট), কেউ পাঁচ (ব্লুমেন্‌বাখ), কেউ-বা ছ'টি (মিঃ বাফন), সাতটি (হান্টার), আটটি (আগাসি), এগারোটি (পিক্যারিং), কারও মতে পনেরোটি (বরিসেন্ট ভিন্‌সেন্ট), ষোলোটি (ডেম্‌মোটলিন্‌স্‌), বাইশটি (মর্টন), ষাটটি (ক্রফার্ড) এবং বার্কের মতে তেষট্টিটি। অবশ্য এই মতপার্থক্যের দরুন জাতিগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত হওয়া আটকায় না, কিন্তু এ থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা একে অপরের সঙ্গে মিশে যায় এবং তাদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব।

নানা ধরনের জীবের বিশদ বিবরণ জানার চেষ্টা করেছেন যে-সব প্রাণিতত্ত্ববিদ, তাঁদের প্রত্যেককেই মানুষের বিবরণের মতো অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে (নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি), আর সতর্ক স্বভাবের প্রাণিতত্ত্ববিদরা পরস্পরের মধ্যে মিশে যাওয়া সমস্ত জীবকে একটিমাত্র প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত না করে পাবেন না। কারণ যে-সব জীবকে তিনি সনাক্তই করতে পারছেন না, তাদের নামকরণ করার অধিকারই বা তিনি কোথায় পাবেন? এ-ধরনের ঘটনা চোখে পড়ে বানরদের কিছু বর্গের ক্ষেত্রে, যার মধ্যে মানুষও পড়ে। আবার সারকোপিথেকাস জাতীয় বর্গের বানরদের অধিকাংশ প্রজাতিকে সুনিশ্চিতভাবেই চিহ্নিত করা যায়। অন্যদিকে, আমেরিকার সেবুস বর্গের বানরদের বিভিন্ন ধরনগুলিকে কিছু প্রাণিতত্ত্ববিদ

১০। যেমন দেখা যায় আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে। অধ্যাপক হাক্সলি বলেছেন (দ্রঃ, 'ট্রানজাকশনস অফ ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ প্রিহিস্টোরিক আর্কিওলজি', ১৮৬৮, পৃঃ ১০৫), দক্ষিণ জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের অনেক অধিবাসীর করোটি 'ঠিক তাতারদের করোটির মতোই ছোট এবং চওড়া' ইত্যাদি।

চিহ্নিত করেছেন পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবে, আবার অন্যদের মতে এরা বিভিন্ন ভৌগোলিক জাতি মাত্র, স্বতন্ত্র প্রজাতি নয়। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যদি বেশ কিছু সেবুস জাতীয় বানর সংগ্রহ করে আনা যেত, তাহলে দেখা যেত যে তারা একটু একটু করে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, আর তখন তাদের নিছক কিছু পরিবর্তিত ধরন বা জাতি ছাড়া অন্য কিছু বলা যেত না। মানুষের বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গে অধিকাংশ প্রাণিতত্ত্ববিদ এই একই নীতি অনুসরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও, স্বীকার করতেই হবে যে অন্তত উদ্ভিদজগতে[১১] এমন কিছু নমুনা দেখা যায়, যাদের ভিন্ন প্রজাতি না বলে উপায় নেই। অবশ্য তারা (ওইসব উদ্ভিদরা) পারস্পরিক মিলন ব্যতীতই একে অপরের সঙ্গে অসংখ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত।

সম্প্রতি কিছু প্রাণিতত্ত্ববিদ কোনও কোনও জীবের ক্ষেত্রে 'উপ-প্রজাতি' শব্দটি ব্যবহার করছেন। তাঁদের যুক্তি হল—এদের অনেক বৈশিষ্ট্যই প্রকৃত প্রজাতির মতো হলেও এদেরকে পুরোপুরি প্রজাতির মর্যাদা দেওয়া যায় না। এখন মানুষের বিভিন্ন জাতিকে প্রজাতির মর্যাদা দেওয়া আর পাশাপাশি তাদেরকে সঠিকভাবে সনাক্ত করার অনতিক্রম্য সমস্যার ব্যাপারে ওপরে যে-সব জোরালো যুক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি, তার আলোতে বিচার করে দেখলে মনে হয় এক্ষেত্রে এই 'উপ-প্রজাতি' শব্দটি খুবই লাগসই। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাসের দরুন 'জাতি' শব্দটিকে সম্ভবত এত সহজে তুলে দেওয়া যাবে না। একই পরিমাণ পার্থক্যের জন্য সর্বক্ষেত্রে যথাসম্ভব একই শব্দ ব্যবহার করাটাই কাম্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত খুব কম সময়েই তা করা যায়। কারণ প্রাণীদের বড় মাপের বর্গ বা মহাজাতি সাধারণত নিকট সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণীদের নিয়েই গড়ে ওঠে, ফলে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাও খুব কঠিন কাজ। অন্যদিকে, একই গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র বর্গের মধ্যে থাকে এমন সব জীব, যাদের মধ্যেকার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই এদের সকলকেই প্রজাতির মর্যাদা দেওয়া উচিত। আবার, বৃহৎ কোনও বর্গের অন্তর্গত প্রজাতিগুলির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঠিক একইরকম সাদৃশ্য থাকে না। বরং বিপরীতে তাদের কোনও কোনও প্রজাতিকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে অন্য প্রজাতিগুলির চারপাশে বিন্যস্ত করা যায়—ঠিক যেন গ্রহের চারদিকে উপগ্রহ। মানবজাতি কি একটিমাত্র প্রজাতি, নাকি অনেকগুলি প্রজাতি, নাকি অনেকগুলি প্রজাতির সমন্বয়—সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এ-প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজতে নৃতত্ত্ববিদরা বিস্তর আলোচনা চালিয়েছেন। স্পষ্টতই তাঁরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন—এক-প্রজাতির সমর্থক ও বহু-প্রজাতির সমর্থক। বিবর্তনবাদে যাঁরা বিশ্বাসী নন, তাঁরা প্রজাতিগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্ট জীব বলে কিংবা কোনও-না-কোনও ভাবে স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করেন। অন্যান্য জীবকে প্রজাতি হিসেবে

১১। অধ্যাপক নাজেলি তাঁর 'Botanische Mittheilungen' গ্রন্থের খণ্ড ২, পৃঃ ২৯৪-৩৬৯-তে এ-রকম বেশ কিছু ঘটনার কথা বিবৃত করেছেন। উত্তর আমেরিকার কিছু উদ্ভিদের অন্তর্বর্তী রূপ সম্বন্ধে একই কথা বলেছেন আসা গ্রে।

চিহ্নিত করার জন্য সাধারণত যে-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তাঁদের স্থির করতে হবে কোন্ কোন্ ধরনের মানুষকে তাঁরা প্রজাতি বলবেন। কিন্তু যতক্ষণ না 'প্রজাতি' শব্দটির একটি সর্বসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ এ ধরনের প্রয়াস অর্থহীন। মানুষের জন্মের মতো কোনও অনির্ণীত বিষয়কে এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। দেখা যায়, নির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞা ছাড়াও আমরা স্থির করে ফেলতে চেষ্টা করি কিছু সংখ্যক বাড়ির সমষ্টিকে গ্রাম, শহর না নগর—কী বলা হবে। যে-সব নিকট সাদৃশ্যযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী, পক্ষী, কীটপতঙ্গ আর উদ্ভিদ যথাক্রমে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে দেখা যায়, তাদেরকে প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না ভৌগোলিক জাতি হিসেবে—এ এক চিরন্তন সমস্যা, আর এর মধ্যে আমাদের উপরোক্ত সমস্যারই একটা নজির খুঁজে পাওয়া যায়। কোনও মহাদেশের সামান্য দূরে অবস্থিত বহু দ্বীপের উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

অন্যদিকে, যে-সব প্রাণিতত্ত্ববিদ বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী (এখন এঁদের সংখ্যাই বেশি), তাঁরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে মানুষের সমস্ত জাতিগুলি একটি আদিম বংশ থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে। এইসব জাতির মধ্যেকার পার্থক্যের মাত্রা বোঝানোর জন্য তাদেরকে তাঁরা স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করবেন কি না, সেটা আলাদা ব্যাপার। আমাদের গৃহপালিত বা পোষ-মানা বিভিন্ন জাতের জীবজন্তুরা একটিই প্রজাতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে না একাধিক প্রজাতি থেকে—সে-প্রশ্নটা একটু অন্যরকম। অবশ্য স্বীকার করে নেওয়াই যায় যে সমস্ত জাতিগুলি এবং একই বর্গের অন্তর্গত সমস্ত প্রজাতিগুলি একই আদিম বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তথাপি এ-বিষয়টা নিয়ে আরও আলোচনা হওয়া দরকার। যেমন, গৃহপালিত কুকুরদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এখন যতটা পার্থক্য দেখা যায়, তা কি মানুষের হাতে প্রথম কোনও-একটি প্রজাতির কুকুরদের পোষ-মানার পর থেকে তারা অর্জন করেছে? অথবা, তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য কি স্বতন্ত্র কোনও প্রজাতির কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত, যে-প্রজাতিটি তার পোষ-মানার আগেই তাদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল? অবশ্য মানুষের বেলায় এ-রকম কোনও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সে কোনও-একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে গৃহবাসী হয়ে ওঠেনি।

প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ যখন একটিমাত্র বংশ থেকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ হতে শুরু করেছিল, তখন জাতিগুলির মধ্যেকার পার্থক্য এবং সেইসঙ্গে তাদের সংখ্যাও নিশ্চয়ই কম ছিল। ফলে তাদের মধ্যে তখন পরস্পরের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য এখনকার জাতিগুলির থেকেও কম ছিল, আর তাই তাদেরকে আলাদা আলাদা প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করাটা খুব যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু 'প্রজাতি' শব্দটিকে আমরা বড় যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে থাকি। আদিম যুগের ওইসব জাতির মধ্যে যে-সব অত্যল্প পার্থক্য ছিল, সেগুলি যদি এখনকার তুলনায় আরও অপরিবর্তনীয় হত এবং ওইসব জাতি যদি পরস্পরের সঙ্গে মিশে না যেত, তাহলে কিছু প্রাণিতত্ত্ববিদ হয়তো তাদেরকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবেই চিহ্নিত করে দিতেন।

যদিও সম্ভাবনা সুদূর, তবু বোধহয় একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয় যে মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য ছিল, এবং এই অবস্থা ততদিন পর্যন্ত বজায় ছিল যতদিন না বর্তমানের যে-কোনও জাতির তুলনায় তাদের পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সহধর্মী হয়ে ওঠে—বলেছেন ফখ্‌ৎ। মানুষ যখন কোনও বিশেষ কাজের জন্য দুই স্বতন্ত্র প্রজাতির দুটি বাচ্চাকে নির্বাচন করে, তখন সেই কাজের মধ্যে একসঙ্গে থাকতে থাকতে অনেক সময় তাদেরকে দেখতেও অনেকটা একরকম হয়ে যায়। ফন নাথুসায়াস দেখিয়েছেন, দুটি স্বতন্ত্র প্রজাতির মিলনজাত উন্নত জাতের শুয়োরদের মধ্যে এটা খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। উন্নত জাতের গবাদি পশুদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা কিছুটা দেখা যায়। বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ গ্র্যাটিওলেট বলেছেন যে অ্যান্‌থ্রোপমরফাস জাতের বানররা কোনও আলাদা উপ-শ্রেণির মধ্যে পড়ে না, কিন্তু ওরাং-ওটাং, শিম্পাঞ্জি এবং গরিলারা হচ্ছে যথাক্রমে গিবন বা সেম্‌নোপিথেকাস, ম্যাকাকাস এবং ম্যান্‌ড্রিল জাতের বানরদের অত্যন্ত উন্নত সংস্করণ। প্রায় পুরোপুরিভাবে মস্তিষ্কের গঠনভিত্তিক এই সিদ্ধান্তটিকে যদি স্বীকার করে নেওয়া যায়, তাহলে আমরা অন্তত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সহধর্মিতার একটা প্রমাণ হাতে পাই। কারণ অ্যান্‌থ্রোপমরফাস জাতের বানরদের সঙ্গে অন্য জাতের বানরদের যতখানি সাদৃশ্য থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি সাদৃশ্য থাকে তাদের পরস্পরের মধ্যে। যাবতীয় তুলনামূলক সাদৃশ্যকে, যেমন তিমি মাছের সঙ্গে কোনও সাধারণ মাছের সাদৃশ্যকে, এই সহধর্মিতারই প্রকাশ বলে ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য এই সহধর্মিতা শব্দটিকে কখনওই ভাসাভাসা বা অভিযোজনগত সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। তবে একেবারে পৃথক পৃথক প্রজাতির পরিবর্তিত বংশধরদের আকৃতিগত নানান সাদৃশ্যকে সহধর্মিতা হিসেবে দেখাতে গেলে তা নেহাতই হঠকারিতা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা জানি স্ফটিকের আকৃতি নির্ধারিত হয় তার অণুগুলির শক্তির দ্বারা, আর অনেক সময় বিভিন্ন বিসদৃশ উপাদানও একই রকম আকার নিয়ে গড়ে ওঠে। কিন্তু জীবজগতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। প্রতিটি জীবের আকার কেমন হবে, তা নির্ভর করে অসংখ্য জটিল সম্পর্কের ওপর, যেমন রূপান্তরের ওপর, আর এইসব সম্পর্কের কারণগুলি খুঁজে বার করাও অত্যন্ত দুরূহ। এগুলি নির্ভর করে বজায় থাকা নানান রূপান্তরের ওপর, এইসব রূপান্তরের বজায় থাকা আবার নির্ভর করে শারীরিক অবস্থার ওপর, এবং আরও বেশি করে নির্ভর করে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত চারপাশের জীবসমূহের ওপর। আর শেষত তা নির্ভর করে অসংখ্য পূর্বপুরুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যের ওপর (এই বৈশিষ্ট্য কোনও অনড় ব্যাপার নয়, সারাক্ষণই তার মধ্যে নানান ওলোট-পালোট চলে)। ওইসব পূর্বপুরুষদের প্রত্যেকের শারীরিক আকৃতিও একইরকম জটিল সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই নির্ধারিত হত। দুটি জীব যদি পরস্পরের থেকে বহুলাংশে পৃথক ধরনের হয়, তাহলে পরবর্তীকালে তাদের পরিবর্তিত আকৃতি-প্রকৃতিবিশিষ্ট বংশধরদের সমস্ত

ব্যাপার প্রায় অভিন্ন হয়ে ওঠার ব্যাপারটা একেবারেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। একটু আগে দুটি ভিন্ন জাতির শূকরদের সহধর্মী হয়ে ওঠার যে-ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে ব্যাপারে ফন নাথুসায়াস জানিয়েছেন, এরা যে শূকরদের দুটি অতি প্রাচীন বংশ থেকে উদ্ভূত, তার প্রমাণ তাদের করোটির কয়েকটি হাড়ের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে। অন্যদিকে, কিছু প্রাণিতত্ত্ববিদের কথামতো মানব-জাতিগুলি যদি দুই বা ততোধিক প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে—যে-প্রজাতিগুলির মধ্যে ওরাংদের সঙ্গে গরিলাদের যতটা পার্থক্য ততটা বা প্রায়-ততটা পার্থক্য ছিল—তাহলে নিশ্চয়ই বর্তমান সময়েও বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে কিছু হাড়ের গঠন-কাঠামোয় যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যেত।

যদিও এখনকার এই মানব-জাতিগুলির মধ্যে গাত্রবর্ণ, চুল, করোটির আকৃতি, দেহের অনুপাত ইত্যাদি নানা বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, তবুও তাদের সমগ্র গঠন-আকৃতিকে বিচার করে দেখলে অনেক ব্যাপারেই তাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের অনেকগুলিই একেবারে গুরুত্বহীন বা অনন্য প্রকৃতির হয়ে থাকে। ফলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে আদিম যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বা জাতি কর্তৃক এগুলি পৃথক পৃথক ভাবে অর্জিত হয়েছিল। এই একই কথা বলা চলে পরস্পরের থেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র মানব-জাতিগুলির মধ্যে মানসিক বিষয়ের নানান সাদৃশ্য সম্বন্ধেও। আমেরিকার আদিবাসী, নিগ্রো বা ইউরোপিয়ানদের পরস্পরের মধ্যেকার মানসিক পার্থক্য যে-কোনও তিনটি পৃথক জাতির মতোই। তা সত্ত্বেও 'বিগ্‌ল্' জাহাজে কিছু ফুজিয়ানের সঙ্গে থাকার সময় তাদের দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাদের অনেক ছোট ছোট মানসিক বৈশিষ্ট্য ঠিক আমাদেরই (ইউরোপিয়ানদের) মতো। এমনকী আমার পরিচিত এক নিগ্রো যুবকের সঙ্গেও আমাদের এ-রকম মিল আমার চোখে পড়েছে। মিঃ টাইলর এবং স্যর জে. লুবকের প্রবন্ধগুলি যিনি পড়বেন, তিনি নিশ্চয়ই রুচি, মেজাজ ও অভ্যাসের ব্যাপারে সমস্ত মানব-জাতিগুলির মধ্যে আশ্চর্যরকমের সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। তাদের আনন্দের বিষয়গুলির মধ্যেও এই সাদৃশ্য বর্তমান—তারা সকলেই যেমন নাচতে ভালবাসে, তেমনি ভালবাসে হালকা গান শুনতে, অভিনয় করতে, ছবি আঁকতে, উল্‌কি পরতে এবং অঙ্গসজ্জার দ্বারা নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে। এমনকী পারস্পরিক খবর আদান-প্রদানের ভাষা হিসেবে তারা যে-সব আকার-ইঙ্গিত করে, সেখানেও দেখা যায় যে মুখের একইরকম ভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দ বা দুঃখের বাহ্যপ্রকাশও একইরকম। এই সাদৃশ্য, বা বলা ভাল এই অভিন্নতাকে বিভিন্ন রকম বানরদের বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গি ও সুখদুঃখের চিৎকার-ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে অবাক হতে হয়। তিরধনুকের প্রয়োগ-কৌশল যে একই আদি পূর্বপুরুষের কাছ থেকে মানুষের হাতে আসেনি, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, ওয়েস্ট্রপ ও নিলসন যেমন বলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা বহু প্রাচীন যুগের পাথরের তিরফলাগুলি দেখতে প্রায় একইরকম। এই

ঘটনা থেকে এ-কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন জাতির মানুষদের উদ্ভাবনী শক্তি বা মানসিক ক্ষমতা প্রায় একইরকম হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদরাও প্রাচীনকালের কিছু অতি প্রচলিত অলংকার (যেমন, সর্পিলাকৃতি অলংকার) ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত নানান বিশ্বাস ও প্রথা সম্বন্ধে (যেমন, মৃতদেহ কবর দিয়ে তার ওপর পাথরের চূড়া নির্মাণ ইত্যাদি) একই ধারণা পোষণ করেন। মনে আছে দক্ষিণ আমেরিকায় আমি দেখেছিলাম, এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা যায়, স্মরণীয় কোনও ঘটনার স্মৃতি হিসেবে বা মৃতদেহ সমাধি দেওয়ার জন্য ওইসব জায়গার বাসিন্দারা সাধারণত উঁচু পাহাড়-চুড়োয় পাথরের স্তম্ভ তৈরি করে রাখে।

প্রাণিতত্ত্ববিদরা যখন দুই বা ততোধিক জাতের গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে বা নিকট সম্পর্কযুক্ত অ-গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে অভ্যাস, রুচি ও মেজাজের অসংখ্য ছোট ছোট সাদৃশ্য লক্ষ করেন, তখন তাঁরা ওইসব সাদৃশ্যকে এইসব গুণবিশিষ্ট একই পূর্বপুরুষ থেকে এই জাতিগুলির উদ্ভূত হওয়ার যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করেন। আর তাই এদের সকলকেই তাঁরা একটিমাত্র প্রজাতিরই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মানব-জাতিগুলির ক্ষেত্রে এ-কথা আরও বেশি করে সত্য।

বিভিন্ন মানব-জাতির দৈহিক আকৃতি ও মানসিক বৃত্তির মধ্যে (একইরকম প্রথার কথা এখানে বলছি না) অসংখ্য স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ যে-সব সাদৃশ্য চোখে পড়ে, সেগুলি যে প্রত্যেকটি জাতি আলাদা আলাদা ভাবে অর্জন করেছিল, তা মেনে নেওয়া যায় না। এই বৈশিষ্ট্যগুলি (স্বল্প গুরুত্বের সাদৃশ্য) তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই বংশগতভাবে লাভ করেছে। এভাবেই আমরা পৃথিবীর বুকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ার আগে মানুষের প্রাথমিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। বিভিন্ন সমুদ্রের তীরে তীরে ছড়িয়ে পড়ার ফলে দুস্তর ব্যবধান বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিপুল পার্থক্যের জন্ম দেয়। তা না হলে একই জাতির মানুষদের হয়তো নানান মহাদেশেই বসবাস করতে দেখা যেত। কিন্তু তা দেখা যায় না। স্যর জে. লুবক পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের বন্য জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত কলাকৌশলগুলির তুলনা করে দেখানোর পর সেই সব কৌশলগুলিকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন, যেগুলি মানুষ তার আদি বাসস্থান ছেড়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত জানত না। কারণ এগুলি একবার শিখলে ভুলে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সেইজন্য স্যর লুবক বলেছেন, 'বর্শা, যা আসলে সূচালো-মুখ ছোরারই উন্নত সংস্করণ এবং মাথাওয়ালা ভারী দণ্ড যা আসলে দীর্ঘ হাতলযুক্ত হাতুড়িরই উন্নত সংস্করণ—আদি বাসস্থান ছেড়ে যাওয়ার আগে মাত্র এই দুটি উপকরণেই অভ্যস্ত ছিল মানুষ।' অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে সম্ভবত আগুন জ্বালানোর কৌশলও ততদিনে শিখে নিয়েছিল মানুষ, কারণ বর্তমানের সমস্ত জাতিই আগুন জ্বালাতে জানে, এমনকী ইউরোপের প্রাচীন গুহাবাসীদেরও এই বিদ্যাটি জানা ছিল। কাজ-চালানো গোছের ডোঙা বা ভেলা বানানোর কৌশলও সম্ভবত তাদের

আয়ত্তে ছিল। কিন্তু সেই সুদূর যুগে অনেক জায়গারই ভূমিতল ঠিক আজকের মতো ছিল না, ফলে অনেক সময়েই তারা ডোঙার সাহায্য ছাড়া কেবল পায়ে হেঁটেই বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল বলে মনে হয়। স্যর জে. লুবক আরও বলেছেন, এ-কথাটা একেবারেই অবাস্তব যে আমাদের আদি পূর্বপুরুষেরা নাকি 'দশ (সংখ্যা) অবধি গুনতে পারত, কারণ এখনও পর্যন্ত অনেক জাতির লোকেরা চারের বেশি গুনতে পারে না।' তা সত্ত্বেও, সেই প্রাচীন যুগে মানুষের মননগত ও সামাজিক গুণগুলি আজকের দিনের নিম্নতম স্তরের বন্য জাতিগুলির তুলনায় খুব-একটা নিকৃষ্ট মানের ছিল না। অন্যথায় তাদের পক্ষে জীবনসংগ্রামে এত সাফল্য লাভ করা সম্ভব হত না, আর তাদের দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে সেই সাফল্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

কতকগুলি ভাষার মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য বিচার করে কিছু ভাষাতত্ত্ববিদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানুষ যখন প্রথম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন সে কথা বলতে জানত না। তবে এ-কথা মনে করার মতো কারণও আছে যে, এখনকার যে-কোনও ভাষার তুলনায় একেবার প্রাথমিক স্তরের হলেও তাদের একটা ভাষা ছিল, যা তারা ব্যবহার করত বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি সহযোগে, এবং তা সত্ত্বেও সেই ভাষা পরবর্তীকালের উন্নততর ভাষাগুলির ওপর কোনও ছাপ ফেলেনি। যত প্রাথমিক স্তরেরই হোক না কেন, কোনও-একটা ভাষার অস্তিত্ব না থাকলে সেই সুদূর অতীতে মানুষ প্রাণীজগতের সর্বোচ্চ আসনে আরোহণ করতে পারত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

আদিম মানুষ যখন মোটা দাগের কয়েকটি মাত্র কৌশল আয়ত্ত করেছিল এবং যখন তার ভাষা ছিল একেবারেই প্রাথমিক স্তরের, তখনকার সেই অবস্থায় তাকে আদৌ মানুষ বলা যাবে কি না, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আমরা কোন্ সংজ্ঞা ব্যবহার করছি, তার ওপর। বানর-সদৃশ জীব থেকে ধীরে ধীরে উন্নত হতে হতে ঠিক কখন সে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছল যখন থেকে তাকে 'মানুষ' নামে অভিহিত করা যাবে, তা বলা নিতান্তই অসম্ভব। তবে এ আলোচনা এখানে খুব-একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আবার বলছি, তথাকথিত মানব-জাতিগুলিকে জাতি (Race) বলা হবে, নাকি তাদের প্রজাতি (Species) বা উপ-প্রজাতি (Sub-species) নামে চিহ্নিত করা হবে—তাতে কিছু যায়-আসে না। তবে 'উপ-প্রজাতি' শব্দটিই এক্ষেত্রে বেশি যুক্তিযুক্ত। তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বিবর্তনবাদ যখন সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে (আশা করি ভবিষ্যতে আরও বেশি স্বীকৃতি পাবে), তখন নিশ্চয়ই মানব-জাতিগুলিকে একটিমাত্র প্রজাতি হিসেবে দেখার মতাবলম্বী এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে দেখার মতাবলম্বীদের মধ্যেকার বিবাদ আপনা থেকেই মিটে যাবে।

আরও একটি প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। প্রশ্নটি হল—মানুষের প্রত্যেকটি উপ-প্রজাতি বা জাতি একজোড়া আদি মানব-মানবী থেকে সৃষ্টি হয়েছে কি না।

আমাদের পোষা জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে কোনও-একটি জোড়ের থেকে উদ্ভূত তারতম্যযুক্ত দুটি স্ত্রী-পুরুষকে সতর্কভাবে বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে মিলন ঘটালে, অথবা এমনকী নতুন ধরনের কোনও বৈশিষ্ট্যসমন্বিত একটিমাত্র প্রাণী থেকেও, একটি নতুন জাতি সহজেই সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মানব-জাতি সচেতনভাবে নির্বাচিত কোনও স্ত্রী-পুরুষের জোড় থেকে সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টি হয়েছে বহু নর বা নারীকে অসচেতনভাবে টিকিয়ে রাখার ফলেই, যাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় পার্থক্য ছিল। যদি এমন হয় যে একটি দেশের জল-হাওয়া বড় ও তেজি ঘোড়াদের পক্ষে দারুণ উপযুক্ত এবং অন্য একটি দেশের জল-হাওয়া ছোট মাপের রোগা-পাতলা ঘোড়াদের পক্ষে উপযুক্ত, তাহলে কালক্রমে দুটি পৃথক উপ-প্রজাতির সৃষ্টি হবে, এবং তা সৃষ্টি করার জন্য এই উভয় দেশের কোনওটিতেই একটিও স্ত্রী-পুরুষ জোড়কে আলাদা করে নিয়ে তাদের থেকে আলাদা করে বাচ্চার জন্ম দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। অনেক জাতিই এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের এই গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক প্রজাতিগুলির গড়ে ওঠার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। আমরা এ-ও জানি যে, যে-সব ঘোড়াকে ফক্‌ল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলি ক্রমে ক্রমে হ্রস্বাকার ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আর যে-সব ঘোড়ারা পালিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার তৃণভূমিতে, তাদের উত্তরপুরুষরা ক্রমে ক্রমে লম্বা-চওড়া এবং বড় ধরনের মাথাবিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্পষ্টতই বোঝা যায়, এ ধরনের পরিবর্তন কোনও একটিমাত্র স্ত্রী-পুরুষ জোড়ের থেকে ঘটতে পারে না। আসলে প্রত্যেকটি ঘোড়া একই প্রাকৃতিক পরিবেশের আওতায় গিয়ে পড়েছিল, আর সেইসঙ্গেই সম্ভবত কাজ করেছিল পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের নীতি—তাই ঘটেছিল ওই পরিবর্তন। এই ধরনের ঘটনায় যে-নতুন উপ-প্রজাতিগুলি সৃষ্টি হয়, তারা কোনও একটিমাত্র স্ত্রী-পুরুষ জোড়ের বংশধর নয়, বরং তারা হচ্ছে একইরকম আচরণবিশিষ্ট অথচ নানা ধরনের পার্থক্যযুক্ত বহু প্রাণীযুগলের বংশধর। এইসব প্রমাণের আলোয় দাঁড়িয়ে আমরা এই সিদ্ধাতে আসতে পারি যে, মানুষের বিভিন্ন জাতিগুলিও এই একইভাবে গড়ে উঠেছিল এবং তাদের নানান পরিবর্তনগুলি ছিল ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসের প্রত্যক্ষ ফলাফল, অথবা কোনও-না-কোনও ধরনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরোক্ষ ফলস্বরূপ। এই শেষোক্ত বিষয়টা নিয়ে একটু পরে কিছু আলোচনা করব আমরা।

বিভিন্ন মানব-জাতির বিলুপ্তি প্রসঙ্গে

ইতিহাসের গতিপথে বহু জাতি ও উপ-জাতির আংশিক বা পুরোপুরি বিলুপ্তি বারবারই ঘটেছে। হাম্‌বোল্ড দক্ষিণ আমেরিকায় একটি তোতাপাখি দেখেছিলেন। ওই তোতাপাখিটি এমন এক মানবগোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলত যে-ভাষায় কথা বলার জন্য একমাত্র ওই পাখিটি ছাড়া আর একজন মানুষও জীবিত ছিল না। অর্থাৎ পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেই গোষ্ঠীটি। পৃথিবীর সর্বত্রই এমন অনেক প্রাচীন

স্মৃতিস্তম্ভ ও পাথুরে যন্ত্রপাতির সন্ধান মেলে যেগুলি সম্বন্ধে ওইসব অঞ্চলের বর্তমান অধিবাসীরা কিছুই জানে না। এই ঘটনার মধ্যেও পুরনো অনেক জাতির বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ছবিই ফুটে ওঠে। পূর্বতন বিভিন্ন জাতির কিছু ছোট ছোট ও খণ্ডিত গোষ্ঠী আজও অনেক দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে। শ্যাফ্‌হউসেন বলেছেন, 'ইউরোপের সমস্ত প্রাচীন জাতিগুলিই আজকের দিনের নিম্নতম মানের বন্যদের থেকেও অনুন্নত ছিল।' তাহলে ধরেই নেওয়া যায় যে আজকের দিনের যে-কোনও জাতির সঙ্গে কিছুটা পার্থক্য তাদের ছিলই। ল্যে আইজি থেকে পাওয়া কিছু ধ্বংসাবশেষের বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক ব্রকা। দুর্ভাগ্যবশত, এই ধ্বংসাবশেষগুলি সম্ভবত কোনও একটিমাত্র পরিবারের বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই ধ্বংসাবশেষ থেকে বোঝা যায় যে সেখানে একটাই জাতি বসবাস করত যাদের মধ্যে একইসঙ্গে অত্যন্ত নিম্নমানের এবং উচ্চমানের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। এই জাতিটি 'আমাদের জানা প্রাচীনকালের বা আধুনিক যুগের যে-কোনও জাতির থেকে একেবারেই আলাদা।' অতএব, ভূ-গঠনের চতুর্থ যুগে (quaternary) বেলজিয়ামে যে-গুহাবাসী জাতির অস্তিত্ব ছিল, তাদেরু থেকেও এরা আলাদা।

নিজের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মানুষ দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে। উত্তর মেরুর মতো প্রতিকূল অঞ্চলেও সে দীর্ঘদিন ধরে বজায় রেখেছে নিজের অস্তিত্ব, যেখানে তার ডিঙি বা যন্ত্রপাতি বানানোর জন্য ছিল না কোনও কাঠ, জ্বালানি বলতে শুধু তিমি বা সীলমাছের চর্বি, আর একমাত্র পানীয় হচ্ছে গলানো তুষার! আমেরিকার সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের মতো জায়গায় ফুজিয়ানরা টিকে থেকেছে পোশাক ছাড়াই, কোনওরকম ঘরবাড়ি ছাড়াই। দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীরা ঘুরে বেড়ায় বিস্তীর্ণ ঊষর প্রান্তর জুড়ে, যেখানে পদে পদে হিংস্র জীবজন্তুদের নিয়ত আনাগোনা। হিমালয়ের কোল-ছোঁয়া ভয়-জড়ানো তরাই অঞ্চল কিংবা ক্রান্তীয় আফ্রিকার মারাত্মক উপকূল এলাকা—সর্বত্রই মানুষ টিকে থাকতে পারে।

প্রধানত গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে এবং জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই বিলুপ্তি ঘটেছে বিভিন্ন মানব-জাতির। পৃথিবীতে এমন কিছু বাধা-বিপত্তি সর্বদাই কাজ করে চলে যেগুলি কোনও বন্য জাতির জনসংখ্যাকেই খুব বেশি বাড়তে দেয় না। যেমন, কয়েক বছর অন্তর অন্তর দুর্ভিক্ষ, যাযাবর স্বভাব এবং তার ফলস্বরূপ শিশুমৃত্যু, শিশুদের দীর্ঘদিন ধরে স্তন্যপান (ফলে পরবর্তী শিশুর জন্মাতে বিলম্ব হয়), যুদ্ধ, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, বহুগামিতা, নারীহরণ, শিশুহত্যা, এবং বিশেষত দুর্বল প্রজননক্ষমতা। এগুলির মধ্যে কোনও-একটি বিষয়ও যদি কিছুটা জোরদার হয়ে ওঠে, তাহলে তৎক্ষণাৎ উদ্দিষ্ট গোষ্ঠীটির জনসংখ্যা কমতে শুরু করে। যখন পাশাপাশি অঞ্চলে বসবাসকারী দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে একটির লোকবল ও শক্তি অপরটির থেকে কমে যায়, তখনই শুরু হয় যুদ্ধ, হত্যা, নরমাংসভক্ষণ, দাস বানানো এবং একটি গোষ্ঠীর মধ্যে অপর গোষ্ঠীটির অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটে

প্রতিদ্বন্দ্বিতার। কিংবা কোনও দুর্বলতর গোষ্ঠী যদি এভাবে অপর কোনও গোষ্ঠীর দ্বারা নিশ্চিহ্ন না-ও হয়ে যায়, তাহলেও একবার হ্রাস পেতে শুরু করলে ধীরে ধীরে গোষ্ঠীটি একসময় আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সুসভ্য জাতিগুলির সঙ্গে বর্বর জাতিদের সংঘাত বাধলে সে-সংঘাতের নিষ্পত্তি হতে বেশি সময় লাগে না, জয়ী হয় সুসভ্য জাতিগুলিই, যদি না সেই বর্বর জাতির বাসভূমির প্রতিকূল জলবায়ু তাদেরকে একটা বাড়তি সুবিধে জোগায়। সুসভ্য জাতিগুলির জয়লাভের পিছনে যে-সব কারণ কাজ করে, তার মধ্যে কয়েকটি নিতান্তই সাদামাটা, আবার কয়েকটি খুবই জটিল ও দুর্বোধ্য। যেমন, জমিতে কৃষিকাজ শুরু করা হলে সেটা অ-সভ্য জাতিগুলির পক্ষে একটা সর্বনাশা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কেননা তারা নিজেদের অভ্যাস পালটাতে পারে না বা পালটাতে চায়ও না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নতুন কিছু রোগ আর কদভ্যাসও তাদের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে, এদের মধ্যে নতুন কোনও রোগ ছড়িয়ে পড়লে সেই রোগের আক্রমণে জীবনহানির সংখ্যা বেড়েই চলে, আর ওই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যাদের সবচেয়ে বেশি তারা সবাই মারা না-যাওয়া পর্যন্ত এই মরণদৌড় বন্ধ হয় না। চোলাই মদের ক্ষতিকর প্রভাবেও একই ঘটনা ঘটতে পারে, কারণ বহু অ-সভ্য জাতির মধ্যেই এই চোলাই মদ সম্বন্ধে একটা অদম্য আসক্তি থাকে। তাছাড়াও দেখা গেছে (ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়ই বটে), দুটি স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জাতির মধ্যে প্রথম মিলন ঘটার পর তাদের মধ্যে নানান অসুখ মাথাচাড়া দেয়। মিঃ স্প্রোট, যিনি ভ্যাঙ্কুবার দ্বীপপুঞ্জে এই বিলুপ্তির বিষয়টাকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তিনি বলেছেন, ওই দ্বীপপুঞ্জে ইউরোপীয়রা অনুপ্রবেশ করার পর থেকেই ওখানকার বাসিন্দাদের বিভিন্ন অভ্যাস বদলাতে শুরু করে আর তার ফলে দেখা দেয় রোগ, স্বাস্থ্যহানি। তাছাড়া তিনি আপাতভাবে তুচ্ছ এই কারণটার ওপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন যে সেখানকার আদি বাসিন্দারা 'তাদের চারপাশে এক নতুন জীবনের ছাপ দেখে হতচকিত ও স্থূলবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। কোনও-কিছুর জন্য চেষ্টা করার প্রেরণাটাই হারিয়ে ফেলেছিল তারা, এবং তার জায়গায় অন্য কোনও নতুন প্রেরণার সন্ধানও পায়নি।'

একটা জাতি সভ্যতার কোন্ স্তরে আছে, তা অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার জয়লাভের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাত্র কয়েকশো বছর আগেও ইউরোপীয়রা প্রাচ্যের বর্বর জাতিগুলির আকস্মিক আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। কিন্তু আজ এ-রকম ভীতি নিতান্তই হাস্যকর। আর-একটা ব্যাপারও লক্ষ করার মতো। মিঃ বেগ্‌হট দেখিয়েছেন যে আজকের দিনে অ-সভ্য জাতিগুলি আধুনিক সভ্য জাতিগুলির কাছে যত সহজে পরাভূত হয়, প্রাচীন আমলের সভ্য জাতিগুলির কাছে কিন্তু তারা তত সহজে পরাভূত হত না। তা যদি হত, তাহলে সে-আমলের নীতিবিদরা এ-বিষয়ে কিছু চিন্তাভাবনা নিশ্চয়ই করতেন। কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ বর্বরদের সম্বন্ধে তখনকার কোনও লেখকের রচনাতেই কোনওরকম বিলাপ ফুটে ওঠেনি। বহুক্ষেত্রেই দেখা

গেছে কোনও জাতির বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পিছনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করেছে দুর্বল প্রজননক্ষমতা ও ভগ্নস্বাস্থ্য, বিশেষত শিশুদের ভগ্নস্বাস্থ্য। এগুলির পিছনে আবার কাজ করে জীবনযাপনের অবস্থার পরিবর্তন, এমনকী সেই নতুন অবস্থা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর না হলেও ফলটা একই হয়। এই বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এবং এ-ব্যাপারে আমাকে অনেক তথ্য সরবরাহ করার জন্য আমি মিঃ এইচ. এইচ. হাওয়ার্থ-এর কাছে ঋণী। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির কথা আমি সংগ্রহ করেছি।

ইংরেজরা যখন প্রথম তাসমানিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন তাসমানিয়ার জনসংখ্যা ছিল কারও কারও মতে প্রায় ৭ হাজার, আবার কারও কারও মতে প্রায় ২০ হাজার। মূলত ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ আর তাছাড়া নিজেদের মধ্যে হানাহানি করার ফলে সেখানকার জনসংখ্যা কিছুদিনের মধ্যেই খুব কমে যায়। সমস্ত ঔপনিবেশিকরা মিলে একসময় তাসমানিয়ার মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে। এই ঘটনার পর ওখানকার অবশিষ্ট বাসিন্দারা যখন সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন তাদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১২০ জনে। ১৮৩২ সালে এদেরকে ফ্লিন্ডার্স দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাসমানিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জটি চল্লিশ মাইল লম্বা আর বারো থেকে আঠারো মাইল চওড়া। জায়গাটা এমনিতেই স্বাস্থ্যকর, তাছাড়া সরকার ওইসব মানুষদের ভালভাবে থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে। ১৮৩৪ সালে তাদের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় (বনউইক-এর হিসেব অনুযায়ী) সাতচল্লিশ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, আটচল্লিশ জন প্রাপ্তবয়স্কা নারী আর ষোলোটি শিশুতে, অর্থাৎ মোট ১১১ জনে। ১৮৩৫ সালে এই সংখ্যাটা নেমে আসে ১০০ জনে। যেহেতু তাদের সংখ্যা অতি দ্রুত কমে আসছিল এবং যেহেতু তারা নিজেরা মনে করত যে অন্য কোথাও থাকলে তারা এত দ্রুত শেষ হয়ে যেত না, সেহেতু ১৮৪৭ সালে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাসমানিয়ার দক্ষিণ প্রান্তস্থ অয়েস্টার খাঁড়ি অঞ্চলে। সেই সময় (২০ ডিসেম্বর, ১৮৪৭) তাদের লোকসংখ্যা ছিল চোদ্দোজন পুরুষ, বাইশ জন নারী এবং দশটি শিশু। কিন্তু এই স্থান পরিবর্তনের ফলে তাদের কোনও লাভই হল না। রোগ আর মৃত্যু তাদের সঙ্গে লেগেই রইল ছায়ার মতো। ১৮৬৪ সালে এসে এদের মধ্যে সাকুল্যে বেঁচে ছিল মাত্র একজন পুরুষ (যে ১৮৬৯ সালে মারা যায়) এবং তিনজন বর্ষীয়সী মহিলা। সকলকার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়া, মৃত্যু—এ-সবের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল নারীদের বন্ধ্যাত্ব। অয়েস্টার খাঁড়ি অঞ্চলে যখন মাত্র ন'জন নারী জীবিত ছিল, সেই সময় তারা মিঃ বন্‌উইককে বলেছিল যে তাদের মধ্যে মাত্র দুজন জীবনে সন্তানধারণ করেছে, আর ওই দুজন মিলে মাত্র তিনটি সন্তানের জন্ম দিতে পেরেছিল।

এই ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনার কারণ কী, তা বলতে গিয়ে ডঃ স্টোরি মন্তব্য করেছেন যে ওই অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের সভ্য করে তোলার চেষ্টা করার ফলেই

তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার অত বেড়ে উঠেছিল। 'যদি তাদেরকে নিজেদের অভ্যাস মতো অবাধে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হত, তাহলে তারা আরও বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারত এবং তাদের মৃত্যুর হারও অনেক কম হত।' আদি বাসিন্দাদের জীবনের আর-একজন মনোযোগী পর্যবেক্ষক মিঃ ডেভিস বলেছেন, 'এদের জন্মের হার কম আর মৃত্যু অসংখ্য। হয়তো এর একটা বড় কারণ হল এদের বসবাসের অবস্থার ও খাদ্যের পরিবর্তন। কিন্তু ভ্যান ডিয়েমেন্‌স্ ল্যান্ডের মূল ভূখণ্ড থেকে এদের নির্বাসন আর তার ফলস্বরূপ এদের মনোবল ভেঙে পড়াটা ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ' (বন্‌উইক)।

অস্ট্রেলিয়ার একেবারে দু-প্রান্তের দুটি জায়গাতেও একই ঘটনা দেখা গিয়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ অভিযাত্রী মিঃ গ্রেগারি মিঃ বন্‌উইককে বলেছিলেন যে কুইন্সল্যান্ডে 'কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সন্তান জন্মের হার খুবই কমে গেছে, এমনকী একেবারে হাল আমলে যে-সব জায়গায় বসতি গড়ে উঠেছে, সে-সব জায়গাতেও। ফলে, এবার এরা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে শুরু করবে।' শার্কস উপসাগর অঞ্চলের যে তেরো জন আদিবাসী মার্চিন্‌সন নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে বারোজনই মাত্র তিন মাসের মধ্যে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

মিঃ ফেন্টন তাঁর একটি সুলিখিত প্রতিবেদনে নিউজিল্যান্ডের মাওরিদের জনসংখ্যা কমে আসার ব্যাপারটা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর ওই প্রতিবেদন থেকেই নিম্নলিখিত যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে (শুধু একটি তথ্য ছাড়া)। ১৮৩০ সালের পর থেকেই যে তাদের সংখ্যা ক্রমাগত কমে চলেছে তা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন, এমনকী ওখানকার বাসিন্দারা পর্যন্ত। আর এই কমে যাওয়ার প্রক্রিয়া লাগাতারই চলছে। ওখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রকৃত লোকগণনার কাজ আজ পর্যন্ত চালানো না গেলেও, বেশ কিছু জেলার অধিবাসীরা নিজেরাই কিছু হিসেব হাজির করেছে। এইসব হিসেব যথেষ্টই নির্ভরযোগ্য। এ থেকে দেখা যায়, ১৮৫৮ সালের আগের চোদ্দো বছরে তাদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ১৯.৪২ শতাংশ। ওখানকার অনেক গোষ্ঠী পরস্পরের থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে দূরে বসবাস করত, কেউ থাকত সমুদ্র উপকূলে, কেউ-বা উপকূল থেকে দূরে। তাদের জীবনযাপনের উপকরণ এবং আচার-অভ্যাসের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য ছিল। ১৮৫৮ সালে এদের মোট জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি ৫৩ হাজার ৭০০ জন। তার চোদ্দো বছর পরে, ১৮৭২ সালে, আবার গণনা করা হয়। দেখা যায়, লোকসংখ্যা বসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৬ হাজার ৩৫৯ জনে, অর্থাৎ লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৩২.২৯ শতাংশ। এর পিছনে যে যে কারণ থাকতে পারে, যেমন নতুন নতুন রোগ, নারীদের ব্যভিচার, অত্যধিক সুরাসক্তি, যুদ্ধ ইত্যাদি—এ-সব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে মিঃ ফেন্টন বলেছেন যে ওই বিপুল হারে লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়টিকে এইসব কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। যথেষ্ট যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, নারীদের বন্ধ্যাত্ব এবং অল্পবয়সী বাচ্চাদের অত্যধিক পরিমাণে মারা যাওয়াই

হচ্ছে এর মূল কারণ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৮৪৪ সালে যেখানে প্রতি ২.৫৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক পিছু একজন করে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল, সেখানে ১৮৫৮ সালে সংখ্যাটা নেমে এসেছিল প্রতি ৩.২৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক পিছু একজন করে অপ্রাপ্তবয়স্কে। প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুর হারও ছিল খুবই বেশি। নারী-পুরুষের সংখ্যাগত অসমতাকেও তিনি লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ ওই অঞ্চলে মেয়ের তুলনায় ছেলেই বেশি জন্মাত। এই শেষোক্ত বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী কোনও পরিচ্ছেদে একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা। নিউজিল্যান্ডে লোকসংখ্যা কমে যাওয়া আর আয়ারল্যান্ডে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়া—এই দুটো ব্যাপারকে সবিস্ময়ে তুলনা করেছেন মিঃ ফেন্টন। এই দুটো দেশের জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্যই, দুই দেশের বর্তমান বাসিন্দাদের আচার-অভ্যাসও অনেকটা একইরকম। মাওরিরা নিজেরাই 'বলে যে তাদের ক্ষয়প্রাপ্তির একটা কারণ হল নতুন ধরনের খাদ্য আর পোশাক চালু হওয়া এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটা।' অবস্থার পরিবর্তন প্রজননক্ষমতার ওপর কতটা প্রভাব ফেলে, তা বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায় যে তাদের ধারণায় সম্ভবত কোনও ভুল নেই। এদের লোকসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে। মিঃ ফেন্টন দেখিয়েছেন, শস্যকে (ভুট্টা) অনেকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে তা দিয়ে পচে-ওঠা খাদ্য বানানোর কৌশল ১৮৩০ সাল নাগাদই আবিষ্কার করেছিল তারা এবং ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে শুরু করেছিল। এ থেকে বোঝা যায়, নিউজিল্যান্ডে যখন মাত্র অল্প কিছু ইউরোপিয়ান গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিল, তখন থেকেই সেখানকার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল একটা অভ্যাসগত পরিবর্তন। ১৮৩৫ সালে আমি যখন বে অফ আইল্যান্ডস-এ যাই, তখনই দেখেছিলাম সেখানকার বাসিন্দাদের পোশাক ও খাদ্যের বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। তারা তখন আলু, ভুট্টা ও অন্যান্য কৃষিজ ফসল উৎপন্ন করত এবং ইংরেজদের বিভিন্ন পণ্য ও তামাকের সঙ্গে সেইসব ফসলের বিনিময় করত।

বিশপ প্যাটেসন-এর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, নিউ হেব্রাইড এবং তার সন্নিহিত দ্বীপগুলির মেলানেশিয়ানদের ধর্ম-প্রচারক হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিউজিল্যান্ড, নরফোক দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার পর তাদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল।

স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের আদি বাসিন্দাদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটাও নিউজিল্যান্ডের ঘটনার মতোই ভয়াবহ। এ ব্যাপারে যাঁরা যথেষ্ট খোঁজখবর রাখেন তাঁদের মতে — ১৭৭৯ সালে কুক্ যখন এই দ্বীপপুঞ্জটি আবিষ্কার করেন, তখন এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে একটা মোটামুটি লোকগণনা করা হয়। দেখা যায়, লোকসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৫০ জনে! ১৮৩২ সালে এবং তার পরেও কয়েকবার সরকারি উদ্যোগে যথাযথভাবে লোকগণনা করা হয়েছে। আমি শুধু নিম্নলিখিত তথ্যটুকুই সংগ্রহ করতে পেরেছি :

বছর	আদিবাসী লোকসংখ্যা (একমাত্র ১৮৩২ থেকে ১৮৩৬-এর মধ্যবর্তী সময়টুকু বাদে ; ওই সময় দ্বীপের অল্প কিছু বিদেশিকেও লোক-সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল)।	লোকসংখ্যা হ্রাসের বার্ষিক শতকরা হার : ধরে নেওয়া হচ্ছে যে দুটি লোকগণনার মধ্যবর্তী সময়ে এই হারের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি ; এইসব লোকগণনা অনিয়মিত সময়ের ব্যবধানে করা হয়েছে।
১৮৩২	১৩০,৩১৩	৪.৪৬
১৮৩৬	১০৮,৫৭৯	২.৪৭
১৮৫৩	৭১,০১৯	০.৮১
১৮৬০	৬৭,০৮৪	২.১৮
১৮৬৬	৬৮,৭৬৫	
১৮৭২	৫১,৫৩১	২.১৭

দেখা যাচ্ছে চল্লিশ বছরের মধ্যে (১৮৩২ থেকে ১৮৭২) লোকসংখ্যা কমে গেছে ৬৮ শতাংশ! অধিকাংশ লেখক এই ঘটনার যে-সব কারণ দেখিয়েছেন সেগুলি হল—নারীদের ব্যভিচার, আগেকার আমলের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, পরাজিত গোষ্ঠীগুলির ওপর চাপিয়ে দেওয়া বিপুল শ্রমের বোঝা এবং নতুন নতুন রোগের সূত্রপাত, যে-রোগগুলি অনেক সময় মারাত্মক রূপ নিয়েছে। এইসব কারণ এবং আরও কিছু কারণ যে এ-ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে কমে যাওয়ার জন্যও হয়তো এইসব কারণই দায়ী। কিন্তু এ-ব্যাপারে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল প্রজননক্ষমতা কমে যাওয়া। আমেরিকান নৌ-বাহিনীর ডঃ রাশ্‌চেন্‌বার্গার ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এইসব দ্বীপ পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের একটি জেলায় ১১৩৪ জন পুরুষের মধ্যে মাত্র ২৫ জনের এবং অপর একটি জেলায় ৬৩৭ জন পুরুষের মধ্যে মাত্র ১০ জনের পরিবারে তিনটি করে সন্তান ছিল। ৮০ জন বিবাহিতা মহিলার মধ্যে মাত্র ৩৯ জন সন্তানধারণে সক্ষম হতে পেরেছিল। আর, 'সরকারি হিসেব মতে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি দম্পতির গড়ে আধজন করে সন্তান আছে।' অয়েস্টার খাঁড়ির তাসমানিয়ানদের মধ্যেও সন্তানের গড় সংখ্যাটা ঠিক এ-রকমই। জার্ভেস, যাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থটি ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়, বলেছেন, 'যে-সব পরিবারে তিনটি করে সন্তান আছে, তাদের সমস্তরকম কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়। যাদের সন্তানের সংখ্যা তিনের চেয়েও বেশি, তাদের পুরস্কার হিসেবে জমি ও অন্যান্য জিনিস দেওয়া হয়।' এই নজিরবিহীন সরকারি বিধি থেকেই বোঝা যায় গোটা জাতিটা কতদূর পর্যন্ত প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়েছিল। ১৮১৯ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের 'স্পেক্‌টেটর' পত্রিকায় রেভারেন্ড এ. বিশপ

লিখেছিলেন, ওখানকার বহু শিশুই খুব কম বয়সে মারা যায়। বিশপ স্ট্যালে আমাকে জানিয়েছেন, চিত্রটা এখনও পালটায়নি, ঠিক যেমন পালটায়নি নিউজিল্যান্ডেও। অনেকে বলেন, শিশুদের প্রতি মায়েদের অবহেলাই এই অকালমৃত্যুর কারণ। কিন্তু সম্ভবত এর প্রধান হল শিশুদের দুর্বল স্বাস্থ্য, যার উৎস হচ্ছে তাদের মাতা-পিতার দুর্বল প্রজননক্ষমতা। নিউজিল্যান্ডের অবস্থার সঙ্গে আর-একটা বিষয়েও এদের সাদৃশ্য চোখে পড়ে—এখানেও মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের জন্মের হার অনেক বেশি। ১৮৭২ সালের লোকগণনা অনুযায়ী এখানে সবসমেত ১১ হাজার ৬৫০ জন পুরুষ আর ২৫ হাজার ২৪৭ জন নারী ছিল, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী পিছু ১২৫.১৬ জন করে পুরুষ। অথচ সমস্ত সভ্য দেশে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে। সন্তানধারণে অক্ষমতার একটা কারণ যে নারীদের ব্যভিচার, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের আচার-অভ্যাসের পরিবর্তন ছিল সম্ভবত আরও গুরুতর কারণ। আর এই ব্যাপারটা তাদের, বিশেষত শিশুদের, মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে কুক্, ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভ্যাঙ্কুবার এবং তারপর প্রায়শই তিমি-শিকারিরা এই দ্বীপে পা রেখেছেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে হাজির হন ধর্ম-প্রচারকরা। তাঁরা লক্ষ করেন, মূর্তিপূজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং রাজার নির্দেশে আরও কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এরপর থেকে ওই দ্বীপের বাসিন্দাদের প্রায় সমস্ত অভ্যাসেরই দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং শীঘ্রই তারা 'প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে সবথেকে সুসভ্য হয়ে ওঠে।' আমার জনৈক সংবাদদাতা মিঃ কোন্ ওই দ্বীপেরই বাসিন্দা ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, এক হাজার বছরে ইংরেজদের আচার-অভ্যাসের যতটুকু পরিবর্তন ঘটেছে, তার চেয়ে এই দ্বীপের বাসিন্দাদের অনেক বেশি পরিবর্তন ঘটে গেছে মাত্র পঞ্চাশটা বছরে। বিশপ স্ট্যালে যে তথ্য দিয়েছেন, তা থেকে দরিদ্রতর শ্রেণিগুলির খাদ্যাভাসের খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না, যদিও অনেক নতুন নতুন ফল তাদের খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং আখ একটা সার্বজনীন খাদ্যে পরিণত হয়েছে। তবে ইউরোপিয়ানদের নকল করার প্রবণতার দরুন তাদের পোশাক-আশাকের পরিবর্তন ঘটে গেছে অনেক দিন আগেই, আর সুরাপান বেড়ে গেছে প্রচণ্ডভাবে। আপাতভাবে এইসব পরিবর্তনকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারদের ব্যাপারে পাওয়া তথ্যের আলোয় বিচার করে আমার মনে হয়েছে—ওখানকার বাসিন্দাদের প্রজননক্ষমতা কমে যাওয়ার পিছনে এইসব পরিবর্তনও একটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

শেষত, মিঃ ম্যাক্‌নামারা বলেছেন, বঙ্গোপসাগরের পূর্ব প্রান্তস্থ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অনুন্নত বাসিন্দাদের ওপর 'জলবায়ুর যে-কোনও রকম পরিবর্তনই প্রভূত প্রভাব ফেলে। সত্যি বলতে কী, তাদেরকে ওই দ্বীপপুঞ্জ থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে গেলে তারা নিশ্চিত মারা যাবে, আর সে-ব্যাপারে খাদ্য বা বিদেশি প্রভাবের কোনও ভূমিকা থাকবে না।' তিনি আরও বলেছেন, নেপাল উপত্যকার (যেখানে গ্রীষ্মকালে

অত্যধিক গরম পড়ে) অধিবাসীরা এবং ভারতবর্ষের পাহাড়ি গোষ্ঠীর লোকজনরা সমতলভূমিতে এলে আমাশা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। সারা বছর সমতলভূমিতে থাকার চেষ্টা করলে তাদের বরাতে জোটে অবধারিত মৃত্যু।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে কিংবা জীবনের বিভিন্ন আচার-অভ্যাস পালটে গেলে অনেক অ-সভ্য জাতির মানুষদের স্বাস্থ্যও ভীষণরকম ভেঙে পড়ে, এবং শুধুমাত্র কোনও নতুন জলবায়ুবিশিষ্ট অঞ্চলে গিয়ে পড়াটাই এই স্বাস্থ্যহানির একমাত্র কারণ নয়। আচার-অভ্যাসের কিছু অদল-বদল, যা এমনিতে আদৌ ক্ষতিকর নয় বলে মনে হয়, তা-ও তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে। বিশেষত বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিশুদের স্বাস্থ্য তো একেবারেই ভেঙে পড়ে। প্রায়শই শোনা যায়, যেমন মিঃ ম্যাক্‌নামারা-ও বলেছেন, জলবায়ুঘটিত এবং অন্যান্য সমস্ত ধরনের যাবতীয় পরিবর্তনের ঝড়-ঝাপ্‌টা মানুষ অনায়াসেই সামলে উঠতে পারে। কিন্তু এ-কথাটা কেবলমাত্র সভ্য জাতিগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ-ব্যাপারে মানুষের নিকটতম প্রাণী অ্যান্‌থ্রোপয়েড বানরদের সঙ্গে বন্য বা বর্বর দশার মানুষদের প্রায় কোনও তফাতই নেই। অ্যান্‌থ্রোপয়েড বানরদের যখনই তাদের মূল বাসভূমি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখন অবধারিতভাবেই তারা আর খুব বেশিদিন বাঁচেনি—এটা পরীক্ষিত সত্য।

তাসমানিয়ান, মাওরি, স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা এবং আপাতভাবে অস্ট্রেলিয়াবাসীদের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তনের দরুন প্রজননক্ষমতা কমে যাওয়ার যে-প্রমাণ আমরা পেয়েছি, তা তাদের স্বাস্থ্যহানি বা মৃত্যুর চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা যে-কোনও গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা বেড়ে চলার পথে যে-সমস্ত বাধা-বিপত্তি থাকে, সেগুলির সঙ্গে যদি সামান্যতমও প্রজনন-অক্ষমতা যুক্ত হয়, তাহলে একসময় গোষ্ঠীটি বিলুপ্ত হয়ে যাবেই। প্রজননক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটাকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে নারীদের ব্যভিচারেরই ফল হিসেবে (যেমন কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাহিতির বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে) ব্যাখ্যা করা গেলেও, মিঃ ফেন্টন দেখিয়েছেন যে নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে বা তাসমানিয়ানদের ব্যাপারে এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়।

উপরোক্ত রচনাটিতে মিঃ ম্যাক্‌নামারা যথেষ্ট যুক্তি সহযোগে দেখিয়েছেন—যে-সব জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি, সেখানকার অধিবাসীরা সাধারণত প্রজনন-অক্ষম হয়ে থাকে। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনাসমূহের অনেকগুলির ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য নয়। কেউ কেউ বলেন, বিভিন্ন দ্বীপের বাসিন্দারা যে প্রজনন-অক্ষমতা ও স্বাস্থ্যহীনতায় আক্রান্ত হয়, তার কারণ হল দীর্ঘদিন ধরে রক্তসম্পর্কযুক্ত নরনারীর মধ্যে যৌনমিলন ঘটে চলা। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা উপরোক্ত ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে দ্বীপগুলিতে ইউরোপিয়ানরা পদার্পণ করার পর থেকেই যে বাসিন্দারা বহুলাংশে প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়েছে, তা আমরা দেখেছি। তাছাড়া রক্তসম্পর্কযুক্ত নরনারীর মধ্যে মিলন যে মানুষের ওপর খুব বেশি ক্ষতিকর প্রভাব

ফেলে, তা-ও আজ আর তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিশেষত নিউজিল্যান্ডের মতো বিশাল অঞ্চলে এবং নানা ধরনের এলাকাবিশিষ্ট স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে তো নয়-ই। বরং দেখা যায় নরফোক দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান বাসিন্দারা, ভারতবর্ষের টোডারা এবং স্কটল্যান্ডের পশ্চিম-প্রান্তীয় দ্বীপগুলির অধিবাসীরা প্রায় প্রত্যেকেই পরস্পরের মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোন বা নিকট আত্মীয়, এবং তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রজনন-অক্ষমতার কোনও চিহ্নই নেই।

নিম্নতর প্রাণীদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে মানুষের সাদৃশ্য কতটা, তা খুঁজে দেখলে একটা অধিকতর সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গির হদিশ মিলতে পারে। জীবনযাপনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে জননব্যবস্থার ওপরে তার অস্বাভাবিকরকম প্রভাব পড়ে (কেন এমন হয়, তা অবশ্য আমাদের জানা নেই)। এই প্রভাবের ফল ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। আমার 'ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৮-শ পরিচ্ছেদে এ-ব্যাপারে প্রচুর তথ্য দিয়েছি, তাই এখানে শুধু তার একটা সংক্ষিপ্তসারই তুলে দিচ্ছি—উৎসাহী পাঠকরা ওই গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। অল্প কয়েকটি পরিবর্তন অধিকাংশ বা সমস্ত প্রাণীরই স্বাস্থ্য, কর্মশক্তি ও প্রজননক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে, অন্য পরিবর্তনগুলি বহুসংখ্যক প্রাণীকে প্রজনন-অক্ষম করে দেয়। এর একটা সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারতবর্ষের পোষা হাতিরা : এরা কোনও শাবকের জন্ম দিতে পারে না। জাভার পোষা হাতিরা অবশ্য শাবকের জন্ম দিয়ে থাকে, কারণ ওখানকার পোষা মাদি-হাতিদের অরণ্যে ঘুরে বেড়ানোর কিছুটা সুযোগ দেওয়া হয়, ফলে তারা অনেকটাই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থাকতে পারে। বিভিন্ন ধরনের আমেরিকান বানরদের স্ত্রী-পুরুষদের তাদের নিজেদের দেশেই বহু বছর একসঙ্গে রেখে দেখা গেছে—তাদের বাচ্চাকাচ্চা খুব কমই হয়েছে বা একেবারেই হয়নি। আমাদের আলোচনায় এটা একটা যথোপযুক্ত উদাহরণ, কেননা মানুষদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আসলে বন্দী হওয়ার পর অবস্থার যে সামান্যতম পরিবর্তনটুকু ঘটে থাকে, সেটুকুই কোনও বন্য প্রাণীকে প্রজনন-অক্ষম করে দিতে পারে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমাদের অধিকাংশ গৃহপালিত প্রাণীই প্রকৃতির কোলে স্বাধীন জীবনে যতটা প্রজননক্ষম ছিল, গৃহপালিত হওয়ার পর থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রজননক্ষম হয়ে উঠেছে। কিছু কিছু প্রাণীর তো চরম অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও প্রজনন-ক্ষমতার বিন্দুমাত্র হেরফেরও ঘটে না। বন্দীদশা সব প্রাণীর ওপর সমান প্রভাব ফেলে না, তারতম্য থাকেই। অবশ্য একই প্রজাতির সমস্ত প্রাণীর ওপর বন্দীদশা সাধারণত একইভাবে একইরকম প্রভাব রেখে যায়। অনেকসময় কোনও বর্গের একটিমাত্র প্রজাতি প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়ে, বাকিদের মধ্যে তেমন কোনও ব্যাপার চোখে পড়ে না। আবার কখনও-বা কোনও বর্গের একটিমাত্র প্রজাতিই প্রজননক্ষম থাকে, বাকিরা হয়ে পড়ে অক্ষম। কিছু কিছু প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষ প্রাণীরা বন্দীদশায় অথবা নিজেদের অঞ্চলে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে থাকতে না-পারার অবস্থায় কখওনই

পরস্পর মিলিত হয় না। আবার অন্য অনেক প্রজাতির প্রাণীরা এ-রকম অবস্থায় মিলিত হয় বটে, কিন্তু সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। কোনও কোনও প্রজাতির প্রাণীরা এ-রকম অবস্থায় সন্তানের জন্মও দিয়ে থাকে, কিন্তু স্বাধীন অবস্থার মতো বেশি সংখ্যায় নয়। আর কিছুক্ষণ আগে মানুষের সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে বলা যায়—এ-রকম ক্ষেত্রে তাদের সন্তানেরা সাধারণত দুর্বল ও রুগ্ন কিংবা বিকৃত চেহারার হয় এবং অল্প বয়সেই মারা যায়।

অর্থাৎ, জীবনযাপনের পরিবর্তন ঘটলে তা জননব্যবস্থার ওপরেও ছাপ ফেলে—এটা একটা সাধারণ নিয়ম, এবং আমাদের নিকটতম প্রাণী চতুষ্পদ বানরদের ক্ষেত্রেও তা সত্য। এ থেকে স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় যে আদিম অবস্থার মানুষদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য। কাজেই, কোনও বন্য জাতির জীবনযাপনের অভ্যাস হঠাৎ পরিবর্তিত হলে তারা কম-বেশি প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তাদের সন্তানরাও দুর্বল চেহারার হয়, আর তা হয় একইভাবে ও একই কারণে। ঠিক যেমনটা দেখা যায় নিজেদের প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, আমেরিকার অনেক বানরদের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বহু ধরনের জীবজন্তুর ক্ষেত্রে।

যে আদিবাসীরা বহুকাল ধরে বিভিন্ন দ্বীপে এবং প্রায় একইরকম অবস্থার মধ্যে বসবাস করে আসছে, তাদের ওপর অভ্যাসের পরিবর্তন কেন এতটা ছাপ ফেলে—তার কারণটা খুঁজে দেখা যায়। কোনও ধরনের পরিবর্তনই সভ্য জাতির মানুষদের মধ্যে অতটা প্রভাব ফেলতে পারে না। এ-ব্যাপারে গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে সভ্য জাতির মানুষদের যথেষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে, কেননা গৃহপালিত পশুরা কখনও কখনও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেও (যেমন ইউরোপীয় কুকুররা ভারতবর্ষে গেলে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ে), দু-একটা ক্ষেত্র ছাড়া আর প্রায় কখনওই তারা প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়ে না। সভ্য জাতিগুলি বা গৃহপালিত পশুরা যে প্রজনন-অক্ষমতায় আক্রান্ত হয় না, তার কারণ হচ্ছে সম্ভবত এই যে, অধিকাংশ বন্য পশুদের তুলনায় তাদের অনেক বেশি পরিমাণে নানা ধরনের অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে, ফলে নানা ধরনের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও অনেক বেড়ে গেছে তাদের। তাছাড়া একসময় তাদের এক দেশ থেকে আর-এক দেশে বারবার দেশান্তরী হতে হয়েছে, মিলন ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন বর্গ বা উপ-জাতির নর-নারীর মধ্যে—এগুলোও এর এক-একটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে। সভ্যজাতির মানুষদের সঙ্গে আদিবাসীদের যৌনসংযোগ ঘটলে, সেই মিলনজাত আদিবাসী সন্তানদের ওপর অবস্থার পরিবর্তন আর তেমন-কোনও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে না। দেখা গেছে, তাহিতির বাসিন্দা আর ইংরেজদের মিলনজাত সন্তানরা পিট্‌কেয়ার্ন দ্বীপপুঞ্জে বসবাস শুরু করার পর তাদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে উঠেছিল, জায়গার অভাব দেখা দিচ্ছিল দ্বীপে। ১৮৫৬-র জুন মাসে তাদের নরফোক দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন তাদের মধ্যে ছিল ৬০ জন বিবাহিত মানুষ আর

১১৪ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক—মোট ১৭৪ জন। এখানেও তাদের সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে চলে যে তাদের মধ্যে ১৬ জন ১৮৫৯ সালে পিট্‌কেয়ার্ন দ্বীপপুঞ্জে ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০ জনে—পুরুষ আর নারীদের সংখ্যা ছিল একেবারে সমান সমান। তাসমানিয়ানদের ঘটনার সঙ্গে এ-ঘটনার কতই না তফাত! মাত্র সাড়ে এগারো বছরে নরফোক দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের সংখ্যা ১৭৪ জন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০ জনে, আর পনেরো বছরে তাসমানিয়ানদের সংখ্যা ১২০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৬ জনে, যার মধ্যে শিশু মাত্র ১০টি।[১২]

আবার, ১৮৬৬-র লোকগণনা এবং ১৮৭২-এর লোকগণনার অন্তর্বর্তী সময়ে স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের অমিশ্রিত রক্তের আদিবাসীদের মোট লোকসংখ্যার ৮ হাজার ৮১ জন কমে গেছে, আর মিশ্র রক্তের বাসিন্দাদের (যারা অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান) সংখ্যা ৮৪৭ জন বেড়ে গেছে। তবে এই শেষোক্তদের মধ্যে মিশ্র রক্তের মানুষদের সন্তানরাও আছে নাকি এটা শুধু মিশ্ররক্তবিশিষ্ট প্রথম প্রজন্মের মানুষদেরই সংখ্যা, তা আমার জানা নেই।

এখানে যে-সব ঘটনার কথা বললাম, সেগুলি সবই সেইসব আদিবাসীদেরই ঘটনা, যারা তাদের এলাকায় সভ্য মানুষদের আগমনের দরুন নানারকম নতুন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু কোনও কারণে, যেমন কোনও পরাক্রমশালী গোষ্ঠীর আক্রমণের ফলে, এইসব আদিবাসীদের যদি নিজেদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হত এবং নিজেদের আচার-অভ্যাস বদলাতে হত, তাহলে সম্ভবত তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ত এবং তারা প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়ত। যে-সব বন্য পশু গৃহপালিত জীবে পরিণত হয়, তাদের মূল প্রতিরোধক্ষমতা (যা প্রথম বন্দী হওয়ার পরও তাদের অনায়াসে শাবকের জন্ম দিতে পারার ক্ষমতার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে) আর সভ্যতার সঙ্গে প্রথম সংযোগের পর অ-সভ্য মানুষদের মূল প্রতিরোধক্ষমতা (যে-ক্ষমতার জোরে তারা নিজেরাই সুসভ্য হয়ে ওঠার জন্য টিকে থাকতে পারে)—এ দুয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ক্ষমতাটা হল জীবনযাপনের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

শেষত, বিভিন্ন মানব-জাতির লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া এবং এইভাবে হ্রাস পেতে পেতে একদিন তাদের পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যে এক অত্যন্ত জটিল বিষয়, এর পিছনে যে বহু কারণ কাজ করে এবং সেই কারণগুলিও যে বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে,

---

১২। এইসব বিবরণ লেডি বেল্‌সার-এর "দ্য মিউটিনারস অফ দ্য 'বাউন্টি'," ১৮৭০, এবং হাউস অফ কমন্‌স্‌-এর ২৯ মে, ১৮৬৩-র নির্দেশে মুদ্রিত 'পিট্‌কেয়ার্ন আইল্যান্ড' নামক গ্রন্থ দুটি থেকে সংগৃহীত। স্যান্ডউইচ দ্বীপের অধিবাসীদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য 'হনলুলু গেজেট' পত্রিকা থেকে এবং মিঃ কোন্‌-এর কাছ থেকে সংগৃহীত।

এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে উন্নততর শ্রেণির প্রাণীদের, যেমন প্রস্তরীভূত ঘোড়াদের, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার কোনও ফারাক নেই। এইসব ঘোড়ারা একসময় দক্ষিণ আমেরিকার মাটি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আর তার কিছুদিনের মধ্যে ওই একই অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিল অসংখ্য স্পেনীয় ঘোড়া। নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীরা বোধহয় পশুদের সঙ্গে মানুষের এই সাদৃশ্যটার কথা জানে, কেননা তারা নিজেদের ভবিতব্যকে তুলনা করে থাকে তাদের দেশীয় ইঁদুরদের সঙ্গে, যে-ইঁদুররা এখন ইউরোপীয় ইঁদুরদের পাল্লায় পড়ে প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। এর নির্দিষ্ট কারণগুলিকে ও তার কার্যধারাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলে আপাতভাবে কাজটাকে খুবই কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যদি মনে রাখা যায় যে প্রতিটি প্রজাতি ও প্রতিটি জাতির সংখ্যাবৃদ্ধির পথে সারাক্ষণই নানান প্রতিবন্ধক থাকে, তাহলে আর ব্যাপারটা অত কঠিন থাকে না। এইসব প্রতিবন্ধকের সঙ্গে যদি নতুন কোনও প্রতিবন্ধক (তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন) যুক্ত হয়, তাহলে সেই জাতির সদস্যসংখ্যা কমে যেতে বাধ্য, আর এইভাবে কমতে কমতেই জাতিটি একসময় বিলুপ্তির সীমানায় পৌঁছে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনও পরাক্রমশালী গোষ্ঠীর আক্রমণই ওই জাতিটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

বিভিন্ন মানব-জাতির গড়ে ওঠা প্রসঙ্গে

অনেক সময় দুটি পৃথক পৃথক জাতির নারী-পুরুষের মধ্যে মিলনের ফলে একটা নতুন জাতি সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয়রা ও হিন্দুরা একই আর্যকুলের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা যে যে ভাষায় কথা বলে সেগুলি একই মূল ভাষা থেকে সৃষ্ট, অথচ এই দুই জাতির মানুষদের দেখতে একেবারেই আলাদা, আবার অন্যদিকে ইউরোপীয়দের সঙ্গে ইহুদিদের চেহারার প্রায় কোনও পার্থক্যই নেই, অথচ এই ইহুদিরা হচ্ছে সেমিটিক কুলের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের ভাষাও ইউরোপীয়দের থেকে আলাদা—এই বিচিত্র ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ব্রকা বলেছেন যে আসলে আর্যরা যখন বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন তাদের কিছু কিছু শাখার সঙ্গে কিছু কিছু এলাকার আদিবাসীদের ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছিল এবং তারই ফল হিসেবে উপরোক্ত ঘটনা ঘটতে পেরেছে। নিকট সম্পর্কযুক্ত দুটি জাতির মধ্যে মিলন ঘটলে তার প্রথম ফল হিসেবে সৃষ্টি হয় বিভিন্নধর্মী মানুষদের একটা সংমিশ্রণ। যেমন ভারতবর্ষের সাঁওতাল বা পাহাড়ি গোষ্ঠীগুলির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ হান্টার জানিয়েছেন যে ওখানের মানুষদের মধ্যে অসংখ্যরকম পার্থক্য আছে, একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে প্রায় বোঝাই যায় না, আর এই ক্রমমালার মধ্যে আছে 'পাহাড়ে বসবাসকারী খাটো আকৃতির কৃষ্ণবর্ণ গোষ্ঠী থেকে শুরু করে দীর্ঘকায়, সবুজাভ বর্ণের ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত, যাদের ভ্রূতে বুদ্ধিমত্তার ছাপ, চোখে শান্ত ভাব এবং মাথা উন্নত কিন্তু আকারে ছোট।' সেইজন্য ওখানকার আদালতে বিচারের সময় সাক্ষীদের জিজ্ঞেস করা হয় তারা সাঁওতাল না হিন্দু। দুটি স্বতন্ত্র জাতির মিলনের ফলে যে-সব বিভিন্নধর্মী মানুষবিশিষ্ট জাতি গড়ে উঠেছে এবং যাদের মধ্যে অমিশ্রিত রক্তের কোনও মানুষই

আর অবশিষ্ট নেই বা বড়জোর দু-একজন অবশিষ্ট আছে (যেমন পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনও কোনও অঞ্চলের অধিবাসীরা), তারা আবার কোনওদিন সকলে সমধর্মী হয়ে উঠতে পারে কি না, তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে আমাদের ক্ষেত্রে কোনও সংকর জাতের প্রাণীকে কয়েক প্রজন্ম ধরে সতর্ক নির্বাচনের মধ্যে রাখলে ধীরে ধীরে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে আর কোনও প্রভেদ থাকে না। এ থেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে বিভিন্নধর্মী মানুষবিশিষ্ট কোনও জাতির মধ্যে বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে অবাধ সংমিশ্রণ ঘটে চললে সেটাই নির্বাচনের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তখন আর পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এর ফলে ওই সংকর জাতিটি একসময় সমধর্মী হয়ে উঠবে, তবে তাদের মধ্যে হয়তো আদি জাতি দুটির বৈশিষ্ট্যসমূহ তখন আর সমান পরিমাণে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে-সব পার্থক্য দেখা যায়, সেগুলির মধ্যে গায়ের রঙের পার্থক্যটাই হচ্ছে সবথেকে বিশিষ্ট এবং সুস্পষ্ট। একসময় মনে করা হত বিভিন্ন জাতি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জলবায়ুবিশিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করার দরুনই তাদের গায়ের রঙ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। কিন্তু প্যালাস প্রথম দেখান যে এই ধারণাটা সত্য নয়। তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক নৃতত্ত্ববিদই তাঁর ধারণাকে সমর্থন করে আসছেন। পূর্বোক্ত ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করার প্রধান কারণ হল, বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট জাতিগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকলেও (এদের অধিকাংশই তাদের বর্তমান বাসভূমিতে সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে), এইসব জায়গার জলবায়ুর মধ্যে যে প্রচুর পার্থক্য আছে, তা কিন্তু নয়। আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনশো বছর ধরে বসবাস করার পরও ডাচ্‌দের গায়ের রঙ প্রায় পালটায়নি বললেই চলে। একই ঘটনা দেখা যায় জিপ্‌সি আর ইহুদিদের ক্ষেত্রেও। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে এরা এবং সর্বত্রই এদের দেখতে প্রায় একইরকম—অবশ্য পৃথিবীর সব জায়গায় ইহুদিদের দেখতে একইরকম হওয়ার ব্যাপারটাকে কিছুটা অতিরঞ্জিত করেই দেখানো হয়ে থাকে। অনেকে বলেন, রঙ পরিবর্তনের ব্যাপারে উষ্ণ আবহাওয়া যতটা সাহায্য করে, তার চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য করে স্যাঁৎসেঁতে বা শুষ্ক আবহাওয়া। কিন্তু স্যাঁৎসেঁতে আর শুষ্ক আবহাওয়ার ভূমিকা সম্বন্ধে দক্ষিণ আমেরিকায় ডি'অরবাইনি এবং আফ্রিকায় লিভিংস্টোন একেবারে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাই এ-বিষয়ে কোনও মতামতকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া যায় না।

বিভিন্ন ঘটনা (যেগুলি আমি অন্যত্র উদ্ধৃত করেছি) প্রমাণ করে যে গায়ের আর চুলের রঙ অনেক সময় কিছু উদ্ভিজ্জ বিষের ক্রিয়া এবং কিছু পরজীবী জীবাণুর আক্রমণের হাত থেকে সম্পূর্ণ অনাক্রম্যতার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। তাই আমার মনে হয়েছিল নিগ্রো ও অন্যান্য কৃষ্ণবর্ণ জাতির গায়ের রঙ

কালো হওয়ার কারণ হল—তাদের দেশের জলাভূমি থেকে যে ভয়ঙ্কর বিষ-বাষ্প বেরোত, তার হাত থেকে তারাই বেঁচে যেত যাদের গায়ের রঙ ছিল ঘোর কালো, আর বহু প্রজন্ম ধরে চলতে চলতে এটাই তাদের স্বাভাবিক রঙে পরিণত হয়েছে।

পরে জেনেছি, আমার অনেকদিন আগে ডঃ ওয়েল্‌স্‌-ও এই একই কথা ভেবেছিলেন। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ক্রান্তীয় আমেরিকায় যে ইয়েলো-ফিভার বা পীত-জ্বরের ভয়ংকর প্রকোপ, তা নিগ্রোদের এবং এমনকী বর্ণসংকরদেরও একেবারেই আক্রমণ করতে পারে না। আফ্রিকার উপকূলবর্তী অন্তত ২৬০০ মাইল এলাকা জুড়ে যে মারাত্মক সবিরাম জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং যার আক্রমণে আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ প্রতি বছর মারা যায় আর আরও এক-পঞ্চমাংশ দেশে ফিরে যায় পঙ্গু হয়ে, তার আক্রমণ থেকেও নিগ্রো ও বর্ণসংকররা অনেকটাই মুক্ত। এইসব রোগ থেকে নিগ্রোদের এই অনাক্রম্যতার ক্ষমতাটা কিছুটা সহজাত (যা নির্ভর করে তাদের শারীরিক গঠনের কোনও অজানা বৈশিষ্ট্যের ওপর) এবং কিছুটা নতুন জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারার ফল। পাউসেট বলেছেন, মেক্সিকোর যুদ্ধের জন্য সুদানের কাছাকাছি এলাকা থেকে যে-সব নিগ্রোদের সৈনিক হিসেবে বাছাই করা হয়েছিল এবং যাদেরকে ইজিপ্টের ভাইসরয়ের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এবং ওয়েস্ট-ইন্ডিজের জলবায়ুতে অভ্যস্ত অন্যান্য নিগ্রোদের মতো তাদেরও পীত-জ্বর আক্রমণ করতে পারেনি। নতুন জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারার ক্ষমতার যে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, তা অনেক ঘটনার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, কোনও শীতলতর জলবায়ুর অঞ্চলে কিছুদিন বসবাস করার পর নিগ্রোদের সহজেই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জ্বরে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলি যে-জলবায়ুবিশিষ্ট অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে, সেই জলবায়ু তাদের ওপরেও একইভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন, ১৮৩৭ সালে যখন ডেমেরারা অঞ্চলে পীত-জ্বর মহামারীর আকার ধারণ করেছিল, তখন ডঃ ব্লেয়ার দেখেছিলেন, অন্য দেশ থেকে যে-সব লোক এসে ওখানে বসবাস শুরু করেছিল, তাদের মৃত্যু-হারের সঙ্গে তারা যে-দেশ থেকে চলে এসেছিল তার অক্ষাংশের একটা আনুপাতিক সম্পর্ক আছে। নিগ্রোরা পীত-জ্বরের বিরুদ্ধে এখন একটা অনাক্রম্যতা অর্জন করেছে (যদি সেটা নতুন জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতারই ফল হয়ে থাকে), অর্থাৎ একসময় বহু বছর ধরেই তারা এই রোগের শিকার হত। ক্রান্তীয় আমেরিকার অধিবাসীরা ওই অঞ্চলে স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে, কিন্তু পীত-জ্বরের আক্রমণ থেকে তারাও রেহাই পায় না। রেভারেন্ড এইচ. বি. টিস্ট্রাম্‌ বলেছেন, উত্তর আফ্রিকার অনেক জেলার আদি বাসিন্দারা প্রতি বছর ওইসব এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, অথচ নিগ্রোরা কিন্তু দিব্যি থাকে।

নিগ্রোদের এই অনাক্রম্যতার সঙ্গে যে তাদের গায়ের রঙের কিছু-একটা সম্পর্ক আছে, সেটা নিছকই অনুমান মাত্র। তাদের রক্ত, স্নায়ুতন্ত্র বা কোনও কলার মধ্যেকার

পার্থক্যের সঙ্গেও ওই অনাক্রম্যতার সম্পর্ক থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও, উপরোক্ত ঘটনাগুলির কথা এবং গায়ের রঙ ও দেহের ক্ষয়-প্রবণতার মধ্যেকার আপাত সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে আমার মনে হয়, অনুমানটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এই অনুমানটা কতদূর সত্য, তা খুঁজে দেখারও চেষ্টা করেছি, যদিও খুব-একটা সফল হতে পারিনি।[১৩] প্রয়াত ডঃ দানিয়েল, যিনি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে দীর্ঘদিন বসবাস করেছিলেন, আমাকে জানিয়েছিলেন যে গায়ের রঙের সঙ্গে রোগ থেকে অনাক্রম্যতার কোনও সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি নিজে অত্যন্ত ফরসা ছিলেন, কিন্তু তথাপি ওই উপকূলে যখন তিনি প্রথম পা রাখেন (তিনি তখন নেহাতই বালক) তখন তাঁকে দেখে এক বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ নিগ্রো-প্রধান বলেছিলেন—পীত-জ্বর তাঁকে আক্রমণ করতে পারবে না। অ্যান্টিগুয়া-র ডঃ নিকল্‌সন এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আমাকে জানিয়েছেন, কৃষ্ণাঙ্গ ইউরোপীয়দের চেয়ে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়রা পীত-জ্বরে বেশি আক্রান্ত হয় বলে তিনি মনে করেন না। কালো কেশবিশিষ্ট ইউরোপীয়রা যে উষ্ণ জলবায়ুর প্রকোপকে অন্যদের থেকে বেশি সহ্য করতে পারে, এ-কথা মিঃ জে. এম. হ্যারিসও স্বীকার করেননি। বরং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিখেছেন যে আফ্রিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলে নানান

১৩। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসা-বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর আমি একটি ফাঁকা সারণী নিম্নলিখিত মন্তব্য-সহ বিদেশে কর্মরত বিভিন্ন রেজিমেন্টের শল্যচিকিৎসকদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তার কোনও উত্তর আসেনি। সারণীতে আমি মন্তব্য করেছিলাম, 'গৃহপালিত পশুদের লেজের রঙ ও শারীরিক গঠনের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাপারে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মানব-জাতির গাত্রবর্ণের সঙ্গে তারা যে-পরিবেশে বসবাস করে, তারও কিছুটা সম্পর্ক আছে। তাই নিম্নলিখিত বিষয়টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো দরকার। বিষয়টি হল—ইউরোপের অধিবাসীদের চুলের রঙের সঙ্গে ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন রোগের (তারা যে-সব রোগের শিকার হয়) কোনও সম্পর্ক আছে কি না। অস্বাস্থ্যকর ক্রান্তীয় অঞ্চলগুলিতে তাঁবু ফেলার সময় বিভিন্ন রেজিমেন্টের শল্যচিকিৎসকরা যদি প্রথমেই অসুস্থদের সরিয়ে নেওয়ার পর হিসেব করে নেন যে দলের কতজন ব্যক্তির কেশ কৃষ্ণবর্ণ, কতজনের কেশ হালকাবর্ণ আর কতজনের কেশ এই দুয়ের মধ্যবর্তী বর্ণের, তাহলে ভাল হয়। সেইসঙ্গে যদি তাঁরা ম্যালেরিয়া, পীত-জ্বর বা রক্তামাশয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা গণনা করেন, তাহলে এ-রকম কয়েক হাজার ঘটনা নথিভুক্ত হওয়ার পর স্পষ্ট বোঝা যাবে চুলের রঙের সঙ্গে শরীরে ক্রান্তীয় অঞ্চলের রোগ সংক্রমণের কোনও সম্পর্ক আছে কি না। হয়তো এ-রকম কোনও সম্পর্ক আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু অনুসন্ধানটা চালানো একান্তই দরকার। আর সত্যিসত্যিই যদি কোনও ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়, তাহলে তার সাহায্যে বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ব্যক্তিকে বাছাই করতে সুবিধে হবে। এই অনুসন্ধানের ফলাফল তত্ত্বগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, যার সাহায্যে বলা যাবে বহু প্রজন্ম ধরে কালো চুল বা কালো গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অধিকতর কার্যকরীভাবে টিকে থাকার জন্যই অস্বাস্থ্যকর ক্রান্তীয় জলবায়ুর অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী কোনও জাতির সদস্যদের গায়ের রঙ কালো হয়ে উঠছে কি না।'

কাজের জন্য লাল চুলওয়ালা মানুষরাই বেশি উপযুক্ত হয়ে থাকে।[১৪] এইসব ছোটখাটো ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, জলাভূমি হতে নির্গত বিষ-বাষ্পজনিত রোগের আক্রমণ থেকে আগেকার দিনের ঘোর কালো রঙের মানুষরা বেশি মাত্রায় রেহাই পেত বলেই আজকের নিগ্রোরা কৃষ্ণাঙ্গ হয়েছে—এই অনুমান নিতান্তই ভিত্তিহীন।

ডঃ শার্প বলেছেন, ক্রান্তীয় অঞ্চলের রোদে শ্বেতাঙ্গদের গায়ের চামড়া পুড়ে যায়, ফোস্‌কা পড়ে যায়, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের চামড়ায় এতটুকু আঁচও লাগে না। তিনি আরও বলেছেন যে মানুষের অভ্যাসের ওপর এটা নির্ভর করে না, কারণ ছ-আট বছর বয়সের কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের হামেশাই নগ্ন অবস্থায় কোলে করে নিয়ে যাওয়া হয় ওই রোদের মধ্যে দিয়েই, কিন্তু তাতে তাদের কোনও ক্ষতি হয় না। জনৈক চিকিৎসক আমাকে জানিয়েছিলেন যে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত প্রতি গ্রীষ্মে (শীতকালে কখনওই হত না) তাঁর হাতে হালকা বাদামি রঙের একরকম দাগ হত, যেগুলো অনেকটা রোদ-পোড়া দাগেরই মতো, তবে একটু বড় মাপের। আশ্চর্য ব্যাপার হল, প্রখর রোদের তাপে তাঁর শরীরের এই দাগ-পড়া অংশগুলোর কোনও ক্ষতি হত না, কিন্তু তাঁর চামড়ার অন্য সাদা অংশগুলো রোদের তাপে হামেশাই লাল্‌চে হয়ে যেত, ফোস্‌কা পড়ত। নিম্নতর শ্রেণির প্রাণীদের ক্ষেত্রেও শরীরের সাদা লোমে ঢাকা অংশ এবং শরীরের অন্যান্য অংশের ওপর রোদের প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না, কিছুটা পার্থক্য থাকেই। এইভাবে রোদে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়ার হাত থেকে চামড়ার রক্ষা পাওয়ার ঘটনা দিয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত মানুষের গায়ের চামড়া ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কি না, আমার জানা নেই। যদি তা-ই হয়, তাহলে ধরে নিতে হয় যে আফ্রিকা মহাদেশে নিগ্রোরা যতদিন ধরে বসবাস করে আসছে কিংবা মালয় দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাংশে যতদিন ধরে বসবাস করছে পাপুয়ানরা, আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলের আদি বাসিন্দারা তার থেকে অনেক কম দিন ধরে সেখানে বসবাস করছে, আবার অন্যদিকে ভারতবর্ষের বুকে ফরসা রঙের হিন্দুরা যতদিন ধরে বসবাস করছে, তার চেয়ে অনেক আগে থেকে সেখানে বসবাস করছে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণবর্ণ আদিবাসীরা।

১৪। দ্রঃ, 'অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল রিভিউ', জানুয়ারি ১৮৬৬, পৃঃ ২১। ডঃ শার্প-ও ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে বলেছেন—'কিছু মেডিক্যাল অফিসার লক্ষ করেছেন ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন রোগে সেখানকার কালো চুল ও ময়লা গাত্রবর্ণের অধিবাসীরা যতটা ভোগে, তার চেয়ে অনেক কম ভোগে হালকা বর্ণের চুল ও উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট ইউরোপের অধিবাসীরা (দ্রঃ, 'ম্যান, আ স্পেশ্যাল ক্রিয়েশন', ১৮৭৩, পৃঃ ১১৮)। আমি যতদূর জানি তাতে বলতে পারি, এই মন্তব্যের পিছনে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। অন্যদিকে, সিয়েরা লিওনের অধিবাসী মিঃ হেড্‌ল্ ঠিক ক্যাপ্টেন বার্টনের মতোই সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন। কারণ, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলের প্রতিকূল আবহাওয়ায় 'তাঁর আমলেই সবথেকে বেশি সংখ্যক কেরানির মৃত্যু হয়েছিল' (দ্রঃ, ডব্লিউ, রিড-এর 'আফ্রিকান স্কেচ্‌বুক', খণ্ড ২, পৃঃ ৫২২)।

বিভিন্ন মানব-জাতির গায়ের রঙের মধ্যে কেন এত তারতম্য, এটা গাত্রবর্ণের দরুন অর্জিত কোনও বিশেষ সুবিধারই স্মারক নাকি জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাবজনিত ফল, তার সঠিক বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সাহায্যে করা সম্ভব নয়। তবুও, জলবায়ুর প্রভাবের ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কেননা কিছু কিছু উত্তরাধিকারমূলক প্রভাব যে কোনও-না-কোনও নির্দিষ্ট জলবায়ুর দরুনই সৃষ্টি হয়েছে, তা বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।[১৫]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি, জীবনযাপনের অবস্থা শারীরিক কাঠামোকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করে থাকে আর তার ফলে সৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। তাই দেখা যায় ইউরোপের লোকেরা কিছুদিন আমেরিকায় থাকলে তাদের চেহারার সামান্য পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনটা ঘটে অত্যন্ত দ্রুত। তাদের শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কিছুটা লম্বা হয়ে যায়। কর্নেল বার্নিস আমাকে বলেছিলেন, বিগত যুদ্ধের সময় আমেরিকায় যে-সব জার্মান সৈন্য এসেছিল, তারা যখন আমেরিকান ক্রেতাদের জন্য বানানো রেডিমেড পোশাক পরে ঘুরে বেড়াত, তখন তাদের চেহারাটা অত্যন্ত হাস্যকর দেখাত। আসলে ওইসব পোশাকের সব অংশগুলোই তাদের শরীরের থেকে অনেক লম্বা লম্বা হত। এই ঘটনার মধ্যে উপরোক্ত কথারই একটা প্রমাণ ফুটে ওঠে। এছাড়াও দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে তৃতীয় প্রজন্মের গৃহদাসদের দেখতে যে কৃষিগত দাসদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা হয়ে গেছে, সে ব্যাপারে প্রমাণের অভাব নেই।

তবে, সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মানুষের বিভিন্ন জাতিগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায়, তাদের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত যে-সব পার্থক্য রয়েছে সেগুলি প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নয়। এমনকী কোনও নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে বহুকাল বসবাস করাটাও এ-সব পার্থক্য সৃষ্টি করে না। এস্কিমোদের একমাত্র খাদ্যই হচ্ছে পশুমাংস। এরা লোমওয়ালা মোটা পশুচর্মের পোশাক পরে, কন্‌কনে ঠান্ডা আর দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে (সূর্য ওঠে না) দিন কাটায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দক্ষিণ চীনের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের এমন কিছু বিশাল পার্থক্য নেই, অথচ এই দক্ষিণ চীনের অধিবাসীরা বেঁচে থাকে প্রধানত উদ্ভিজ্জ খাদ্য খেয়ে এবং প্রায় খালি গায়ে তাদের দিন কাটাতে হয় প্রচণ্ড গরম, রোদ-ঝলমল আবহাওয়ায়। দুর্গম উপকূল অঞ্চলে সামুদ্রিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে বস্ত্রহীন ফুজিয়ানরা। ব্রাজিলের

১৫। এ-বিষয়ে আবিসিনিয়া, আরব ও অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসের প্রভাব সম্পর্কে মঁসিয়ে এ. দ্য কাত্রেফাজের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ 'রেভ্যু দে কুর্ সাঁইতিফিক্', ১০ অক্টোবর ১৮৬৮, পৃঃ ৭২৪)। খানিকফ্-এর লেখা উদ্ধৃত করে ডঃ রোল জানিয়েছেন, জর্জিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের অধিকাংশই দু-পুরুষের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ কেশ ও কালো চোখের মণি লাভ করেছে (দ্রঃ, 'Der Mensch, seine Abstammung', ১৮৬৫, পৃঃ ৯৯)। মিঃ ডি. ফোর্বস আমাকে জানিয়েছেন, আন্দিজ পর্বতমালার কুইচুয়া জাতির লোকেরা উপত্যকার যে যে অঞ্চলে বসবাস করে, সেই সেই অঞ্চলের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের পরস্পরের গায়ের রঙের মধ্যেও ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়।

বোটোকুডো-রা অভ্যন্তরভাগের গভীর নিরক্ষীয় অরণ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, উদ্ভিজ্জ খাদ্যই এদের প্রধান সম্বল। কিন্তু জলবায়ুগত এইসব পার্থক্য সত্ত্বেও এই গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। 'বিগল্' জাহাজে যে-ফুজিয়ানরা ছিল, কয়েকজন ব্রাজিলবাসী তাদের দেখে বোটোকুডো গোষ্ঠীর লোক বলেই মনে করেছিল। আবার ক্রান্তীয় আমেরিকার অন্যান্য অধিবাসীদের মতো বোডোকুডোদের সঙ্গেও নিগ্রোদের বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। অথচ নিগ্রোরা বাস করে আতলান্তিক মহাসাগরের ঠিক বিপরীত পারে, তাদের এলাকার জলবায়ুর সঙ্গে ক্রান্তীয় আমেরিকার জলবায়ুর প্রায় কোনও পার্থক্যই নেই, এবং নিগ্রোদের আচার-অভ্যাসও প্রায় এদেরই মতো।

শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার বংশানুক্রমিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা দিয়েছে নানান পার্থক্য—এ-মতও গ্রহণযোগ্য নয় (সামান্য কিছু প্রভাব অবশ্য থাকতে পারে)। যে-সব মানুষ সাধারণত ডিঙিতেই বসবাস করে, তাদের পাগুলো কিছুটা খাটো হয়ে যেতে পারে। যারা বসবাস করে উঁচু জায়গায়, তাদের বুকটা বেড়ে উঠতে পারে আয়তনে। যাদের সারাক্ষণ কোনও-না-কোনও ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে হয়, তাদের সেই ইন্দ্রিয়ের কোটরটি আয়তনে বড় হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের মুখের আদলেও ঘটতে পারে কিছু পরিবর্তন। সভ্য জাতিগুলির মধ্যে চোয়ালের ব্যবহার অনেক কমে গেছে বলে (আগে বিভিন্ন মনোভাব প্রকাশ করার জন্য চোয়ালের বিভিন্ন পেশীতে বিভিন্ন ভঙ্গি ফোটাত মানুষ) তাদের চোয়াল আয়তনেও অনেক ছোট হয়ে গেছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত কাজ বেশি করার দরুন আয়তনে বড় উঠেছে তাদের মস্তিষ্ক। এই দুয়ের মিলিত প্রতিক্রিয়ায় সভ্য মানুষের চেহারা বন্যদের থেকে অনেকটাই আলাদা হয়ে গেছে। কোনও জাতির মানুষদের দৈহিক উচ্চতা যদি বেড়ে যায় আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মস্তিষ্কের আয়তন যদি না বাড়ে, তাহলে (খরগোশদের ব্যাপারে আগে যা বলা হয়েছে, তার আলোকে বিচার করলে মনে হয়) তাদের করোটির গঠন কিছুটা লম্বাকৃতির (dolichocephalic) হয়ে উঠতে পারে।

শেষত, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শারীরিক বৃদ্ধির যে-নিয়মটিকে আমরা আজও ভালভাবে বুঝে উঠতে পারিনি, তা-ও অনেক সময় সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। যেমন, পেশীসমূহের বিপুল বৃদ্ধি এবং অক্ষিকোটরের অনেকখানি বেড়ে যাওয়ার মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক আছে। উত্তর আমেরিকার মান্দানদের গাত্রত্বক আর চুলের মধ্যে এবং চুলের বিন্যাস ও তার রঙের মধ্যে সুস্পষ্ট আন্তঃসম্পর্ক আছে।[১৬] ত্বকের

১৬। মিঃ কার্টলিন বলেছেন, মান্দানদের সমগ্র গোষ্ঠীটিতে সমস্ত বয়সের মানুষ এবং নারী-পুরুষ সব মিলিয়ে প্রতি ১০-১২ জনের মধ্যে একজনের উজ্জ্বল রুপোলি-ধূসর বর্ণের চুল থাকে এবং এটা বংশগতভাবেই সঞ্চারিত হয় (দ্রঃ, 'নর্থ আমেরিকান ইন্ডিয়ান্স', তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৪২, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৯)। এ-রকম লোকেদের চুল ঘোড়ার কেশরের মতো মোটা আর কর্কশ হয়ে থাকে, বাকিদের চুল পাতলা ও কোমল।

রঙ এবং ত্বক থেকে নির্গত গন্ধের মধ্যেও আছে একটা আন্তঃসম্পর্ক। ভেড়াদের শরীরের কোনও-একটা নির্দিষ্ট অংশে রোমের সংখ্যা আর রোমকূপের সংখ্যাও আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। আমাদের গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে মানুষের শারীরিক কাঠামোর বিভিন্ন পরিবর্তনকেও হয়তো এই আন্তঃসম্পর্কযুক্ত পরিবর্তনের নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার বাহিক্য বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যগুলিকে বিভিন্ন জাতির জীবনযাপনের অবস্থার প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে, কিংবা কোনও কোনও অঙ্গকে লাগাতারভাবে ব্যবহার করার ফল হিসেবে, অথবা বিভিন্ন অঙ্গের আন্তঃসম্পর্কের নীতির সাহায্যে মোটেই যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহলে এবার খুঁজে দেখা যায় একজন মানুষের সঙ্গে অপর একজন মানুষের যে-সব ছোটখাটো পার্থক্য থাকে (এ-রকম পার্থক্য একান্তই স্বাভাবিক), সেগুলি বহু প্রজন্ম ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে বজায় থেকেছে কি না এবং বেড়ে উঠেছে কি না। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথমেই আপত্তি তুলে বলা যায়—যে-সব পার্থক্য মানুষের পক্ষে সহায়ক, কেবলমাত্র সেগুলিই এভাবে বজায় থাকতে পারে। আমাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী বলা যায় (ভুল হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক), বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার পার্থক্যগুলি তাদের কোনওরকম প্রত্যক্ষ বা বিশেষ সুবিধা দেয় না। অবশ্য মানুষের মননগত, নৈতিক বা সামাজিক গুণাবলির পার্থক্য সম্বন্ধে এ-কথাটা প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন জাতির যাবতীয় বাহ্যিক পার্থক্য নিয়তই পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এ থেকেও বোঝা যায় যে এইসব পার্থক্য খুব-একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, কেননা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলে বহুদিন আগেই এগুলি হয় একটা স্থায়ী রূপ নিত এবং সেই অনুযায়ী বজায় থাকত, অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। প্রাণিতত্ত্ববিদরা যাকে প্রোটিআন বা পলিমরফিক (protean or polymorphic) বলে থাকেন, তার সঙ্গে এ-ব্যাপারে মানুষের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই প্রোটিআন বা পলিমরফিক অত্যন্ত পরিবর্তনশীল চরিত্রের হয়ে থাকে, আর তার কারণ হল, প্রথমত, এই বিভিন্নতাগুলি নিতান্তই গুরুত্বহীন, এবং দ্বিতীয়ত, এর ফলে তারা প্রাকৃতির নির্বাচনের আওতার বাইরে থেকে যেতে পেরেছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নানাভাবে বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার পার্থক্যের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি। কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের আলোচনায় আসেনি—যৌন নির্বাচন। মানুষ এবং অন্যান্য বহু জীবজন্তুর ওপর এই যৌন নির্বাচনের যথেষ্টই প্রভাব আছে। অবশ্য, বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার যাবতীয় পার্থক্য যে যৌন নির্বাচনের ফলেই গড়ে উঠেছে, তা আমি বলতে চাইছি না। আসলে এই একটা বিষয়ই শুধু অব্যাখ্যাত রয়ে গেছে। আমাদের স্বল্প জ্ঞান নিয়ে এ-ব্যাপারে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, মানুষে মানুষে ছোটখাটো কিছু-না-কিছু পার্থক্য যেহেতু থাকেই—যেমন কারুর মাথা একটু গোল হয়, কারুর-বা চ্যাপ্টা, কারুর নাক টিকালো, আবার কারুর বা থ্যাবড়া—তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব পার্থক্য একটা

স্থায়ী ও নির্দিষ্ট রূপ নিতে পারত, যদি এইসব পার্থক্যের পিছনের কারণগুলি আরও সুস্পষ্টভাবে ক্রিয়া করত এবং যদি তার সঙ্গে যুক্ত হত সুদীর্ঘকালব্যাপী অন্তর্বিবাহ বা রক্তসম্বন্ধযুক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে মিলন। এই পার্থক্যগুলি সাময়িক বা অস্থায়ী চরিত্রের হয়ে থাকে, যে-বিষয়ে এই বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কিছু আলোচনা করা হয়েছে, এবং যথোপযুক্ত অভিধার অভাবে এগুলিকে প্রায়শই স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করা হয়। আমি বলতে চাইছি না যে যৌন নির্বাচনের ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে একেবারে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা যায়। তবে, এই যৌন নির্বাচন অসংখ্য জীবজন্তুর ক্ষেত্রেই এক নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছে। কাজেই এ বিষয়টা যদি মানুষের মধ্যেও কোনও পরিবর্তন না ঘটিয়ে থাকে, তাহলে তা এক বিচিত্র ঘটনা হিসেবেই প্রতিভাত হবে যার কোনও ব্যাখ্যা নেই। সেইসঙ্গেই দেখানো যায় যে মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে-সব পার্থক্য রয়েছে, যেমন গায়ের রঙ, রোমশতা, মুখের আদল ইত্যাদি বিষয়ে, এগুলি এমন ধরনের পার্থক্য যা যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবে উদ্ভূত হতেই পারে। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে যথাযথভাবে আলোচনা করতে হলে গোটা প্রাণীজগৎটারই পর্যালোচনা করতে হয়। তাই এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে আমি মূলত এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করেছি। সবশেষে আমি আবার মানুষের প্রসঙ্গেই কিছু আলোচনা করব, এবং যৌন নির্বাচন তাকে কতটা পরিবর্তিত করেছে তা দেখানোর পর এই প্রথম খণ্ডের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের একটা সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত করব।

সংযোজন

মানুষ ও বানরের মস্তিষ্কের গঠন ও বিকাশে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য প্রসঙ্গে

টমাস হেনরি হাক্সলি

মানুষ ও বানরের মস্তিষ্কের গঠনে পার্থক্য কতটা এবং কী ধরনের, সে-বিতর্ক শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে। বিতর্কের সমাধান আজও হয়নি, কিন্তু বিতর্কের বিষয়বস্তুটা এখন আদ্যন্ত পালটে গেছে। প্রথমে অনেকেই একগুঁয়ের মতো জোরগলায় বলতেন যে সমস্ত ধরনের বানরদের, এমনকী উচ্চতম শ্রেণির বানরদেরও, মস্তিষ্কের গঠন মানুষের চেয়ে আলাদা, কারণ মানুষের মস্তিষ্কের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বানরদের মস্তিষ্কে অনুপস্থিত। এই অংশগুলো হল মস্তিষ্ক গোলার্ধের (cerebral hemisphere) পিছনের অংশ (posterior lobes), ওই অংশের মধ্যস্থিত পার্শ্বীয় গহ্বরের (lateral ventricle) পশ্চাদ্‌ভাগের কর্নু (cornu) এবং হিপ্পোক্যাম্পাস মাইনর (hippocampus minor)।

কিন্তু প্রকৃত সত্যটা হল—এই তিনটি অংশই মানুষের মস্তিষ্কের মতো সমান বিকশিত অবস্থায় অথবা কখনও-কখনও উন্নততর অবস্থায় বানরদের মস্তিষ্কেও থাকে। সমস্ত ধরনের বানরদের মস্তিষ্কেই (একমাত্র লেমুররা বাদে) এই অংশগুলো সুবিকশিত অবস্থায় থাকে। তুলনামূলক শারীরস্থানবিদ্যার অন্য যে-কোনও বুনিয়াদি সত্যের মতো এটাও আজ এক দৃঢ়মূল সত্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাছাড়া, মানুষ এবং উচ্চতর শ্রেণির বানরদের মস্তিষ্ক গোলার্ধের উপরিতলে যে জটিল সাল্‌কি (sulci) ও জাইরি (gyri) থাকে সেগুলির বিন্যাস নিয়ে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু শারীরস্থানবিদ্ গভীর চর্চা করেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই একবাক্যে বলেছেন যে মানুষ ও বানরদের মস্তিষ্কে এগুলির বিন্যাসের ধরন হুবহু এক। শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্কে যে-সব প্রধান জাইরাস ও সাল্‌কাস থাকে তার প্রতিটাই মানুষের মস্তিষ্কেও সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান, ফলে মানুষ ও শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্কের এই অংশগুলিকে একই অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। এ-ব্যাপারে কারুরই কোনও দ্বিমত নেই। মানুষ ও বানরদের মস্তিষ্কের ভাঁজ সম্বন্ধে কয়েক বছর আগে একটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক বিশোফ। আমার এই বিদগ্ধ সতীর্থটি এ-ব্যাপারে মানুষ ও বানরের মধ্যেকার পার্থক্যের গুরুত্ব কমিয়ে দেখানোর কোনও চেষ্টা করেননি বলে তাঁর লেখা থেকে কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি আমি।

'অন্য যে-কোনও প্রাণীর তুলনায় বানরদের সঙ্গে, বিশেষত ওরাং, শিম্পাঞ্জি আর গরিলাদের সঙ্গে যে মানুষের শারীরিক গঠনের অনেক বেশি সাদৃশ্য আছে তা সুবিদিত এবং এ-ব্যাপারে কেউই দ্বিমত পোষণ করেন না। শুধুমাত্র শারীরিক গঠনের

দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে বসলে লিনিয়াসের মতটি মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। লিনিয়াস বলেছিলেন—সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ওইসব বানরদের সারির সর্বোচ্চ আসনটি এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রজাতি হিসেবে মানুষেরই প্রাপ্য। উভয়ের শরীরের যাবতীয় অঙ্গের মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশি যে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ শারীরসংস্থানগত পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। মস্তিষ্কের ব্যাপারেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কিছু কিছু গুরুতর পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষ, ওরাং, শিম্পাঞ্জি এবং গরিলাদের মস্তিষ্ক পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত।'

অতএব মানুষের ও বানরদের মস্তিষ্কের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সাদৃশ্যের ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। শিম্পাঞ্জি, ওরাং এবং মানুষের মস্তিষ্ক গোলার্ধের জাইরি ও সাল্‌কির বিন্যাসের আশ্চর্য সাদৃশ্যের ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষের মস্তিষ্ক এবং বানরদের মস্তিষ্কের মধ্যে যে-সব পার্থক্য আছে, সেগুলির প্রকৃতি ও বিস্তারের ব্যাপারেও কোনও গুরুতর সংশয় নেই। আজ এটা স্বীকৃত সত্য যে মানুষের মস্তিষ্ক গোলার্ধ ওরাং ও শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্ক গোলার্ধের চেয়ে সুনিশ্চিতভাবে ও তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর, মানুষের মস্তিষ্কের সম্মুখভাগটা অক্ষিকোটরের ঊর্ধ্বাংশের ঊর্ধ্বমুখী প্রসারণের ফলে তুলনামূলকভাবে কম দৃশ্যমান, এবং মানুষের জাইরি ও সাল্‌কিগুলি সাধারণত কিছুটা কম সুসমঞ্জসভাবে বিন্যস্ত থাকে আর সেগুলির মধ্যে অপ্রধান কুঞ্চনের সংখ্যা অনেক বেশি হয়। এটাও এখন স্বীকৃত যে, বানরদের মস্তিষ্কে যে পার্শ্বস্থ-পশ্চাদস্থ বা 'বহিঃস্থ উল্লম্বাকার' ফাটলটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিদ্যমান থাকে, মানুষের মস্তিষ্কে সেটি সাধারণত নেহাতই অস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এটাও একান্তই স্পষ্ট যে এইসব পার্থক্যের কোনওটাই মানুষ ও বানরদের মস্তিষ্কের মধ্যে কোনও সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা টেনে দেয় না। গ্র্যাটিওলেট কর্তৃক বর্ণিত বহির্মুখী উল্লম্বাকার ফাটল (যেমন মানুষের মস্তিষ্কের) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক টার্নার বলেছেন :

'কিছু কিছু মস্তিষ্কে এটি শুধু গোলার্ধের কিনারায় একটি খাঁজ হিসেবেই থাকে, আবার অন্য অনেক মস্তিষ্কে এটি কিছুটা তির্যকভাবে বাইরের দিকে খানিকটা এগিয়ে যায়। এক মহিলার মস্তিষ্কের ডানদিকের গোলার্ধে এটিকে আমি দু-ইঞ্চিরও বেশি বাইরের দিকে এগিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আবার অন্য একটি মস্তিষ্কের এই ডানদিকের গোলার্ধেই এটি এক ইঞ্চির দশ ভাগের চার ভাগ বাইরের দিকে এগিয়ে ছিল, তারপর নীচের দিকে নেমে গোলার্ধের বহির্ভাগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ বানরদের মস্তিষ্কে এই ফাটলটি একেবারে নিখুঁতভাবে থাকলেও বেশিরভাগ মানুষের মস্তিষ্কে এটি ঠিক যথাযথভাবে থাকে না। আসলে মানুষের মস্তিষ্কে কতকগুলি উপরিগত, সুস্পষ্ট ও অপ্রধান ভাঁজ থাকে যেগুলি এটির ওপরদিকে অবস্থান করে এবং পশ্চাৎকরোটির অংশের সঙ্গে মধ্যকরোটির অংশকে সংযুক্ত করে। এই ভাঁজগুলির জন্যেই মানুষের মস্তিষ্কের ওই ফাটলটি ঠিক যথাযথ অবস্থায় থাকে না। এই

সংযোগকারী জাইরিগুলির প্রথমটি দীর্ঘাকার ফাটলের যত কাছাকাছি থাকে, মধ্য-পশ্চাৎকরোটির বহিঃস্থ ফাটলটিও ততই ক্ষুদ্রাকার হয়।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গ্র্যাটিওলেট কর্তৃক বর্ণিত বহিঃস্থ উল্লম্বাকার ফাটল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটা মানব-মস্তিষ্কের কোনও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়। আবার, এর পরিপূর্ণ বিকাশটা উন্নততর শ্রেণির বানরদের মস্তিষ্কেরও কোনও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়। কেননা শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্কের বহিঃস্থ উল্লম্বাকার সাল্‌কাস যে 'সংযোগকারী ভাঁজ'-এর দ্বারা কোনও-এক দিকে কম-বেশি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সে-কথা বারবার উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক রলেস্টন, মিঃ মার্শাল, মঁসিয়ে ব্রকা এবং অধ্যাপক টার্নার। এ-বিষয়ে লিখিত একটি বিশেষ প্রবন্ধের উপসংহারে অধ্যাপক টার্নার বলেছেন :

'এইমাত্র যে-তিনটি শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কের কথা বলা হল, তা থেকে প্রমাণ হয়—প্রথম সংযোগকারী ভাঁজের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়টির অপ্রকাশ্য অবস্থানকে শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্কের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখানোর যে-চেষ্টা গ্র্যাটিওলেট করেছেন, তা কোনওমতেই সমস্ত শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উপরোক্ত তিনটি মস্তিষ্কের মধ্যে মাত্র একটিতে গ্র্যাটিওলেট কথিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান ছিল। উন্নত সংযোগকারী ভাঁজ সম্বন্ধে আমার ধারণা হল—এখনও পর্যন্ত যে-সব শিম্পাঞ্জিদের কথা আমরা জানতে পেরেছি, তাদের অধিকাংশের মস্তিষ্কের অন্তত একটি গোলার্ধেও এটির অস্তিত্ব থাকে। দ্বিতীয় সংযোগকারী ভাঁজটির উপরিগত অবস্থান কম সংখ্যক শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্কেই দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত এটির অস্তিত্ব এখানে বর্ণিত 'A' নামাঙ্কিত মস্তিষ্কটি ছাড়া আর কোথাও দেখা গেছে বলে আমার জানা নেই। মস্তিষ্কের দুটি গোলার্ধের ভাঁজের সামঞ্জস্যহীন বিন্যাস, যে-বিষয়টির কথা পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছেন, তার প্রমাণও এই নমুনাগুলি থেকে স্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়।'

পার্শ্বস্থ-পশ্চাদস্থ বা বহিঃস্থ উল্লম্বাকার সাল্‌কাসের অস্তিত্ব যদি মানুষ ও উচ্চতর শ্রেণির বানরদের মধ্যে পার্থক্যের চিহ্ন হতও, তাহলেও প্ল্যাটিরহাইন বর্গের বানরদের মস্তিষ্কের গঠনকাঠামোর আলোকে বিচার করে দেখলে সেই পার্থক্যের গুরুত্ব খুব-একটা বেশি হত না। বস্তুত, ক্যাটারহাইন বা পূর্ব গোলার্ধের বানরদের পার্শ্বস্থ-পশ্চাদস্থ সাল্‌কি অত্যন্ত স্থায়ী চরিত্রের হলেও পশ্চিম গোলার্ধের বানরদের এই সাল্‌কি আদৌ সুবিকশিত নয়। প্ল্যাটিরহাইন বা পশ্চিম গোলার্ধের বানরদের মধ্যে যারা হ্রস্বতর তাদের মস্তিষ্কে এটি থাকেই না, পিথেকিয়াদের মস্তিষ্কে লুপ্তপ্রায় অবস্থায় থাকে এবং অ্যাটেল্‌স্‌দের মস্তিষ্কে সংযোগকারী ভাঁজের দ্বারা কম-বেশি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

একই শ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে যে-বৈশিষ্ট্যটির ব্যাপারে এত পার্থক্য থাকে, শ্রেণিবিন্যাসের ব্যাপারে সেই বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব নিতান্তই নগণ্য হতে বাধ্য।

এটাও এখন প্রমাণিত যে মানব-মস্তিষ্কের দু-দিকের ভাঁজের অসামঞ্জস্যের মাত্রা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়। বুশম্যান জাতির যে-সব সদস্যকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে তাদের মস্তিষ্কের দুটি গোলার্ধের জাইরি ও সাল্‌কি ইউরোপীয়দের

মস্তিষ্কের জাইরি ও সাল্‌কির থেকে অনেক কম জটিল এবং অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, আবার কিছু শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের জটিলতা ও অসামঞ্জস্য দুটোই রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। মঁসিয়ে ব্রকা কর্তৃক বর্ণিত একটি পুরুষ-শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কে এই ব্যাপারটা খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় ('L'ordre des Primates', পৃঃ ১৬৫, চিত্র ১১)।

মস্তিষ্কের আয়তনের ব্যাপারে দেখা গেছে—সবথেকে ছোট সুস্থ মানব-মস্তিষ্কের সঙ্গে শিম্পাঞ্জি বা ওরাং-এর সবথেকে বড় মস্তিষ্কের আয়তনে যতটা পার্থক্য থাকে, সবথেকে বড় ও সবথেকে ছোট সুস্থ মানব-মস্তিষ্কের আয়তনে পার্থক্যের পরিমাণ তার চেয়ে বেশি হয়।

অধিকন্তু, একটি বিশেষ ব্যাপারে ওরাং আর শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্কের সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের সাদৃশ্য থাকে, কিন্তু সেই ব্যাপারটিতে নিম্নতর শ্রেণির বানরদের মস্তিষ্কের সঙ্গে পার্থক্য থাকে ওরাং আর শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্কের। এই বিশেষ ব্যাপারটি হল দুটি কর্পোরা ক্যান্ডিক্যান্টিয়া-র (corpora candicantia) উপস্থিতি—সাইনোমরফা-দের (Cynomorpha) থাকে মাত্র একটি। এইসব তথ্যের আলোকে বিচার করে আমার আগে-বলা কথাটাই[১] আবার জোর দিয়ে উচ্চারণ করতে চাই আমি :

'মস্তিষ্কের গঠনকাঠামোর ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জি বা ওরাংদের যতটা পার্থক্য থাকে, তার থেকে বেশি পার্থক্য লক্ষ করা যায় শিম্পাঞ্জি বা ওরাংদের সঙ্গে অন্য বানরদের মস্তিষ্কের গঠনকাঠামোর। শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্কের সঙ্গে লেমুরদের মস্তিষ্কের যতটা পার্থক্য থাকে, তার তুলনায় শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্কের সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের পার্থক্য নিতান্তই নগণ্য।'

অধ্যাপক বিশোফের যে-প্রবন্ধটির কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি, সেখানে তিনি আমার এই মন্তব্যের দ্বিতীয় অংশটিকে অস্বীকার করেননি, তবে প্রথমে একেবারে প্রাসঙ্গিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে ওরাংদের ও লেমুরদের মস্তিষ্কের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকাটা মোটেই কোনও আশ্চর্য ব্যাপার নয়, অতঃপর তিনি বলেছেন, 'আমরা যদি মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে ওরাঙের মস্তিষ্কের, ওরাঙের মস্তিষ্কের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কের, শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কের সঙ্গে গরিলার মস্তিষ্কের এবং এইভাবে একে একে হাইলোবেত্‌স, সেম্‌নোপিথেকাস, সাইনোসেফ্যালাস, সার্কোপিথেকাস, ম্যাকাকাস, সেবুস, ক্যালিথ্রিক্স, লেমুর, স্টেনোপ্‌স্, হ্যাপেলের মস্তিষ্কের তুলনা করে চলি, তাহলে দেখা যাবে মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে ওরাং বা শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কের যতটা পার্থক্য, তার চেয়ে বেশি পার্থক্য আর কোনও প্রজাতির সঙ্গে তার পরের প্রজাতির নেই, এমনকী মস্তিষ্কের ভাঁজের বিকাশের ক্ষেত্রেও নয়।'

এর উত্তরে আমার বক্তব্য হল, প্রথমত, বিশোফের এই বক্তব্যটি সঠিক-বেঠিক যা-ই হোক না কেন, আমার 'ম্যান্‌'স্ প্লেস ইন নেচার'-এর প্রতিপাদ্যের সঙ্গে এর

১। 'ম্যান্‌স্ প্লেস ইন নেচার'।

কোনও সম্পর্কই নেই, কারণ ওই রচনাটিতে আমি শুধু মস্তিষ্কের ভাঁজ নিয়ে আলোচনা করিনি, আলোচনা করেছি সমগ্র মস্তিষ্কের গঠনকাঠামো নিয়ে। আমার যে-রচনাটির সমালোচনায় ব্রতী হয়েছেন অধ্যাপক বিশোফ, সেই রচনাটি সামনে রাখলে নিম্নলিখিত কথাগুলি তাঁর দৃষ্টিগোচর হবে : 'আমাদের জ্ঞানের বর্তমান পরিধি অনুযায়ী আমরা লক্ষ করেছি যে সিমিয়ান (Simian) মস্তিষ্কের গঠনকাঠামোর ক্রমমালায় প্রকৃত কাঠামোগত বিচ্যুতি মাত্র একটিই খুঁজে পাওয়া যায়। ধারাবাহিকতা থেকে এই বিচ্যুতিটি মানুষ এবং মানুষ-সদৃশ বানরদের মধ্যে নেই, আছে নিম্নতর ও নিম্নতম সিমিয়ানদের মধ্যে, অথবা অন্যভাবে বললে, পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের বনমানুষ, বানর আর লেমুরদের মধ্যে। আজ পর্যন্ত যে-সব লেমুরকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের লঘুমস্তিষ্ক ওপর থেকে আংশিকভাবে দৃশ্যমান হতে দেখা গেছে এবং তার পিছনের অংশ আর তার মধ্যে অবস্থিত পশ্চাদস্থ কর্নু ও হিপ্পোক্যাম্পাস মাইনর কম-বেশি লুপ্তপ্রায় অবস্থায় থাকে। অন্যদিকে, মারমসেট (marmoset), আমেরিকান বানর, পূর্ব গোলার্ধের বানর, বেবুন বা মানব-সদৃশ বনমানুষ—এদের প্রত্যেকেরই লঘুমস্তিষ্ক পিছন দিক থেকে সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে গুরুমস্তিষ্কের অংশের (cerebral lobes) দ্বারা এবং তাতে একটি বৃহদাকার পশ্চাদস্থ কর্নু ও একটি সুবিকশিত হিপ্পোক্যাম্পাস মাইনর বিদ্যমান থাকে।'

এই কথাগুলি যখন লেখা হয়েছিল, তখনকার জ্ঞানের জ্ঞানের পরিধির বিচারে এই বক্তব্যের মধ্যে কোনও ভুল ছিল না। পরবর্তীকালে জানা গেছে যে সিয়ামাং ও হাউলিং বানরদের মস্তিষ্কের পশ্চাদংশ অপেক্ষাকৃত কম বিকশিত হয়, কিন্তু এই আবিষ্কারও উপরোক্ত বক্তব্যকে বাতিল করে দেয় না। এই দুটি প্রজাতির বানরদের মস্তিষ্কের পশ্চাদংশ অত্যন্ত ছোট ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মস্তিষ্ক কোনও অর্থেই লেমুরদের মস্তিষ্কের সঙ্গে তুলনীয় নয়। অধ্যাপক বিশোফ একেবারে অকারণেই হ্যাপেল্‌দেরকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় স্থান দিয়েছেন। তা না করে আমরা যদি তাঁর দ্বারা উল্লিখিত প্রাণীদেরকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করি তাহলে ক্রমমালাটা এ-রকম দাঁড়ায় : হোমো, পিথেকাস, ট্রগ্‌লোডাইট্‌স, হাইলোবেত্‌স, সেম্‌নোপিথেকাস, সাইনোসেফ্যালাস, সার্কোপিথেকাস, ম্যাকাকাস, সেবুস, ক্যালিথ্রিক্স, হ্যাপেল, লেমুর, স্টেনোপ্‌স। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে এই ক্রমমালায় বিশাল একটা ফাঁক রয়ে গেছে হ্যাপেল আর লেমুরদের মধ্যে এবং এই ক্রমমালার অন্য যে-কোনও দুটি প্রজাতির মধ্যেকার ফাঁকের থেকে এই ফাঁকটা অনেক বড়। অধ্যাপক বিশোফের রচনা প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই গ্র্যাটিওলেট বলেছিলেন যে উন্নত শ্রেণির অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের থেকে লেমুরদের পৃথক করা উচিত, কারণ তাদের মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যদের থেকে আলাদা। জাভান লোরিস্‌দের মস্তিষ্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে অধ্যাপক ফ্লাওয়ার লিখেছেন :

'উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, যে-সব বর্গের বানরদের সঙ্গে অন্যান্য ব্যাপারে

লেমুরাইন বর্গের বানরদের সাদৃশ্য আছে বলে মনে করা হয়, যেমন প্ল্যাটিরহাইন বর্গের নিম্নতর শ্রেণির বানররা, তাদের সঙ্গে লেমুরাইনদের ছোট গোলার্ধবিশিষ্ট মস্তিষ্কের পশ্চাদংশের বিকাশে কোনও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে গত দশ বছরে বহু পর্যবেক্ষকের গবেষণার ফলে পূর্ণ-বয়স্কদের মস্তিষ্কের গঠনকাঠামো সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারে যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটেছে, তা আমার ১৮৬৩ সালের বক্তব্যকে পুরোপুরিভাবে সত্য বলেই প্রমাণ করছে। তবে পূর্ণবয়স্ক মানুষ ও বানরের মস্তিষ্কের সাদৃশ্যের কথা স্বীকার করে নিয়েও অনেকে বলেছেন যে এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও বাস্তবে তাদের মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে, কারণ তাদের উভয়ের বিকাশের পদ্ধতির মধ্যে একেবারে মৌলিক পার্থক্য থাকে। তাদের বিকাশের পদ্ধতিতে সত্যিই এ-রকম কোনও মৌলিক পার্থক্য থাকলে এই বক্তব্যকে সবার আগে মেনে নিতাম আমি নিজেই। কিন্তু না, এ-রকম কোনও পার্থক্যের কথা আমার জানা নেই, বরং মানুষ ও বানরদের মস্তিষ্কের বিকাশে মৌলিক সাদৃশ্যই থাকে।

বানর আর মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশে মৌলিক পার্থক্যের কথা প্রথম বলেছিলেন গ্র্যাটিওলেট। পার্থক্যটা কোথায় তা দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—বানরদের মস্তিষ্কের যে সাল্‌কিগুলি প্রথম দৃশ্যমান হয় সেগুলি তাদের মস্তিষ্ক গোলার্ধের পশ্চাদংশে অবস্থিত, কিন্তু মানবশিশুর ভ্রূণে যে সাল্‌কিগুলি প্রথমে দেখা যায় সেগুলি তাদের মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে থাকে।

এই বক্তব্যটি দাঁড়িয়ে আছে দুটি পর্যবেক্ষণের ওপর। প্রথমটি একটি আসন্ন-জন্ম গিবন যার পশ্চাদংশের জাইরিগুলি 'সুবিকশিত' অবস্থায় ছিল কিন্তু সম্মুখ ভাগের জাইরিগুলিকে 'প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না' (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৯), দ্বিতীয়টি ২২ বা ২৩ সপ্তাহের একটি মানবশিশুর ভ্রূণের মস্তিষ্ক।

উল্লিখিত রচনাটিতে এই মস্তিষ্কটির তিনটি চিত্র দেওয়া হয়েছে—মস্তিষ্ক গোলার্ধের ওপরের অংশ, পাশের অংশ ও নীচের অংশের। কিন্তু তার ভেতরের অংশের কোনও ছবি দেওয়া হয়নি। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, ছবিগুলি কিন্তু গ্র্যাটিওলেটের বর্ণনাকে সমর্থন করে না, কারণ ছবিতে মস্তিষ্কের পিছনের অর্ধের ফিশারটি (সম্মুখস্থ-পার্শ্বস্থ—fissure) সম্মুখ অর্ধে অস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান যে-কোনও ফিশারের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। ছবিগুলি যদি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, তাহলে তা গ্র্যাটিওলেটের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না। কারণ গ্র্যাটিওলেট বলেছেন, 'এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই দুটি মস্তিষ্ক (একটি ক্যালিথ্রিক্সের ও একটি গিবনের) এবং মানবশিশুর ভ্রূণের মস্তিষ্কের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য থাকে। পার্থক্যটি হল—মানবশিশুর ভ্রূণের মস্তিষ্কে পার্শ্বস্থ ভাঁজগুলি দেখা দেওয়ার অনেক আগেই সম্মুখস্থ ভাঁজগুলি দৃশ্যমান হতে শুরু করে।'

গ্র্যাটিওলেটের পরবর্তীকালে মস্তিষ্কের জাইরি ও সাল্‌কি-র বিকাশ নিয়ে অনেকেই গবেষণা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্মিড্‌ট্, বিশোফ, প্যান্‌শ্ এবং

বিশেষত একার। একার-এর গবেষণাটি সাম্প্রতিকতম তো বটেই, সেইসঙ্গেই এখনও পর্যন্ত এ-বিষয়ে সবথেকে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানেরও দাবিদার।

এইসব গবেষকদের অনুসন্ধান থেকে যে-সব সিদ্ধান্তে আসা গেছে, সেগুলির সারসংক্ষেপ করলে দেখা যায় :

(১) গর্ভসঞ্চারের তৃতীয় মাসে মানবভ্রূণের মস্তিষ্কে সিল্‌ভিয়ান ফিশারটি (sylvian fissure) দেখা দেয়। এই সময় এবং চতুর্থ মাসে মস্তিষ্ক গোলার্ধ দু'টি মসৃণ ও গোলাকার থাকে [একমাত্র সিল্‌ভিয়ান টোল (depression) বাদে] এবং লঘুমস্তিষ্কের অনেকটা পিছনে অভিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে।

(২) ভ্রূণের চতুর্থ মাসের শেষ এবং ষষ্ঠ মাস শুরুর অন্তর্বর্তী পর্যায়ে সাল্‌কিগুলি দেখা দিতে শুরু করে, কিন্তু একার দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন ভ্রূণের ক্ষেত্রে এই সাল্‌কিগুলি দেখা দেওয়ার সময়ের ব্যাপারে পার্থক্য তো থাকেই, সেইসঙ্গেই এগুলির বিন্যাসের ব্যাপারেও প্রভূত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তবে কোনও ক্ষেত্রেই সম্মুখস্থ বা পার্শ্বস্থ সাল্‌কিগুলি প্রথমে দেখা দেয় না।

প্রথমে যে সাল্‌কিগুলি দেখা দেয় সেগুলি মস্তিষ্কে গোলার্ধের ভিতরের দিকে থাকে (ভ্রূণের এই দিকটি গ্র্যাটিওলেট পরীক্ষা করে দেখেননি) এবং হয় অভ্যন্তরস্থ উল্লম্বাকার (পশ্চাৎকরোটি-মধ্যকরোটিগত) অথবা ক্যাল্‌কেরাইন সাল্‌কাস হয়ে থাকে। এই দুটি পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি থাকে এবং একসময় পরস্পরের ওপরে এসে পড়ে। এ দুটির মধ্যে পশ্চাৎকরোটি-মধ্যকরোটিগত সাল্‌কাসই সাধারণত আগে দৃশ্যমান হয়।

(৩) এই পর্যায়ের শেষের দিকে দেখা দেয় আর-একটি সালকাস, যার নাম 'পশ্চাদস্থ-মধ্যস্থ' বা 'রোলান্ডোর ফিশার' এবং ষষ্ঠ মাস চলাকালীন দৃশ্যমান হতে থাকে সম্মুখকরোটি, মধ্যকরোটি, পার্শ্বকরোটি ও পশ্চাৎকরোটির অন্যান্য প্রধান সাল্‌কাসগুলি। তবে এগুলির মধ্যে কোনওটি সবক্ষেত্রেই অন্যগুলির থেকে আগে দেখা দেয় কি না, তার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, একার তাঁর গ্রন্থে যে-মস্তিষ্কটির ছবি দিয়েছেন, তাতে সম্মুখস্থ-পার্শ্বস্থ সাল্‌কাসটিকে (scissure parallele—যা বানরদের মস্তিষ্কের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য) রোলান্ডোর ফিশারটির সমান বিকশিত অবস্থায় এবং সম্মুখস্থ সাল্‌কাসগুলির থেকে অনেক সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে।

এই মুহূর্তে আমাদের হাতে যা তথ্য আছে তার ভিত্তিতে বিচার করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে মানবশিশুর ভ্রূণে সাল্‌কি ও জাইরি দেখা দেওয়ার বিন্যাসটা বিবর্তনবাদের সাধারণ তত্ত্বের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ এবং এ থেকে বোঝা যায় বানর-সদৃশ কোনও জীব থেকে বিবর্তিত হয়েই মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল। তবে বর্তমানের উন্নত শ্রেণির যে-কোনও বানরদের জাইরি ও সাল্‌কির থেকে মানবশিশুর ভ্রূণের জাইরি ও সাল্‌কিগুলি যে বহু দিক থেকেই আলাদা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ফন বেয়ার বলেছিলেন—পরস্পরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণীরা বিকাশের গতিপথে প্রথমে অর্জন করে তারা যে বৃহত্তর শ্রেণির অন্তর্গত সেই শ্রেণির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি, অতঃপর একে একে অর্জন করে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি যেগুলি তাদের পৃথক পৃথক কুল, বর্গ ও প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়। সেইসঙ্গেই তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে উচ্চতর শ্রেণির প্রাণীদের বিকাশের কোনও স্তরই নিম্নতর শ্রেণির কোনও প্রাণীর পূর্ণবয়স্ক অবস্থার সঙ্গে হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। অত্যন্ত সঠিকভাবেই আমরা বলতে পারি যে ব্যাঙেরা মাছের অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায়, কারণ জীবনের একটা পর্যায়ে ব্যাঙাচিদের মধ্যে মাছের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান থাকে এবং সেই পর্যায় থেকে ব্যাঙাচিরা আর অগ্রসর হতে না পারলে তাদেরকে মাছেদের বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত করতে হত। তবে এটাও সত্য যে আমাদের জানা যে-কোনও মাছের সঙ্গে ব্যাঙাচিদের প্রচুর পার্থক্যও থাকে।

একইভাবে, গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসে কোনও মানবশিশুর ভ্রূণের মস্তিষ্ককে শুধু যে বানরের মস্তিষ্ক বলেই চিহ্নিত করা যায় তা-ই নয়, চিহ্নিত করা যায় আর্কটোপিথেকাইন বা মার্মোসেট-সদৃশ বানরের মস্তিষ্ক হিসেবে। কারণ ওই ভ্রূণের মস্তিষ্কের গোলার্ধ দুটি, তাদের পশ্চাদস্থ বৃহদাকার অংশ, সিলভিয়ান ও ক্যালকেরাইন ছাড়া অন্য কোনও সাল্‌কি না-থাকা—এই বৈশিষ্ট্যগুলি একমাত্র আর্কটোপিথেকাইন বর্গের বানরদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। তবে সেইসঙ্গে এ-ও সত্য, গ্র্যাটিওলেট যেমন বলেছেন, মানবশিশুর ভ্রূণের বিস্তৃত সিলভিয়ান ফিশারটি তাকে যে-কোনও প্রকৃত মার্মোসেটের মস্তিষ্কের থেকে আলাদা করে দেয়। বরং কোনও মার্মোসেটের গর্ভাবস্থার শেষদিকের ভ্রূণের মস্তিষ্কের সঙ্গে গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসে কোনও মানবশিশুর ভ্রূণের অনেক বেশি সাদৃশ্য থাকতে পারে। কিন্তু মার্মোসেটদের মস্তিষ্কের বিকাশ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানি না আমরা। প্ল্যাটিরহাইন বর্গের বানরদের ব্যাপারে আমার জানা একমাত্র পর্যবেক্ষক হচ্ছেন প্যান্‌শ্‌। সেবুস অ্যাপেলা প্রজাতির একটি ভ্রূণের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে তিনি দেখেছিলেন—সিলভিয়ান ফিশার এবং গভীর ক্যালকেরাইন ফিশারটি ছাড়া ভ্রূণটির মস্তিষ্কে একটি অত্যন্ত অগভীর সম্মুখস্থ-পার্শ্বস্থ ফিশার ছিল (গ্র্যাটিওলেট কর্তৃক বর্ণিত সিজার প্যারালেল)।

এই তথ্যটি এবং প্ল্যাটিরহাইন বর্গের সাইমিরি জাতীয় প্রজাতির (যাদের মস্তিষ্ক গোলার্ধের বহির্ভাগের সম্মুখ অর্ধে সাল্‌কির সামান্য কিছু চিহ্ন মাত্র থাকে অথবা একেবারেই থাকে না) প্রাণীদের মধ্যে সম্মুখস্থ-পার্শ্বস্থ সাল্‌কাস বিদ্যমান থাকা সংক্রান্ত তথ্যটি—এই দুয়ে মিলে নিঃসন্দেহেই গ্র্যাটিওলেটের প্রকল্পটিকে সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন করে। গ্র্যাটিওলেট বলেছিলেন—প্ল্যাটিরহাইন বর্গের প্রাণীদের মস্তিষ্কে সম্মুখস্থ সাল্‌কির থেকে আগে দেখা দেয় পশ্চাদস্থ সাল্‌কি। কিন্তু প্ল্যাটিরহাইন বর্গের ক্ষেত্রে যা সত্য তা যে ক্যাটারহাইন বর্গের ক্ষেত্রেও সত্য হবে এমন কোনও কথা নেই। সাইনোমরফা শ্রেণির প্রাণীদের মস্তিষ্কের বিকাশ কীভাবে ঘটে, আমাদের জানা নেই। অ্যান্‌থ্রোপোমরফা শ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র পূর্বোল্লিখিত আসন্ন-জন্ম

একটি গিবনের মস্তিষ্কের কথাই জানা আছে আমাদের। শিম্পাঞ্জি বা ওরাংদের মস্তিষ্কের সাল্‌কিগুলি যে মানুষের মস্তিষ্কের সাল্‌কিগুলির মতো একইরকম বিন্যাসে বিন্যস্ত নয়, তা প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্যই এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে নেই।

নিজের গ্রন্থের মুখবন্ধটি গ্র্যাটিওলেট শুরু করেছেন এই স্মরণীয় উক্তিটি দিয়ে : 'বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার সময় চটজলদি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাওয়া একটি বিপজ্জনক প্রবণতা।' আমার ধারণা, নিজের গ্রন্থে মানুষ ও বানরের মধ্যেকার পার্থক্য প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় এই অমূল্য প্রবচনটির কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মস্তিষ্ক সংক্রান্ত বিশিষ্টতম গ্রন্থগুলির মধ্যে একটির রচয়িতা গ্র্যাটিওলেট যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে আজকের তথ্যের বিচারে তাঁর নিজের তথ্যগুলিকে অপ্রতুল বলে স্বীকার করে নিতে তিনি যে এতটুকুও দ্বিধা করতেন না, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে হইচই করেছে এমন সব লোকেরা যারা তাঁর সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিকে উপলব্ধি করতে নিতান্তই অক্ষম, ফলে তাদের হাতে পড়ে তাঁর যুক্তিগুলি অজ্ঞানতার সমর্থনকারী যুক্তিতে পরিণত হয়েছে।

তবে, পার্শ্বস্থ ও সম্মুখস্থ সাল্‌কির মধ্যে কোন্‌টি কার আগে দেখা দেয় সে-ব্যাপারে গ্র্যাটিওলেটের প্রকল্পটি সঠিক বা বেঠিক যা-ই হোক না কেন, দুটি বিষয় নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। প্রথমত, পার্শ্বস্থ বা সম্মুখস্থ সাল্‌কি দেখা দেওয়ার আগেই মানবশিশুর ভ্রূণের মস্তিষ্কে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে যেগুলি শুধুমাত্র নিম্নতম শ্রেণির বানরদের মধ্যেই দেখা যায় (একমাত্র লেমুররা বাদে) ; দ্বিতীয়ত, যে জৈবিক গঠন থেকে অন্যান্য বানররা উদ্ভূত হয়েছে, সেই একই জৈবিক গঠন থেকেই মানুষও যদি ক্রমান্বয় পরিবর্তনের পথ বেয়ে উদ্ভূত হয়ে থাকে, তাহলে মানবশিশুর ভ্রূণের মস্তিষ্কে অন্যান্য বানরদের মতো একই বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠাটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরা মানুষের চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক
পরিবর্তন ঘটিয়েছেন চার্লস ডারউইন
তাঁদের অন্যতম। মানুষের উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তন এবং অন্যান্য
প্রাণীকুলের সাথে তার সম্পর্ক বিষয়ে ডারউইনের তত্ত্ব
আজ আর পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না।
তাঁর ঐ-সব যুগান্তকারী সিদ্ধান্তগুলি মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে
তৎকালে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে
অবৈজ্ঞানিক ও অসার বলে প্রমাণ করেছিল।
'ডিসেন্ট অফ ম্যান' বইটিতে তিনি মানুষের
উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তনের ধারায় তার বিকাশের বিবরণসমূহ
এবং মানুষের সাথে তার অতিনিকট সম্বন্ধযুক্ত
বিভিন্ন শ্রেণীর বাঁদর ও অন্যান্য
মেরুদণ্ডী প্রাণীকুলের সম্পর্ককে বিচার করেছেন।
সহজ বোধগম্য ভাষায় ঐ সমস্ত বিষয়ের
একটি সামগ্রিক চিত্র তিনি
ফুটিয়ে তুলেছেন এই বইয়ে। আজ থেকে প্রায়
একশ পঁচিশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল এই বই,
কিন্তু ডারউইনের পর্যবেক্ষণে
এবং আলোচিত বিষয়ের প্রামাণিকতায় কোন ঘাটতি
আজও তেমনভাবে চোখে পড়ে না।
মানব জ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই বই এখনও
নৃতত্ত্ব ও জীববিদ্যা বিষয়ে উৎসাহী পাঠকদের মনোযোগ
সমানভাবেই আকর্ষণ করে থাকে।